বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দারা (১৮৯০ - ২০১৫)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ডঃ শম্পা চৌধুরী

গবেষক – **রিমা দাস**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর – A00BE1500116

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ – ২৮.০১.২০১৬

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Certified that the Thesis entitled

বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দারা (১৮৯০-২০১৫)

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of

Prof. Sampa Chaudhuri

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the
Supervisor : Sampa Chaudhuri.
Dated : 18.01.24

Candidate : Rima Das
Dated : 18.01.2024

Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

কথামুখ

এই গবেষণাপত্রটি প্রস্তুত করে উঠতে পারার জন্য আমি সবথেকে বেশি কৃতজ্ঞ এবং ঋণী যাঁর কাছে, তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডঃ শম্পা চৌধুরী। সেই ২০০৭ সালে যেদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে স্নাতক স্তরে ভর্তি হয়েছিলাম, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি আমার শিক্ষক। আমার এম.ফিল. কোর্সের গবেষণাপত্রের তত্ত্বাবধায়কও তিনিই ছিলেন। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর মূল্যবান সময় এবং পরামর্শ দিয়ে সবসময় আমার পাশে থেকেছেন, আমাকে সাহায্য করেছেন। এই গবেষণা পর্বের সুদীর্ঘ পথে বহুবার নানা কারণে আমি হতোদ্যম হয়ে পড়েছি, হতাশা গ্রাস করেছে। মাঝের কোভিড অতিমারীর কালপর্ব কেটেছে দুঃস্বপ্নের মতো। অধ্যাপক চৌধুরী একেবারে অভিভাবকোচিত ধৈর্য্য এবং প্রশ্রয়ে নিরন্তর আমাকে উৎসাহিত করেছেন, যাতে আমি আমার এই গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারি। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই।

ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রত্যেককে, কলা অনুষদ এবং পি.এইচ.ডি সেলের সাথে যুক্ত সকলকে। বাংলা বিভাগ এবং অন্যান্য বিভাগের আমার সকল অধ্যাপকের প্রতিই আমি কৃতজ্ঞ। দীর্ঘ দেড় দশক ধরে তাঁদের কাছ থেকে আমি অনবরত জেনেই চলেছি, শিখেই চলেছি। সে শিক্ষা শুধুমাত্র পুঁথিগত নয়, সে শিক্ষা জীবনচর্চার, জীবনচর্যার।

কৃতজ্ঞতা জানাই আমার কর্মক্ষেত্র, কালিয়াগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ পীযুষ কুমার দাস – কে। যখনই কোন সমস্যায় বা প্রয়োজনে তাঁর কাছে গিয়েছি, তিনি সাহায্য করেছেন। আমার সহকর্মীরা সবসময় পাশে থেকেছেন, ধন্যবাদ তাঁদেরও।

আমার স্কুল মাস্টার বাবা আর সরকারি চাকুরে মায়ের খুব সাধ ছিল, তাঁদের মেয়ে পি.এইচ.ডি করবে, ডক্টরেট হবে, কলেজে পড়াবে। অনেক স্বপ্ন নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল বাবা, আর দারুণ দুঃসময়েও আমার ওপর থেকে মায়ের বিশ্বাস কখনও হারায়নি। আজ তাঁদের দু'জনের কথা খুব মনে পড়ছে।

যার কথা বলে শেষ করা যাবে না, সে আমার বন্ধু ও বিবাহিত সঙ্গী, সুরজিৎ। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে সে-ই আমাকে সামলে রেখেছে, আমার সমস্ত দৌরাত্ম্য সহ্য করেছে। পেশাগত জীবনের চাপ সামলে যখন গবেষণাপত্রের লেখালেখি শুরু করেছি, তখন থেকে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছে। গাছপালা, পশুপাখি, মানুষজন - সবাইকে নিয়ে কীভাবে ভাল থাকতে হয়, তা ওকে দেখেই আমি প্রতিনিয়ত শিখি।

আরও দু'জনের কথা বলতেই হবে। আমাদের বাড়ির দুই খুদে সদস্য। কিকি আর ওরিও। গবেষণাপত্র তৈরি করার এই দীর্ঘ সময়ে তারা কখনও আমার জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করেছে। আবার কখনও তাদের সময় দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিমান প্রকাশ করেছে নিজস্ব ভঙ্গিতে। ছড়িয়ে থাকা বইপত্রে তাদের নখ আর দাঁতের আলতো দাগই সেসবের প্রমাণ। আবার যখনই একটু সাহচর্য পেয়েছে, খুশি হয়ে উঠেছে দারুণ। আদরে আদরে নামিয়ে দিয়েছে সমস্ত ক্লান্তি।

বলা হল না আরও কতজনের কথা। আশেপাশে, কাছে, দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেই সবার কথা, যারা না থাকলে, আমি, এই আমি হয়ে উঠতাম না।

সূচিপত্র

ভূমিকা ১ – ৭

প্রথম অধ্যায় ৮ - ৩৭
বিদেশি ছায়ায় বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৮ - ১২১
বাংলা সাহিত্যের পেশাদার গোয়েন্দারা

তৃতীয় অধ্যায় ১২২ - ১৭২
বাংলা সাহিত্যের ভিন্ন পেশার গোয়েন্দারা

চতুর্থ অধ্যায় ১৭৩ - ২২৪
বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দারা

পঞ্চম অধ্যায় ২২৫ - ২৪৬
পুলিশের কলমে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি
(*বাঁকাউল্লার দপ্তর, সেকালের দারোগা কাহিনি, দারোগার দপ্তর*)

উপসংহার ২৪৭ - ২৫০

গ্রন্থপঞ্জি

পত্রপত্রিকাপঞ্জি

ভূমিকা

রহস্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালীন। বিশেষত তার সাথে যদি অপরাধ জড়িত থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই রহস্যভেদ হয়, নিরন্তর অনুসন্ধান চলতেই থাকে। শিল্প – সংস্কৃতির নানা ধারায় যুগ যুগ ধরে এই রহস্য সন্ধান চলে আসছে। একই কথা প্রযোজ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। সেই জন্যেই, সম্ভবত, সারা বিশ্ব জুড়ে গোয়েন্দা কাহিনি, ক্রাইম কাহিনির এত বিপুল জনপ্রিয়তা।

আমার সাথে গোয়েন্দা গল্পের পরিচয় ঘটে অনেক ছোটবেলাতেই। আমাদের পরিবারে একটি রেওয়াজ ছিল। আমি এবং আমার প্রায় সমবয়সী জ্যাঠতুতো দাদা, দু'জনের জন্মদিনে দু'জনেই বড়দের কাছ থেকে বই উপহার পেতাম। কিন্তু, মজাটা হল, যার জন্মদিন, সে নিজেরটা তো বটেই, অন্যজনের বইটাও নির্বাচন করে দিত। তারপর নিজেদের মধ্যে বদলাবদলি করে পড়ার ব্যাপারটা তো থাকতই। আমার সেই দাদা, যাকে আমি কোনদিন দাদা বলিনি, নাম ধরেই ডেকেছি কেবল, সে আমার জন্য প্রত্যেকবারই কোন না কোন গোয়েন্দা কাহিনিই পছন্দ করে দিত। শুরুটা হয়েছিল ফেলুদাকে দিয়ে। তারপর একে একে পাণ্ডব গোয়েন্দা, ঋজুদা, কাকাবাবু, অর্জুন, কিরীটী, কর্নেল, জয়ন্ত - মানিক এমন আরও অনেকে। আরেকটু বড় হলে ব্যোমকেশ, গার্গী, মিতিনমাসি। রহস্য কাহিনি, গোয়েন্দা গল্প শেষ করার অদম্য কৌতূহলে পড়ার বইয়ের ভেতরেও সেইসব বই রেখে দিব্যি পড়া চলত।

ছোটবেলায় নিছক পড়ার আনন্দেই যে কাহিনির সঙ্গে পরিচয়, বড় হয়ে সেটাই বদলে গেল গভীর আগ্রহের বিষয়ে। বাংলা সাহিত্যের তো বটেই, বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে যে সমস্ত গোয়েন্দা – রহস্য কাহিনি লেখা হয়েছে, শুরু হল তার অন্বেষণ।

উইলার্ড হান্টিংটন রাইট নামে এক মার্কিন শিল্পতাত্ত্বিক *আমেরিকান ম্যাগাজিন* - এ ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় *টোয়েন্টি রুলস ফর রাইটিং ডিটেকটিভ স্টোরিজ* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে সমকালীন বিদগ্ধ মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। ততদিনে অবশ্য এস. এস.

ভ্যান ডাইন ছদ্মনামে তিনি বিশ্ব-গোয়েন্দা গল্পের আসরে জাঁকিয়ে বসেছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি সার্থক গোয়েন্দা গল্প রচনার কুড়ি দফা নীতি নির্ধারণ করেছিলেন।

ভ্যান ডাইনের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পরের বছর অর্থাৎ ১৯২৯ – এ *দ্য বেস্ট (ইংলিশ) ডিটেকটিভ স্টোরিজ অব ১৯২৮* বইটির ভূমিকায় গোয়েন্দা কাহিনি রচনার দশটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রাবন্ধিক রোনাল্ড নক্স, যিনি পরে বেশ কিছু গোয়েন্দা গল্পও লিখেছিলেন। এই নিয়মাবলীকে পরবর্তীকালে গবেষকরা *টেন কম্যান্ডমেন্টস অব ডিটেকশন* নামে আখ্যা দিয়েছিলেন। এই নিয়মগুলি পরে প্রবন্ধ হিসেবে *আ ডিটেকটিভ স্টোরি ডেকালগ* শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই লেখাগুলি গোয়েন্দা সাহিত্যের গবেষণার প্রতি আমার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করেছে।

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য বিষয়ক অধ্যাপক সুকুমার সেনের বিখ্যাত গবেষণামূলক বই *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* । বইটি পড়ে আমি বাংলার তো বটেই, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু গোয়েন্দার সম্পর্কে জানতে পারি। যা এই গবেষণায় আসার জন্য আমাকে আরও প্রাণিত করেছে।

বিশিষ্ট গবেষক – সমালোচক প্রসেনজিৎ দাশগুপ্তের দু'টি বই *রহস্যগল্পের নায়কেরা* এবং *সাহিত্যের গোয়েন্দা* । এই বইদু'টিতেও এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই বইগুলি থেকে আমি বহু তথ্য পেয়েছি, যা আমাকে নতুন করে ভাবিয়েছে।

কোরক সাহিত্য পত্রিকা বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশ করছিল। যে সংখ্যায় বহু বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ও প্রাবন্ধিক বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের নানান দিক নিয়ে নিজেদের মূল্যবান মতামত রেখেছেন। *কোরক* - এর এই সংখ্যাটিও আমার এই গবেষণার কাজে আমাকে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করেছে।

এছাড়াও, বহু বাঙালি ও বিদেশি সাহিত্যিক, যাঁরা গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছেন, এই বিষয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি আমি পড়েছি এবং চমৎকৃত হয়েছি।

গবেষণার জন্য বিষয় নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তাই *বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দারা* এই নির্দিষ্ট পরিসরটি আমার কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। আমার গবেষণার কালপর্ব ১৮৯০ থেকে ২০১৫। এই সময়ের মধ্যবর্তী বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দাদের নিয়ে এই গবেষণা সন্দর্ভে বিভিন্ন দিক থেকে উঠে এসেছে আলোচনা। ১৮৯০ - তে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের *দারোগার দপ্তর* - এর প্রথম কাহিনি প্রকাশিত হয়, তাই তা থাকল এই গবেষণার সূচনাবিন্দুতে। আর ২০১৫ - তে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাসাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যর মেয়ে গোয়েন্দা মিতিন – এর কাহিনি শেষবারের মতো প্রকাশিত হয়। তাই তা থাকল শেষবিন্দুতে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র *বাংলায় ডিটেকটিভ গল্প* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যেটি ১৯৮১ - তে *শত প্রসঙ্গ* নামের প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত হয়। প্রবন্ধটি চমৎকার এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য। বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের মুখবন্ধ হিসেবে এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তার অধিকাংশই উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো মুশকিল –

“বর্তমান কালে অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা সাহিত্যেও ডিটেকটিভ গল্পের প্রাচুর্য যথেষ্ট, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, উচ্চাঙ্গের এই জাতীয় মৌলিক রচনা খুব বেশি চোখে পড়ে না। শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের পর সমান দরের লেখকের নাম বলতে বেশ আকাশপাতাল ভাবতে হয়। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও এই একটি জনপ্রিয় বিভাগের প্রতি সত্যকার ক্ষমতাবান লেখকদের এই ঔদাসীন্য বিস্ময়করই বটে। কারণ, রহস্য রোমাঞ্চের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। সেই আকর্ষণকে কেন্দ্র করে যে বিশেষ সাহিত্যের শাখা গড়ে উঠেছে তার জন্ম একেবারে আধুনিক কালেই বলা যায়।

...সুতরাং দেখা যাচ্ছে সাহিত্যে যাঁরা জাত বিচার করতে চান তাঁরা যতই নাসিকাকুঞ্চন করুন, তাঁদের নাকের বালাই নিয়ে গোয়েন্দা গল্পের মারা যাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। সাহিত্য সভার জমকালো পাকা আসরে তার আসন মিলুক না মিলুক মেলার বেশির ভাগ ভিড় তার তালিমারা শামিয়ানার তলায়। তার

কারণটা ব্যাখ্যা করে বলবার দরকার নেই। আমাদের মনের সবচেয়ে প্রবল যে বৃত্তি, অজানা সম্বন্ধে সেই কৌতুহলই গোয়েন্দা-কাহিনির মূলধন।

...যান্ত্রিক শৃঙ্খলা দিয়ে মুড়ে পৃথিবীকে আসলে না হলেও বাইরের চেহারায় আমরা ক্রমশ নিরাপদ একঘেয়ে ও সাধারণ করে তুলছি। যত অপটুভাবেই হোক রোমাঞ্চকর কাহিনি সেই সাধারণত্বের পর্দা সরিয়ে পৃথিবীর অন্তহীন রহস্যঘনিমাই বারবার ঘোষণা করতে চায়। ট্রামে বাসে লোকাল ট্রেনে আফিস কাছারি পর্যন্ত যাদের দৌড় অজানা দুঃসাহসের পথে বার হবার দুধের স্বাদ তারা এই ঘোলেই মেটায়। অভ্যাসে বাঁধা মন কিছুটা অন্তত পায় অপ্রত্যাশিতের মধ্যে মুক্তি।

...মানুষের এ আদিম উদ্দামতা সারবার নয়। সারাতে চাওয়াও ভুল। শুধু বিভ্রাট যাতে না ঘটতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এ উদ্দামতাকে শুধু শাসনে রাখবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এঞ্জিনের উদ্বৃত্ত বাষ্পবেগের জন্য যেমন সেফ্‌টি ভাল্‌ভ দরকার মানুষের বেলাতেও তেমনই। রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনি এ দিক দিয়ে এইরকম নিরাপদ ছিদ্র পথ নয় ? আমাদের মনের দুরন্ত বাষ্পবেগকে কিছুটা মুক্তি দিয়ে সমাজ সংসারকে সর্বনাশা বিস্ফোরণ থেকে যা বাঁচায়।

...তার আর একটা মহৎ দোষ এই যে, দৃষ্টিশক্তি তার বড় ক্ষীণ। কাছের অত্যন্ত মোটা জিনিস ছাড়া আর কিছু তার নজরে পড়ে না। তার রংকানা চোখে লাল ছাড়া আর কোনও বর্ণ যেন দুনিয়ায় নেই। খুনোখুনি না হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পাশের বাড়ি যে রূপকথার মায়াপুরীর চেয়ে রহস্যময় হতে পারে এ খবর সে জানেনা। গোয়েন্দার চেয়েও অদ্ভুত অসংখ্য মানুষ যে প্রতিদিন রাস্তাঘাটে ভিড় করে থাকে সে কথা সে ভুলে গেছে। হত্যাকারীর চেয়ে দারুণ রহস্য যে আমরা প্রত্যেকে প্রতি মুহূর্তে নিঃশব্দে নিজেদের বুকে গোপন করে চলেছি এ সত্য তার অজানা।

উত্তেজনার জন্য আদালত থানা লাশঘর থেকে কত দূর দুর্গমেই না সে গল্প ছুটে মরে, তবু সাহস করে অপরূপ পৃথিবীর সেই একটি বিস্ময়কর প্রান্তে কখনও পা বাড়ায় না যেখানে নিজেরা আমরা থাকি।"

আমার বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটিকে আমি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায়, *বিদেশি ছায়ায় বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য* । এই অধ্যায়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য কোথায় কোথায় এবং কীভাবে বিদেশি গোয়েন্দা সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত অথবা অনুপ্রাণিত হয়েছে। কোথায় হয়েছে সরাসরি অনুবাদ। বাঙালি গোয়েন্দা চরিত্রের সাথে বিদেশি কোন গোয়েন্দার কোথাও কোন মিল আছে কি না। মিল থাকলে তা কতদূর পর্যন্ত ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের পেশাদার গোয়েন্দারা* । বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ পরিসরে গোয়েন্দা কাহিনি লেখার ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং সেগুলি জনপ্রিয়তার নিরিখে বেশ উচ্চস্থানেই অবস্থিত। কিন্তু এযাবৎ কাল পর্যন্ত গোয়েন্দা কাহিনিগুলিকে নিয়ে যতটুকু আলোচনা হয়েছে, সেই কাহিনির গোয়েন্দা চরত্রটিকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা বা চর্চা হয়েছে তার তুলনায় সামান্যই। আমার গবেষণার কালপর্ব ১৮৯০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের *দারোগার দপ্তর* , কাজেই, বর্তমান গবেষণার সূচনাবিন্দু। আধুনিক বাংলা গোয়েন্দা বা ক্রাইম কাহিনির সূত্রপাত এই প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরেই। যদিও ভারতীয় সাহিত্যের তিন হাজার বছরের ধারাবাহিক ইতিহাসে, অর্থাৎ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে এবং আরও পরে বৌদ্ধজাতকের কাহিনিগুলিতে গোয়েন্দা গল্পের কিছু প্রাচীন মূল্যবান সূত্র পাওয়া যায়। উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যে ফ্রান্স ও ব্রিটেনে এবং তার কিছুকাল পরে ভারতবর্ষে পুলিশি ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কিন্তু ভালো ক্রাইম কাহিনির ঐতিহ্য তার অনেক আগে থেকেই ভারতে ছিল। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যে তার যথার্থ এবং ধারাবাহিক চর্চা শুরু হয়। পরবর্তীকালে বহু স্বনামধন্য সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় গোয়েন্দা গল্প – উপন্যাস রচনা করেছেন। উনিশ শতকের শেষ থেকে একুশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দাদের যে ধারা বহমান, সময়ের সাথে সাথে তাদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠন, ভাবনা চিন্তার বিচিত্র ধরণ, তাঁদের নীতি ও বিশ্বাস এবং অপরাধী নির্ণয়ের পদ্ধতিগত বৈচিত্র অনুসন্ধান করাই আমার এই অধ্যায়ের লক্ষ্য।

তৃতীয় অধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ভিন্ন পেশার গোয়েন্দারা* । বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক চরিত্র রয়েছে, যারা পেশাদার গোয়েন্দা নয়। তারা কেউ অন্যান্য কোন পেশার সাথে যুক্ত, কেউ বা নিজের কাজের জগত থেকে অবসর নিয়েছেন, কেউ বা নেহাতই পড়ুয়া। কিন্তু রহস্যভেদের নেশা ও সত্যের অনুসন্ধান তাদের টেনে এনেছে গোয়েন্দাগিরিতে। এই চরিত্ররা মূলত তাদের পেশাগত পরিসরেই গোয়েন্দাগিরি করে। সেক্ষেত্রে তাদের প্রফেশনাল এক্সপার্টিজ বা পেশাগত দক্ষতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তবে, সত্যানুসন্ধান যাদের নেশা, তারা কী আর এইটুকু সীমাবদ্ধ পরিসরে আটকে থাকে ! আর যারা খুদে পড়ুয়া, তাদের কৌতূহলী, অনুসন্ধিৎসু মনই তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায় নানান রহস্যময় ঘটনার সীমানায়। আমার এই অধ্যায়ের গোয়েন্দা চরিত্ররা তাই গোয়েন্দা হয়েও ঠিক গোয়েন্দা নয়। অথবা বলা যায়, তারা গোয়েন্দা না হয়েও গোয়েন্দা।

চতুর্থ অধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দারা* । বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দার সংখ্যা নেহাত কম নয়। যে – কোন ক্ষেত্রেই মেয়েদের পথচলার ইতিহাসের একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। গোয়েন্দাগিরিও তার ব্যতিক্রম নয়। দু'একটি বিক্ষিপ্ত উদাহরণ বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে কোনো মহিলার গোয়েন্দাগিরি নিয়ে লেখালেখির সূত্রপাত বিশ শতকের চল্লিশের দশকে, প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কলমে। কৃষ্ণা নামের একটি কিশোরী মেয়ের রহস্য – রোমাঞ্চ অভিযান নিয়ে লিখতেন তিনি। পরবর্তীকালে আরও অনেক নাম এই ধারায় সংযোজিত হয়েছে। সেখানে যেমন আছে স্কুল পড়ুয়া মেয়ের দল, তেমনই আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আছে কলেজের অধ্যাপিকা থেকে কর্পোরেট চাকুরে। এবং অবশ্যই আছে তেমন মেয়ে, যে গোয়েন্দাগিরিকেই পুরোদস্তুর পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। এইসব মেয়ে গোয়েন্দাদের ব্যক্তিজীবন ও পেশাদার জীবন, সংসার ও কর্মক্ষেত্র সব কিছুই স্রষ্টার কলমের নিপুণ আঁচড়ে চিত্রিত হয়েছে তাদের নিয়ে লেখা কাহিনিগুলিতে। এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সে বিষয়ে। অধ্যায়টির শুরুতেই প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে বিশ্বসাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দাদের কথাও।

পঞ্চম অধ্যায়, *পুলিশের কলমে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি (বাঁকাউল্লার দপ্তর, সেকালের দারোগা কাহিনী, দারোগার দপ্তর)* । এখানে মূলত উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের শুরুর দিকের কথা বলা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বাংলায় আধুনিক অর্থে গোয়েন্দা কাহিনি বা গোয়েন্দা গল্প লেখার সূত্রপাত। সাহিত্যের এই ধারা পাঠকমহলে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়, কাজেই তার জোগানেরও ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যেতে থাকে। বাংলা গোয়েন্দা গল্পের একেবারে গোড়ার দিকের কাহিনি সরকারি পুলিশের বা ফাঁড়ি দারোগার। কাজেই, সেখানে কল্পনার অবকাশ কম। পুলিশ কর্মচারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এইসব কাহিনিগুলি লিখেছিলেন। এইধরনের লেখাগুলির মধ্যে পড়বে *বাঁকাউল্লার দপ্তর, সেকালের দারোগার কাহিনী, দারোগার দপ্তর* ইত্যাদি। তৎকালীন সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে অপরাধের সাত-সতেরো চিত্র স্পষ্টভাবে ধরা আছে এইসব রচনায়। আছে সেইসব অপরাধের তত্ত্ব – তালাশ। বাংলার এইসব 'সত্যি' গোয়েন্দাদের সময়ের কথা আলাদা একটি অধ্যায়ে আলোচনা করার তাগিদ বেশি করে অনুভব করলাম তখন, যখন দেখলাম পরবর্তীকালের বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের কাল্পনিক বেসরকারী

গোয়েন্দা কাহিনিতে সবচেয়ে নির্মম ব্যবহার করা হয় পুলিশের সঙ্গে। সেখানে উপস্থিত পুলিশ কর্মচারীকে সারাক্ষণ তার নির্বুদ্ধিতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ইত্যাদি নিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়, তাদের ওপর ব্যঙ্গ – বিদ্রুপ – তাচ্ছিল্য বর্ষিত হতে থাকে প্রতি মুহূর্তে। গোয়েন্দার ক্ষমতার ঔজ্জ্বল্যকে বাড়িয়ে তোলার জন্য তাদেরকে একেবার বুদ্ধিহীন করে গড়ে তোলা হয়। কিন্তু বাস্তবে তো অপরাধের কিনারা করে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্তারাই। এই অধ্যায়ে তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সেই সব 'সত্যি' গোয়েন্দাদের কথা, যারা সাহিত্যের গোয়েন্দাদের মতো অতিমানবিক নয়, বরং রক্তমাংসের মানুষ।

বিশিষ্ট অধ্যাপক ও ভাষাবিদ সুকুমার সেন ক্রাইম কাহিনিকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথমটি, খাঁটি ডিটেকটিভ কাহিনি, যাকে বাংলায় উনি বলছেন হুনুরি কাহিনি। যেখানে নিজের বুদ্ধিবলে তদন্ত করে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে অপরাধ ও অপরাধী নির্ণয় করেন একজন হুনুর বা ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দা। অধ্যাপক সেনের লেখা থেকেই জানা যায়, প্রাচীন শব্দ 'সূনর' পাওয়া যাচ্ছে সংস্কৃতে এবং আবেস্তায় ও প্রাচীন পারসিকে। সুতরাং শব্দটি এসেছে ইন্দো – ইরানীয় যখন এক ভাষা ছিল তখন থেকে (আনুমানিক ১৫০০ খৃঃ পূঃ)। এই শব্দটির অর্থ সংস্কৃতে কিছু বদলে গেছে। তবে তা অবিকৃত ছিল প্রাচীন ইরানীয় ভাষায়। সেখানে শব্দটির অর্থ ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দক্ষ ব্যক্তি। এই ফার্সি শব্দ 'সূনর' বাংলায় এসে হয়েছে হুনুর।

আর, ক্রাইম কাহিনির দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে ইনভেস্টিগেশন কাহিনি, যাকে বাংলায় জাসুসি কাহিনি বলা যায়। অর্থাৎ, যে ধরনের গল্পে পুলিশ অথবা গোয়েন্দা দলবল নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে, তারপর সেসব বিশ্লেষণ করে অপরাধ ও অপরাধী নির্ণয় করে।

আমাদের এই বর্তমান গবেষণাপত্রে এই সবকিছুই ধরা থাকল আলোচনার প্রেক্ষিতের প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী।

প্রথম অধ্যায়

বিদেশি ছায়ায় বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য

অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি বইতে লিখেছেন –

"প্রাচ্য গগন থেকে বিস্তৃত হয়ে ক্রাইম কাহিনীর পূর্বরাগ পাশ্চাত্য গগন প্রান্তে ঘনীভূত হয়ে অরুণোদয় সম্ভাবিত করলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। প্রথমে ফরাসী ভাষায়। পরে ফরাসীতে ও ইংরেজীতে গোয়েন্দা-কাহিনীর যে উদ্ভব ও বিস্তার ঘটেছে তার বীজ উড়ে এসেছিল ভারতবর্ষ, ইরাণ, ইরাক, সীরিয়া, আর্মেনিয়া, তুর্কি, মিশর, চীন প্রভৃতি দেশে নিকট-মধ্য ও দূর-প্রাচ্য দেশগুলির লৌকিক কাহিনী থেকে। বিভিন্ন প্রাচ্যদেশের গল্পগুলি ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আরবী (ও ফার্সী) ভাষায় সংগৃহীত হয়েছিল। এমন সংগ্রহের বৃহত্তম সংহিতা হল আরব্য উপন্যাস। ...আধুনিক গোয়েন্দা-কাহিনীর উৎপত্তি খুঁজতে গেলে আমরা বোধ করি সরাসরি কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে আরব্য উপন্যাসে পৌঁছই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত ফরাসী পন্ডিত সাহিত্যিক, প্রচন্ড প্রতিভাধর মহামনস্বী ভলটেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) আরব্য উপন্যাস থেকে মাল-মশলা নিয়ে আধুনিক ক্রাইম কাহিনীর প্রথম গোয়েন্দার ছক আঁকলেন। এর নাম দিলেন 'জাদিগ'। নামটি আরবী নাম 'সাদেক'-এর ফরাসী রূপান্তর। আত্মজীবনীর ছায়া নিয়ে নিজস্ব কল্পনা থেকে জাদিগ কাহিনী যোজনা করে ভলটেয়ার দুটি একটি গোয়েন্দা কাহিনীর মতো লিখে তাঁর উপন্যাসের মধ্যে গেঁথে দিয়েছিলেন (প্রকাশ ১৭৪৭ খৃঃ অঃ)।
(অপর দিক দিয়ে দেখলে বলা যেতে পারে যে জাদিগ যেন কোনান ডয়েলের শিক্ষাগুরু জোসেফ বেলের পূর্বপুরুষ। তিনি সামান্য ক্লু থেকে অদেখা বা জীব এবং অজানা ঘটনা বলে দিতে পারতেন)।"[১]

গল্পের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। রাজা মোয়াবদারের রাজত্বকালে ব্যাবিলনে জাদিগ নামে এক বিত্তশালী সদাশয় ব্যক্তি বসবাস করতেন। তিনি শিক্ষিত, মার্জিত স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। মানুষ যতদূর জ্ঞানী হতে পারে, তিনি ততটাই প্রাজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু পান্ডিত্যের অহংকার কখনোই তাঁর ছিল না।
জাদিগ তাঁর একাকী জীবনে সময় কাটাতে পশুপাখি এবং কীটপতঙ্গের অবস্থা ও আচরণ খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতেন। ফলত, খুব শীঘ্রই তিনি এই ব্যাপারে এমন স্বচ্ছ দৃষ্টি লাভ করলেন, যা অন্যান্যদের চোখে ধরা পড়ত না, তা বেশ সহজেই তিনি ধরে ফেলতে পারতেন।
একবার ব্যাবিলনের রাণীমার পোষ্য কুকুর রাজপ্রাসাদ থেকে হারিয়ে যায়। এবং প্রায় একই সময়ে রাজার ঘোড়াও সহিসের হাত ছাড়িয়ে পালায়। হারেমের প্রহরী কুকুরের সন্ধানে এসে জাদিগকে প্রশ্ন করে, তিনি কুকুরটিকে দেখেছেন কী না। উত্তরে জাদিগ

বলেন, সেটা কুকুর নয়, কুক্কুরী, এবং সেটা একটা ছোট্ট স্প্যানিয়েল যার বাঁদিকের সামনের পা-টা একটু খোঁড়া, আর কানগুলো খুব ঝোলা, আর কিছুদিন আগেই তার বাচ্চা হয়েছে। উল্লেখ্য, জাদিগ এই প্রাণীটিকে আগে কখনও দেখেননি।

ঠিক এই সময়ে, রাজার সবচেয়ে প্রিয় ঘোড়া, যেটা সহিসের হাত ছাড়িয়ে ব্যাবিলনের উপত্যকায় পালিয়ে গেছে, আস্তাবলের প্রহরীরা তার খোঁজে জাদিগকে এসে পাকড়াও করল। জাদিক সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘোড়ার বর্ণনা দিয়ে দিলেন, যে সেটি সবচেয়ে ভাল দৌড়দার ঘোড়া, প্রায় সাড়ে তিন হাত উঁচু, আর তার খুরগুলো খুব ছোট। ঘোড়ার লেজটি সাড়ে তিনি ফুট লম্বা। তার মুখের লাগামে সোনার খলীন আছে। এবং প্রত্যেক খুরের নাল এগারো আউন্স রূপোয় তৈরি। বলা বাহুল্য, জাদিগ এই ঘোড়াটিকেও আগে কখনও দেখেননি।

সবাই যখন জাদিগকেই চোর বলে সন্দেহ করে বন্দী করে বিচারসভায় নিয়ে যায়, তখন বিচারকের সামনে জাদিগ বলেন –

“ঈশ্বরের নামে শপথ করে আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে আমি রানীর মাননীয়া কুক্কুরী বা রাজার পবিত্র অশ্ব কোনটিই চোখে দেখিনি। ...আমি যখন ওই ছোট বনটার ধারে হাঁটছিলুম, তখন আমার সঙ্গে হারেমের শ্রদ্ধেয় প্রধান প্রহরী এবং সুবিখ্যাত রাজ-আস্তাবলের দারোগার সঙ্গে দেখা হয়। আমি বালির মধ্যে কিছু পদচিহ্ন দেখতে পাই এবং সহজেই বুঝতে পারি যে তা একটি কুকুরের পায়ের ছাপ। এই পদচিহ্নের মাঝখানে আমি একটি টানা সরু দাগ দেখতে পাই, যার থেকে আমি অনুমান করেছিলুম যে পশুটি একটি কুক্কুরী যার বাঁটগুলো ঝুলে পড়েছে এবং তার মানেই এই কুক্কুরী অল্প কিছুদিন আগে সন্তান প্রসব করেছে। সামনের পায়ের কাছে বালি ঘষে যাওয়ার ফলে আর এক জোড়া দাগ হয়েছে যার থেকে বুঝতে পারলুম যে কুক্কুরীটির কানগুলো খুব ঝোলা এবং আমি আরো দেখলুম যে পায়ের একটি থাবার দাগ অন্য দাগগুলোর তুলনায় অগভীর। এর থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে এলুম যে আমাদের মহান রানীমার কুক্কুরীটির একটি পা খোঁড়া।

রাজার ঘোড়ার ব্যাপারে বলতে পারি যে আপনারা বোধহয় জানেন যে আমি যখন বনের পথ ধরে হাঁটছিলুম তখন আমি সমান দূরত্বে ঘোড়ার নালের ছাপ দেখতে পাই। সেইজন্যেই আমি বলেছিলুম যে ঘোড়াটি খুব দৌড়দার। এই সাত ফুট চওড়া রাস্তার দুধারে যে গাছ আছে তার গায়ে সাড়ে তিন ফুট উঁচু অবধি ধুলো লেগেছে। আমি বলেছি যে এই ঘোড়াটির লেজ সাড়ে তিন ফুট লম্বা এবং এই লেজের ডাইনে বাঁইয়ে দোলানোর জন্যে গাছের গায়ে এই দাগ লেগেছিল। আমি আরও দেখেছি যে গাছতলায় কিছু কচি পাতা পড়ে আছে যার থেকে থেকে আমি বুঝতে পারলুম যে ঘোড়াটির মাথা এই গাছগুলোর ডাল স্পর্শ করেছে। এই ডালগুলো মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু এবং তার থেকেই অনুমান করেছিলুম যে ঘোড়াটা যে পাথরের ওপর ওই নালের পেরেকগুলো ঘষেছিল সেটা কষ্টিপাথর। পাথরের গায়ে

ঘোড়ার খুরের যে দাগ পড়েছিল তা পরীক্ষা করে আমি জানতে পেরেছি যে, ওই ঘোড়াটির নাল এগার আউন্স রূপোর তৈরি।"[২]

খুব সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, আধুনিক গোয়েন্দা গল্পের নায়কের এক চমৎকার সূত্রপাত হয়ে গিয়েছিল ভলটেয়ারের হাত ধরে। পরবর্তীকালের দেশ-বিদেশের বহু গোয়েন্দা চরিত্র জাদিগের এই ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির মাহাত্ম্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সৃষ্ট হয়েছিল। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হবে বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমসের কথা, যাঁর স্রষ্টা ব্রিটিশ চিকিৎসক স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, এবং বাংলা সাহিত্যের পরিসরে অবশ্যই আসবে সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা প্রদোষচন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদার কথা, যিনি প্রথম সাক্ষাৎ - এ লালমোহনবাবু ওরফে জটায়ুকে তো বটেই, এমনকি পরবর্তীকালে বহুবার তার মক্কেলদের প্রথমবার দেখেই তাদের সম্পর্কে নানান অকাট্য তথ্য জানিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারতেন।

জাদিগের ঘটনার পাশাপাশি দু'টি কাহিনি থেকে দু'টি উদাহরণ তুলে দিলেই এই প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে।

প্রথম ঘটনা, *আ স্টাডি ইন স্কারলেট* উপন্যাসে, সম্পূর্ণ অপরিচিত ডাঃ জন ওয়াটসনের সঙ্গে শার্লক হোমসের প্রথম সাক্ষাতেই তিনি যে আফগানিস্তান-ফেরত, সে তথ্য ওয়াটসনকে বলে রীতিমত চমকে দিয়েছিলেন শার্লক। তাদের একত্রবাস শুরু হবার পর একদিন শার্লক ধীরে-সুস্থে ওয়াটসনকে বুঝিয়েছিলেন তাঁর অবরোহণমূলক সিদ্ধান্ত বা থিওরি অব ডিডাকশন সম্বন্ধে। তাদের কথোপকথন খানিকটা এইরকম –

"...পর্যবেক্ষণ আর অনুমান – চোখ দিয়ে দেখে অবরোহণমূলক সিদ্ধান্তে আসার প্রবণতা – দুটোই রয়েছে আমার মধ্যে।

কীভাবে ? আপনা হতেই প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

আমার একটা পেশা আছে। আমার বিশ্বাস এ-পেশায় পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমি কনসাল্টিং ডিটেকটিভ। জানি না মানেটা বুঝতে পারলে কিনা। লন্ডন শহরে অনেক সরকারি ডিটেকটিভ, অনেক প্রাইভেট ডিটেকটিভ আছে। এরা যখন ভুল করে, আমার কাছে আসে, আমি ওদের ভুল শুধরে দিয়ে ঠিক লাইন দেখিয়ে দিই। সাক্ষ্যপ্রমাণ আমার সামনে হাজির করে, আমি অপরাধ ইতিহাসের

পরিপ্রেক্ষিতে আমার জ্ঞান বিদ্যের জোরে সেগুলোকে পরপর সাজিয়ে দিই। সব কুকর্মের মধ্যেই একটা মিল থাকে, পারিবারিক সাদৃশ্যও বলতে পার, একহাজার কুকর্ম যদি তোমার নখদর্পণে থাকে, এক হাজার এক নম্বর রহস্যটা কী ধরনের কুকর্ম, তা বলতে না-পারাটাই বরং অদ্ভুত।

...তার মানে কি বলতে চাও অন্য লোকে অকুস্থলে গিয়ে চোখে দেখে কানে শুনেও যা জানেনি, তুমি স্রেফ ঘরে বসে তা জেনে ফ্যালো ?

হ্যাঁ তা পারি। ও-ব্যাপারে আমার একটা সহজাত ক্ষমতা আছে। মাঝে মাঝে আমাকে ছুটোছুটি করতে হয় – নিজের চোখে দেখতে হয়। অনেকরকম বিশেষ জ্ঞান আমি জানি। এইসব জ্ঞান প্রয়োগ করি সমস্যায় এবং অদ্ভুত ফল পাই। প্রবন্ধে অবরোহ প্রণালীর যে- নিয়মগুলো লিখেছি, যা পড়ে নাক সিঁটিয়ে অনেক ঝাল-টক মন্তব্য করলে, আমার কাছে তা অমূল্য এবং অত্যন্ত বাস্তব। পর্যবেক্ষণ আমার দ্বিতীয় প্রকৃতি। প্রথম সাক্ষাতে তোমাকে বলেছিলাম তুমি আফগানিস্তান ঘুরে এসেছ – শুনে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে।

কারো মুখে শুনেছিলে নিশ্চয়।

মোটেই না। কিন্তু আমি জানতাম তুমি আফগানিস্তান ঘুরে এসেছ। অনেক দিনের অভ্যেস আর চর্চার ফলে একটার পর একটা চিন্তা এত দ্রুত মাথার মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়েছিল যে তোমাকে দেখামাত্র অমোঘ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছি – মাঝের ধাপগুলো সম্বন্ধে সজাগ থাকিনি ! ধাপগুলো কী, এবার তা বলছি। ধারাবাহিক যুক্তিগুলো শুনলেই বুঝবে কী করে তুমি আফগানিস্তান ফেরত। ভাবলাম, ভদ্রলোকের চেহারা ডাক্তারের মতো – কিন্তু হাবভাব মিলিটারি। নিঃসন্দেহে আর্মি ডাক্তার। চামড়া পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে – স্বাভাবিক রং নয় – কেননা কবজি বেশ ফর্সা, তার মানে ভদ্রলোক বিষুবরেখা বরাবর কোনো জায়গায় ছিলেন। চোখ-মুখ উদ্ভ্রান্ত, শীর্ণ, কাহিল – তার মানে প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। বাঁ-হাতটাও দেখছি জখম হয়েছে। হাতটা অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় আড়ষ্টভাবে উঁচু করে রয়েছেন। ক্রান্তীয় রেখা বরাবর কোনো অঞ্চলে থাকলে একজন মিলিটারি ডাক্তারের পক্ষে এত কষ্ট সওয়া এবং হাত জখম হওয়া সম্ভব অবশ্যই আফগানিস্তানে। এতগুলো চিন্তা করতে কিন্তু এক সেকেণ্ড সময়ও লাগেনি। তাই সঙ্গেসঙ্গে মন্তব্য করেছিলাম তুমি আফগানিস্তান ফেরত। শুনে অবাক হয়েছিলে।”[৩]

আর দ্বিতীয় ঘটনা, *সোনার কেল্লা* উপন্যাসে, আগ্রা ফোর্ট স্টেশন থেকে বান্দিকুই যাওয়ার পথে ট্রেনে লালমোহনবাবুর সাথে ফেলুদা-তোপসের প্রথম মোলাকাত।

“আমরা আগ্রা থেকে কিছু গুলাবি রেউড়ি নিয়ে এসেছিলাম, ফেলুদা ঠোঙাটা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘আপনি তো বেশ কিছু দিন থেকেই ঘুরছেন বলে মনে হচ্ছে।’

ভদ্রলোক ‘হ্যাঁ, তা - ’ বলে একটা রেউড়ি তুলে নিয়েই কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। ফেলুদার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললেন, আপনি জানলেন কী করে ?

ফেলুদা হেসে বলল, ‘আপনার ঘড়ির ব্যান্ডের তলা দিয়ে আপনার গায়ের চামড়ার রোদে-না-পোড়া আসল রংটা মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে।’

ভদ্রলোক চোখ গোল গোল করে বললেন, ‘ওরেব্বাস্‌রে, আপনার তো ভয়ঙ্কর অবজারভেশন মশাই।...’

...ফেলুদা পকেট থেকে একটা নীল পেনসিল বার করে হাতের বইটাতে দাগ দিচ্ছিল, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, ‘কিছু মনে করবেন না – আপনি কি মশাই গোয়েন্দা জাতীয় কিছু ?’

কেন বলুন তো ?

না, মানে, যেভাবে ফস করে তখন আমার ব্যাপারটা বলে দিলেন...

আমার ও ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে।”[৪]

❖

আধুনিক গোয়েন্দার একটি রেখাচিত্র ভলটেয়ারের কলমে তৈরি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি আধুনিক ডিটেকটিভ কাহিনির মতো কিছু লেখেননি। কারণটা অনুমান করা কঠিন নয়। এখনকার মত পুলিশি ব্যবস্থা ও ফৌজদারি আইনকানুন তখনকার সময়ে ছিল না। প্রথম আধুনিক ক্রাইম কাহিনি সম্ভবত লিখেছিলেন একজন ফরাসী পুলিশ কর্মচারী, ফ্রাঁসোয়া ইউজিন ভিদক। তবে তাঁর আগেই ফ্রান্সে পুলিশি ব্যবস্থার প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। ভিদক সরাসরি এই ব্যবস্থা পত্তনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এবং অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে, তিনিই যে প্রথম ক্রাইম কাহিনি চালু করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সেগুলি তিনি সরাসরি লিখেছিলেন কী না, সে বিষয়ে মতান্তর আছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, ভিদকের কাহিনিগুলি এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল, যে ভিক্টর হুগো, বালজাক, আলেকজান্ডার ডুমা, ইউজিন স্যু – প্রমুখের মতো সমকালীন উঠতি সাহিত্যিকেরা সেই কাহিনিগুলিকে গ্রন্থিত করেছিলেন।

ইউজিন ফ্রাঁসোয়া ভিদক (১৭৭৫-১৮৫৭) একজন বিচিত্র মানুষ। তাঁর চমৎকার জীবনের একটু পরিচয় দেওয়া যাক। তিনি একজন ফরাসী নাগরিক। প্রথম জীবনে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। দুটি যুদ্ধেও তিনি সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। শোনা যায়, কিছু ছোটখাটো অপরাধ করার জন্য অল্প কিছুদিন তিনি জেলও খেটেছিলেন। তারপর নানা সময়ে নানা ব্যবসা করে ব্যর্থ হন, অবশেষে ১৮০৯ খৃস্টাব্দে তিনি সরকারী চাকরিতে যোগ দেন এবং পুলিশের দপ্তর খুলে বসেন। ফ্রান্সের রাজ সিংহাসনে তখন সম্রাট নেপোলিয়ন। ১৮২৭ – এ আবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কাগজ ও কার্ডবোর্ড তৈরির কারখানা খোলেন। এবং খুব মজার ব্যাপার, সেই কারখানায় তিনি সব জেল - ফেরত আসামীদের চাকরি দিয়েছিলেন। যদিও সেই কারখানা বেশিদিন চলেনি। এরপর লুই ফিলিপের শাসনকালে পুনরায় তিনি পুলিশ বিভাগের কাজে যোগ দেন, এবং সেই বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৮৩২ সাল নাগাদ তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা খোলেন। কিন্তু, সরকারী নির্দেশে অচিরেই সেই সংস্থা তুলে দিতে হয়। এরপর তিনি ১৮৪৮ – এ *লামার্টিন* - এর সাথে যুক্ত হয়ে বিদ্রোহে যোগ দেন।

ভিদক তাঁর বিচিত্র কার্যকলাপের জন্য তাঁর জীবদ্দশাতেই সমগ্র ফরাসী দেশে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ভিদকের নামে অনেকগুলি বই প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল, *মেমোয়ার দ্য ভিদক* (১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮২৮ সালে); আর বাকি তিন খণ্ড বেরোয় ১৮৩৬ থেকে ১৮৪৬ – এর মধ্যে। আগেই বলেছি, ভিদকের বইগুলি তাঁর নিজের লেখা নয় বলে অনেকে মনে করেন। তবে বইয়ে বর্ণিত কাহিনিগুলি যে ভিদকের নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ অথবা কল্পনাপ্রসূত, সে বিষয়ে কোনো তর্কের অবকাশ নেই। অধ্যাপক সেন লিখেছেন –

"ভিদক্ তাঁর গ্রন্থাবলীর রচয়িতা হোন বা না হোন, কাহিনীগুলির যে নির্মাতা তাতে সন্দেহ করা চলে না। মহাভারতে যেমন গণেশ কালিকলম দিয়ে তালপাতায় লিখেছিলেন আর বেদব্যাস তা রচনা করে মুখে মুখে বলে গিয়েছিলেন, তেমনি 'মেমোয়ার দ ভিদক্' ইত্যাদির লেখক যেই হন, স্রষ্টার গৌরব ভিদকের প্রাপ্য।"[৫] পৃ ৪৮

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পুলিশি কাহিনি বা ফাঁড়ি দারোগার অভিজ্ঞতা থেকে লেখা রচনার সূত্রপাত আরও চল্লিশ বছরেরও বেশি পরে হয়। গিরিশচন্দ্র বসুর *সেকালের দারোগার কাহিনী, বাঁকাউল্লার দপ্তর* অথবা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের *দারোগার দপ্তর* প্রথম প্রকাশিত

হয় ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যে। তার আগেই ইউরোপে ভিদকের কাহিনিগুলি প্রকাশিত ও জনপ্রিয় হয়ে গেছে। যদিও গিরিশচন্দ্র বসু, বাঁকাউল্লা সাহেব অথবা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁদের কোনো লেখাতেই ভিদকের লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই ধরনের পুলিশি কাহিনি রচনার সূত্রপাত করেছিলেন কী না, সে বিষয়ে কিছু বলেননি।

❖

বিখ্যাত মার্কিন কবি ও সাহিত্যিক এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯) কবি হিসেবে সুপরিচিত হলেও বেশ কয়েকটি ছোটগল্প লেখেন, যার মধ্যে *দ্য মার্ডার ইন দ্য রু মর্গ* (ফিলাডেলফিয়া থেকে *গ্রাহাম্‌স্‌* ম্যাগাজিনে এপ্রিল, ১৮৪১ - এ প্রকাশিত), *দ্য মিস্ট্রি অফ মেরি রোঁজে* (১৮৪২-৪৩) এবং *দ্য পারলয়েণ্ড লেটার* (১৮৪৫) নিঃসন্দেহে প্রকৃত অর্থেই আধুনিক গোয়েন্দা গল্প। এই গল্প তিনটি এবং কয়েকটি ভয়ের গল্প গ্রন্থিত হয় প্রথমে *টেলস্‌* (১৮৪৫) নামে, যা বর্তমানে *'টেলস্‌ অফ মিস্ট্রি অ্যান্ড সাসপেন্স'* নামে পরিচিত। এই সংকলনের হাত ধরেই যথার্থ আধুনিক ডিটেকটিভ কাহিনির যাত্রা শুরু।

পো তাঁর গোয়েন্দা গল্পে তাঁর গোয়েন্দাপ্রবর দ্যুপাঁ-কে মূর্তিমান 'হুনুর' হিসেবে গড়ে তুলতে গিয়ে কাহিনির পরিকল্পনায় ততটা দক্ষতা দেখাতে পারেননি। ভলটেয়ার জাদিগকে তীক্ষ্ণধী সূক্ষ্মদৃষ্টি পণ্ডিত হিসেবে তৈরি করেছিলেন। জাদিগের মধ্যে আধুনিক গোয়েন্দার সমস্ত যোগ্যতা থাকলেও তাঁকে ঠিক বাস্তব গোয়েন্দা হিসেবে আঁকেননি তিনি। অ্যালান পো – এঁর মঁসিয়ে দ্যুপাঁ প্রথম সম্পূর্ণ বাস্তব গোয়েন্দা চরিত্র, যার প্রভাব পরবর্তীকালের বহু কাল্পনিক গোয়েন্দার ওপরে পড়েছে। যদিও, পো যখন দ্যুপাঁ-র কাহিনি লিখছেন, তখনও 'ডিটেকটিভ' কথাটা চালু হয়নি। ইংরেজিতে বিশেষণ অর্থে 'ডিটেকটিভ' শব্দটি প্রচলিত হয়েছিল ১৮৪২ খৃস্টাব্দ থেকে। আর ১৮৫৬ থেকে বিশেষ্য অর্থে।

পো-র সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্রটির নাম মঁসিয়ে দ্যুপাঁ – ধনী ফরাসী পরিবারের সন্তান (ফরাসী গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টির পিছনে কী ভলটেয়ার বা ভিদকের প্রভাব ছিল?), সখের গোয়েন্দা এবং তর্কশাস্ত্রের বিশ্লেষণে রহস্য সমাধানে তুখোড়। মনে করা হয়, কোনান ডয়েলের

শার্লক হোমস চরিত্রটি এই কাঠামোর উপরে তৈরি। ডয়েল নিজেও এই ঋণ স্বীকার করেছেন। পো-র সব গল্পই ১৯৭০-এর দশক থেকে রহস্য রোমাঞ্চ গল্প ইত্যাদি নামে অদ্রীশ বর্ধন, মণীন্দ্র দত্ত, হীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলায় অনুবাদ করেছেন। আরও আগে, সম্ভবত ১৯৬০-এর দশকে হেমেন্দ্রকুমার রায় অনুবাদ করেন *হত্যাকারীর হত্যাকাহিনী* নাম দিয়ে।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৩২- এ প্রথম প্রকাশিত হলো শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৩০ মার্চ ১৮৯৯ - ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭০) দ্বিতীয় ব্যোমকেশ কাহিনি *সীমন্ত-হীরা* । এই গল্পের কাহিনি যে অ্যালান পো - এঁর *দ্য পারলয়েন্ড লেটার* - এর কাহিনি থেকে অনুপ্রাণিত বা অনুসৃত, এ কথা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। শরদিন্দুর গল্পে ব্যোমকেশ মহা মূল্যবান সীমন্ত-হীরাটি উদ্ধার করে স্যার দিগিন্দ্রের পড়ার টেবিলের ওপরে অযত্নে পড়ে থাকা একটি নটরাজ-মূর্তির পেট থেকে, ঠিক যেভাবে দ্যুঁপা একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি খুঁজে পেয়েছিলেন একেবারে সাধারণ, সবার-চোখের-সামনে-থাকা ম্যান্টলপিসের ওপরে থাকা একটি কার্ড-র‍্যাকের ভেতর থেকে।

❖

১৮৫০-এর দশকের আগে ইংল্যান্ডে লেখা কোনও ক্রাইম কাহিনির হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-১৮৭০) তাঁর *ব্লিক হাউস* (১৮৫৩)। তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা ছিল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর বাকেট। উল্লেখ্য, স্যার রবার্ট পীল বিলেতে লন্ডনে মেট্রোপলিটান পুলিশ বিভাগের পত্তন করেন ১৮২৯ সালে। এর ডিটেকটিভ বিভাগ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড চালু হয় ১৮৪২ থেকে। মৃত্যুর আগে ডিকেন্স *দ্য মিস্ট্রি অফ এড্‌উইন ড্রুড* (১৮৭০) নামে আরও একটি রহস্য উপন্যাসে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু তা শেষ করে যেতে পারেননি। ডিকেন্সের অন্যান্য উপন্যাসের মতন *ব্লিক হাউস* – ও একাধিকবার বাংলায় অনূদিত হয়েছে, তবে *এড্‌উইন ড্রুড* অনুবাদ করা হয়েছে বলে জানা নেই। ডিকেন্সের অত্যন্ত প্রিয় ঔপন্যাসিক উইলকি কলিন্স (১৮২৪-৮৯) ৩০টি উপন্যাস লিখেছেন, তবে তার মধ্যে *দ্য ওম্যান ইন হোয়াইট* (১৮৬০) এবং

দ্য মুনস্টোন (১৮৬৮) উপন্যাস দুটি ক্লাসিক গোয়েন্দা কাহিনি বলে স্বীকৃত। প্রথমটি বাংলায় অনূদিত হয় উনিশ শতকের শেষভাগে – নাম *শুক্লবসনা সুন্দরী*, অনুবাদক দামোদর মুখোপাধ্যায়।

******

পো গোয়েন্দা সৃষ্টি করেছিলেন ছোটো গল্পের সংকীর্ণ পরিসরে। সাহিত্যের অঙ্গনে দ্যুপাঁর আবির্ভাবের প্রায় পঁচিশ বছর পরে ফরাসী লেখক এমিল গাবোরিও (১৮৩২-১৮৭৩) উপন্যাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সাহিত্যকে মুক্তি দেন। তেরো বছরের মধ্যে প্রায় কুড়িটির মতো উপন্যাস রচনা করে ফরাসী সাহিত্য জগতে তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

গাবোরিও তাঁর ক্রাইম গল্প-উপন্যাসে বেশ কয়েকজন ডিটেকটিভ চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মঁসিয়ে ল্যুকক, যিনি ফরাসী পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত একজন সরকারী কর্মচারী। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, গাবোরিও তাঁর এই চরিত্রটি সৃষ্টি করার সময়ে হয়তো ভিদকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ল্যুককে নিয়ে তিনি পাঁচটি উপন্যাস এবং একটি বড়গল্প লিখেছিলেন। প্রথম উপন্যাস *লা অ্যাফেয়ার দ্য ভিলা রুজ* ১৮৬৬ সালে প্যারিসের একটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে *লা ক্রিম দ্য অরসিভাল (১৮৬৭), লা ডসিয়ে নম্বর ১১৩ (১৮৬৭), লা এসক্লাভ দ্য পারিস (১৮৬৮), মঁসিয়ে ল্যুকক (১৮৬৯) শীর্ষক উপন্যাস এবং দ্য ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স* (১৮৭৬) নামের বড়গল্পটি লেখেন।

গাবোরিওর গল্প-উপন্যাসগুলি ইংরাজিতে অনূদিত হয়েছিল বলে বহুল জনপ্রিয় হয়েছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন, পরবর্তীকালের গোয়েন্দা সাহিত্যে কোথাও কোথাও পো – এঁর দ্যুপাঁ এবং গাবোরিওর মঁসিয়ে ল্যুককের বেশ গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত, শার্লক-কাহিনি *আ স্টাডি ইন স্কারলেট* – এর অংশবিশেষ এখানে উল্লেখযোগ্য। শার্লক হোমসের অবরোহমূলক সিদ্ধান্তের দু'-চারটি উদাহরণ শুনে অভিভূত ওয়াটসন তাঁকে দ্যুপাঁ – র সাথে তুলনা করার পর শার্লকের বয়ানে ডয়েল কী বললেন, খেয়াল করা যাক।

"উঠে দাঁড়িয়ে তামাকের পাইপ ধরিয়ে শার্লক হোমস বললে – 'দুঁপির সঙ্গে আমার তুলনা করছ নিশ্চয় প্রশংসা করার জন্যে। আমার মতে দুঁপি খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণির জীব। মিনিট পনেরো চুপচাপ থাকার পর বন্ধুর চিন্তাটাকে দুম করে বলে দেওয়ার মধ্যে লোক দেখানো বাহাদুরি আছে ঠিকই, কিন্তু গভীরতা নেই। পো যা কল্পনা করতে চেয়েছিলেন, দুঁপি তা আদৌ নয়।'

গ্যাবোরিয়র বই পড়েছ ? লেকক-কে আদর্শ ডিটেকটিভ বলে মনে কর ?

শ্লেষের হাসি হাসল শার্লক হোমস। রাগত স্বরে বলল, 'লেকক হচ্ছে একটা যাচ্ছেতাই রকমের আনাড়ি ডিটেকটিভ। এনার্জি ছাড়া লেককের নিজস্ব বলে আর কিছু নেই। বইটা পড়ে শরীর পর্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। সমস্যাটা কী ? একজন অজ্ঞাতনামা কয়েদিকে শনাক্ত করা – এই তো ? চব্বিশ ঘন্টায় আমি তা পারতাম। লেকক নিয়েছে ছ-মাস। তদন্ত করতে গিয়ে কী কী বর্জন করা দরকার এই নিয়ে পাঠ্যপুস্তক লিখলে গোয়েন্দাগুলোর কিছুটা শিক্ষা হত !'

আমার প্রাণপ্রিয় দুটো চরিত্রকে এইরকম উদ্ধতভাবে ধুলিসাৎ করে দেওয়ায় হাড়পিত্তি জ্বলে গেল আমার। জানালার সামনে গিয়ে যানবাহন পথিক সরগরম রাস্তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, 'হতে পারে লোকটা খুবই ধূর্ত, কিন্তু দাম্ভিক।'"[৬]

❖

উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার স্যার আর্থার কোনান ডয়েল (১৮৫৯-১৯৩০) সৃষ্টি করলেন এক অমর চরিত্র – শার্লক হোমস। শুধু বাংলায় নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে ওই গোয়েন্দা চরিত্রের যা প্রভাব দেখা যায়, তা অন্য কোনও ধরণের চরিত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। গোয়েন্দা শার্লক হোমসের সহচর ও বন্ধু ডাঃ ওয়াটসন হোমস-কাহিনিগুলির কথক। এই হোমস-ওয়াটসন জুটি অমর হয়ে আছে ১২৫ বছর ধরে এবং এর সঙ্গে নীহাররঞ্জন গুপ্তের কিরীটি-সুব্রত বা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ-অজিত জুটি অবশ্যই তুলনীয়। শার্লক হোমস চরিত্রের প্রেরণা ডয়েল পেয়েছিলেন তাঁর ডাক্তারির শিক্ষক ডাঃ জোসেফ বেলের কাছ থেকে, অনেকে মনে করেন, তাঁর উপরে প্রভাব পড়েছিল পো-র ইন্সপেক্টর দ্যুপাঁ আর এমিল গাবোরিওর ল্যুকক - এর, কিন্তু পো – এঁর

চরিত্র মঁসিয়ে দ্যুঁপা খাঁটি ডিটেকটিভ হলেও পরিপূর্ণ ডিটেকটিভ নয়। সে খানিকটা প্রচণ্ড ভিজিট ও পসারওয়ালা একজন ডাক্তারের মতো, সচরাচর যার দেখা পাওয়া ভার। ডয়েলের শার্লক হোমস বরং অনেকটা পরিচিত পারিবারিক ডাক্তারের মতো, যিনি পাঠকের অনেক কাছাকাছি থাকেন। নিজের চরিত্রকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ একজন রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেই বাজিমাৎ করেছেন ডয়েল।

হোমস পুলিশের লোক নন, পুরোপুরি পেশাদারও নন। হোমসের গোয়েন্দাগিরির সাথে টাকাপয়সারও অনেকসময় সম্পর্ক থাকে না। তিনি অবিবাহিত, খেয়ালী মানুষ। ছ' ফুট লম্বা, অসম্ভব শক্তিশালী, নানা অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, ওয়াটসন ছাড়া সম্পূর্ণ নির্বান্ধব, বিভিন্ন বিষয়ে স্বশিক্ষিত, বেহালা বাজানোয় দক্ষ, কখনও অত্যন্ত ছটফটে কখনও একেবারে অলস, পাইপ টানেন, মাঝেমধ্যে আফিমের নেশায় বুঁদ – সব মিলিয়ে একেবারে অন্যরকম, স্বতন্ত্র একটি চরিত্র। খেয়ালের বশে শার্লক অনেক কিছুই চর্চা করেন এবং সব চর্চাতেই তাঁর গভীর নিষ্ঠা।

ডয়েল শুধু গোয়েন্দাপ্রবরকে পাঠকের দরবারে এনেই ক্ষান্ত হননি। সেই সঙ্গে গোয়েন্দার বন্ধু তথা সহকারীকেও হাজির করেছেন। শার্লক হোমসের সহকারী এবং তাঁর কাহিনিগুলির কথক ছিলেন ডাঃ ওয়াটসন, সে কথা আগেই বলেছি। অধ্যাপক সুকুমার সেন এই জুটিকে গীতার কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাথে তুলনা করেছেন।

"হোমস্ ও ওয়াটসন এই ভূমিকা দুটির তুলনা করা যায় গীতার কৃষ্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে। অর্জুনের মতো ওয়াটসন ও তাঁর বান্ধবের গুণমুগ্ধ ভক্ত। গোয়েন্দার জুরি অর্থাৎ সখা সাহায্যকারী বিদূষক অথবা শিষ্য এই যা সৃষ্টি করে দিলেন ডয়েল তার পরবর্তীকালে অধিকাংশ ভালো গোয়েন্দা লেখকই রকমফের করে ব্যবহার করেছেন।

...কৃষ্ণ যেমন অর্জুনের অভিভাবক, তেমনি হোমস্ও ওয়াটসনের অভিভাবকের মতো এবং হোমস্ যেমন লেখক ডয়েলের শিক্ষাগুরু ডাঃ বেলের প্রতিবিম্বন, ওয়াটসনও তেমনি ডাঃ বেলের ছাত্র লেখক ডয়েলের প্রতিনিধি।"[৭]

এবার ডাঃ জোসেফ বেল এবং স্যার আর্থার কোনান ডয়েল – এই জুটি সম্বন্ধে দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিকে তাকানো যাক। ডয়েল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়তেন। সেখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন ডাঃ জোসেফ বেল। রোগীদের ব্যাপারে ডাঃ বেলের অনুধাবন

ক্ষমতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর ছাত্র ডাঃ ডয়েল *স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে* যা লিখেছিলেন, অধ্যাপক সুকুমার সেন তার অংশবিশেষের বঙ্গানুবাদ করেছেন –

"আচ্ছা", ডাঃ বেল বলতেন, "আপনি দেখছি পানদোষে ভুগছেন। এমনকি আপনি আপনার কোটের ভিতরের পকেটেও বোতল রাখেন।"
"আরেকজন হয়তো এল।"
"দেখে মনে হচ্ছে মুচি।" তারপর তিনি ছাত্রদের দিকে ঘুরে, লোকটির পাৎলুনের হাঁটুর কাছে ভিতরের দিকে ছেঁড়া জায়গাটা দেখাতেন। পায়ের ওই জায়গাটাতেই লোকে ল্যাপস্টোনটা রাখে – একমাত্র মুচিদের ক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্যটা লক্ষ্য করা যায়। এই সবকিছু আমাকে খুব মুগ্ধ করেছিল। তিনি যেন সর্বদাই আমার চোখের সামনে থাকতেন। তাঁর চোখ তীক্ষ্ণ, নাক খাঁড়া। তিনি চেয়ারে বসে দু হাতের আঙুল জড়ো করেন। হাতের কাজে তিনি খুব চটপটে ছিলেন। সামনের দিকে কেউ থাকলে সেদিকে তাকিয়ে থাকতেন। তিনি ছাত্রদের প্রতি অত্যন্ত সহৃদয় এবং ধৈর্যশীল। আমি যখন ডিগ্রী নিয়ে আফ্রিকা চলে যাই তখন আমার এই পুরানো অধ্যাপকের স্মৃতি জাগরূক ছিল। যদিও তখন আমি জানতুম না যে এই স্মৃতিই একদিন আমাকে ডাক্তারি ব্যবসা ছাড়িয়ে দিয়ে গল্প লিখতে বাধ্য করবে।"[৮]

আ স্টাডি ইন স্কারলেট, দ্য সাইন অব ফোর, অ্যাডভেঞ্চারস্ অব শার্লক হোমস্, মেমোয়ারস্ অব শার্লক হোমস্, দ্য হাউন্ড অব বাস্কারভিলস - এই পাঁচখানি বই নিয়ে ১৯০৩ সালে ডয়েলের প্রথম সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই বই – এর জন্য ডয়েল একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। অধ্যাপক সেন এই ভূমিকাটির কিছু অংশ অনুবাদ করেছেন। সেটুকু উদ্ধৃতব্য -

"এডগার অ্যালেন পো তাঁর নিজস্ব বেহিসাবী ভঙ্গিতে যে সব বীজ ছড়িয়ে ছিলেন তার থেকে এই গ্রন্থে সঙ্কলিত রচনাগুলি শস্যরূপে উৎপন্ন হয়েছে। তিনি ডিটেকটিভ গল্পেরও জনক। ডিটেকটিভ সাহিত্যের সমস্ত পরিমণ্ডলটিকে তিনি এমন বেড়া দিয়ে ঘিরে গেছেন যে পরবর্তীকালের কোনো লেখকই বলতে পারবেন না যে এই অংশটি তাঁর নিজস্ব। ডিটেকটিভ গল্পের সূক্ষ্মতা ও আকর্ষণ নির্ভর করে একটি গুণের উপর। সেটি হল নায়কের বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা। আর সব কিছুই এই পরিধির বাইরে যা মূল রসকে ব্যাহত করে। সমস্যা ও সমস্যাপূরণই গল্পের 'থিম', চরিত্রচিত্রণ অবান্তর। এই সংকীর্ণ পথ দিয়ে লেখককে হাঁটতে হবে। সেখানে তিনি সর্বদাই তাঁর সামনে পো – এর পদচিহ্ন দেখতে পাবেন। যদি কখনো এই বাঁধা পথের বাইরে তিনি কোনো গলিরাস্তার সৃষ্টি করতে পারেন তো তাঁর আনন্দের অবধি থাকে না।

আমার পরম সৌভাগ্য যে বাস্তব জীবনে আমি এমন একজনকে দেখেছি যাঁর চারিত্রিক বিশিষ্টতা আমার নায়কের মতো। যদিও তিনি তাঁর প্রতিভার সদ্ব্যবহার করেছেন রোগ নিরাময়ে, অপরাধ নির্ধারণে নয়। আমি আমার ছাত্রাবস্থায় দেখেছি ও শুনেছি যে কত তুচ্ছ সূত্র, যা প্রায় সকলের চোখ এড়িয়ে যেত, তা ধরে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত করতেন। এর থেকে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে মানবমস্তিষ্কের এই যে ক্ষমতা এর বিষয়ে যথাযথ চর্চা হয়নি এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অনুসরণ করলে এমন অত্যাশ্চর্য ফল পাওয়া যাবে যার সঙ্গে গল্পের ডিটেকটিভের আকস্মিক এবং ব্যাখ্যাহীন সাফল্যের তুলনা হয় না। মঁসিয়ে দুপ্যাঁ অবশ্য এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমার সীমিত ক্ষমতার এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও নূতন মডেলের আধারে এই কাজ করতে পেরেছি।"[৯]

স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে ডয়েলের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর শিক্ষক ডাঃ জোসেফ বেল – কে সেই প্রবন্ধের একটি প্রত্যুত্তর লেখবার জন্য অনুরোধ করা হয়। তারই ফলশ্রুতিতে ডাঃ বেল *দি বুকল্যান্ড* পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটির নাম *মিঃ শার্লক হোমস্* (ডিসেম্বর, ১৮৯২) এই প্রবন্ধ থেকে উপযুক্ত অংশ অধ্যাপক সেনের তর্জমায় –

"ডাঃ কোনান ডয়েল তাঁর গোয়েন্দা গল্পগুলিতে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দার কর্মপদ্ধতি তাঁকে পাঠকমহলে প্রিয় করে তুলেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে অতি সহজে আমরা পর্যবেক্ষণ শক্তির দ্বারা আমাদের বন্ধুবান্ধবদের সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য আবিষ্কার করতে পারি এবং ঠিক এই ভাবেই কোনো অপরাধের আসামীকেও ধরে ফেলা যায়। ভলটেয়ার আমাদের জাদিগের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়েছেন এবং ডাক্তারিবিদ্যার যে কোনো ভালো শিক্ষকই তাঁর ছাত্রদের শিক্ষাদানকালে ডাক্তারিশাস্ত্রের ক্রিয়াকলাপ এবং তার ফল ছাত্রদের বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন। এই তুচ্ছ ব্যাপারগুলো দেখতে পাওয়া এবং ধরতে পারার মধ্যে ডাক্তারিবিদ্যার সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। সাধারণ জীবনে আমরা যদি কোনো মানুষের অদম্য কৌতূহল এবং তীক্ষ্ণ অনুভূতির কথা মেনে নিই তাহলেই আমরা পেয়ে যাই শার্লক হোমস্‌কে যিনি মাঝে মাঝেই তাঁর বন্ধু ওয়াটসনকে চমকে দেন এবং এই ব্যক্তিকেই যদি কোনো বিশেষ কর্মে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলেই আমরা পেয়ে যাই গোয়েন্দা শার্লক হোমস্‌কে।

ডাক্তারিশাস্ত্রের ছাত্র হওয়াতে ডাঃ কোনান ডয়েলের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা শুরু থেকেই গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, স্মৃতিধর এবং কল্পনাপ্রবণ মানুষের গল্প লেখার কাজে সাহায্য করে। বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক সাইমের একটি উদাহরণ ডাঃ ডয়েলের মনে খুব ছাপ ফেলেছিল, "কোনো একটি রোগের বা ক্ষতের উপসর্গগুলো ঠিক সেইভাবে জানার চেষ্টা করবে যেভাবে তুমি তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে জানো।"

ছোটখাটো ব্যাপারের প্রতি গুরুত্ব দেবার শিক্ষা লাভ করায় ডাঃ ডয়েল চেষ্টা করতেন তাঁর বুদ্ধিমান পাঠকদের নিজের বিশ্বাসে নিয়ে নিজস্ব কর্মপদ্ধতি দেখিয়ে তাদের কৌতূহল মেটাবার। তাই তিনি সৃষ্টি করলেন এক চালাক তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন অনুসন্ধিৎসু, অর্ধেক ডাক্তার অর্ধেক শিল্পী। যার হাতে প্রচুর সময়

এবং যার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর আর, যার সবচেয়ে বড়ো গুণ – এমন এক আশ্চর্য শক্তি যার ফলে তিনি তুচ্ছ জিনিস মনে রাখবার জন্য অন্য সব কিছু ভুলতে পারতেন। হোমস্ একবার ওয়াটসনকে বলেছিলেন, "মানুষের সবসময় উচিত তার মাথার খোপে সেইসব জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা যেগুলো সে সর্বদা ব্যবহার করবে; বাদবাকি জিনিস সে তার পাঠাগারের গুদাম ঘরে রাখতে পারে, যেখান থেকে সে দরকার মতো বাইরে এনে ব্যবহার করতে পারে।"

...নায়ক সৃষ্টি করা ছাড়াও, ডাঃ কোনান ডয়েল তাঁর এই গল্পমালার মধ্যে দিয়ে নিজের গল্প বলার ক্ষমতা ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে গল্পের মধ্যে সংঘাত ও চমক সৃষ্টি করতে বিশেষ সমর্থ। তিনি তাঁর গল্পগুলি সরাসরিভাবে সহজ ইংরেজীতে লিখে গেছেন। তাঁর গল্পের সর্বোত্তম গুণ এই যে কোথাও অতিশয়োক্তি নেই। তিনি জানেন যে সংক্ষেপে ব্যাপারটা খুব সুন্দর এবং তিনি আমাদের সেইরকম গল্পই দিয়েছেন যা রাত্রের খাওয়া এবং কফিপানের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে পড়ে ফেলা যায়। আর গল্পগুলো শেষ হয়ে যাবার পরেও তা আমাদের মনে লেগে থাকে।"[১০]

১৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৮ তারিখে বিলেতি *পল মল গেজেট* পত্রিকায় ডাঃ যোসেফ বেলের একটি সাক্ষাৎকার বেরিয়েছিল। পত্রিকার যে প্রতিনিধি ডাঃ বেলের এডিনবার্গের শহরতলির সুন্দর নিরিবিলি বাড়িতে সেই সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলেন, তিনি প্রথমেই বলেছিলেন, আপনিই তো ডয়েলের আসল শার্লক হোমস। সহাস্যমুখে ডাঃ বেল উত্তর দিয়েছিলেন, "Doyle's the clever man. It's nothing to do with me."[১১]

ডাঃ বেলের লেখাগুলি পড়লেই বোঝা যায়, তাঁর অসীম প্রতিভাধর ছাত্রের প্রতি তিনি কতদূর স্নেহশীল ছিলেন, এবং ডয়েলের লেখাগুলি তিনি কতটা মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন, যে এত সুন্দর করে সেই লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। গুরু ডাঃ যোসেফ বেলের প্রতি শিষ্য ডাঃ ডয়েলের শ্রদ্ধাপূর্ণ মুগ্ধতা আর ছাত্র ডয়েলের প্রতি শিক্ষক ডাঃ বেলের স্নেহপূর্ণ মুগ্ধতা – উদ্ধৃতিগুলির ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান।

ডয়েল শার্লক হোমসকে নিয়ে মোট চারটি উপন্যাস লিখেছিলেন। *আ স্টাডি ইন স্কারলেট* (১৮৮৭), *দ্য সাইন অব ফোর* (১৮৯০), *দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস্* (১৯০২) এবং *দ্য ভ্যালি অব ফিয়ার* (১৯১০)। এছাড়া, তিনি প্রায় ৬০টি ছোটগল্প লিখেছিলেন, যা *অ্যাডভেঞ্চার্স* (১৮৯২) থেকে *কেসবুক* (১৯২৭) পর্যন্ত পাঁচটি বইয়ে গ্রন্থিত হয়েছে। ১৮৮৬ সাল থেকে চল্লিশ বছর ধরে এসব গল্প লেখা, তবে মাঝখানে *দ্য ফাইনাল প্রবলেম*

(১৮৯৩) গল্পে তিনি হোমসের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এই সিরিজটি শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু পাঠকদের চাপে তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন।

সারা পৃথিবী জুড়ে ১০০টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে শার্লক হোমসের কাহিনি। বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। অধ্যাপক সুকুমার সেনের ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি বই থেকে জানতে পারি, পাঁচকড়ি দের *হরতনের নওলা* বইটি ডয়েলের *দ্য সাইন অব ফোর* উপন্যাসটির অনুবাদ এবং প্রথম বাংলা শার্লক কাহিনি। ১৯৩০ – এর দশকে কুলদারঞ্জন রায়ের *বাস্কারভিলের কুকুর* এবং *সারলক হোমসের বিচিত্র কীর্তি* ক্লাসিক অনুবাদ বলে স্বীকৃত। ষাটের দশকে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের *শার্লক হোমসের কথা,* ১৯৬১ এবং অমিয়কুমার চক্রবর্তীর *অ্যাডভেঞ্চার্স অব শার্লক হোমস,* ১৯৬৪ বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সিক্স নেপোলিয়নস্ অবলম্বনে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছিলেন *নেতাজীর ছয়মূর্তি*।

শার্লক হোমসকে গোয়েন্দাগিরির গুরু মানে সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা চরিত্র ফেলুদা। একটি কেসের সুবাদে একবার লন্ডনে যেতে হয়েছিল ফেলুদাকে। ২২১বি, বেকার স্ট্রিটের সামনে দাঁড়িয়ে শার্লক হোমসকে উদ্দেশ্য করে ফেলুদাকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'গুরু, তুমি ছিলে বলেই আমরা আছি'। এই কাহিনি ধরা আছে *লন্ডনে ফেলুদা* (প্রথম প্রকাশ *শারদীয়া দেশ* ; ১৯৮৯) গল্পে।

শার্লক হোমসকে একবার কোলকাতাতেও আসতে দেখা গিয়েছিল পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসুর গল্প *নীল তারা* - তে। বেহালার এঁদো গলিতে এসে শার্লক – ওয়াটসন জুটি দেখা করেছিলেন গরিব স্কুল মাস্টার রাখাল মুস্তৌফির সঙ্গে। রাখাল মাস্টার নিজেকে অনেক বড় কবি মনে করতেন। যদিও রাখালের কবিতা যেমন কোথাও কোনওকালে ছাপা হয়নি, তেমনই অপরাধী ধরতে তিনি গোয়েন্দাগিরি করছেন, এমন কথাও কেউ কখনও শোনেনি।

এন্ট্রান্স পাশ, বছর তেত্রিশ বয়স, অবিবাহিত এবং বিস্তর বাংলা – ইংরাজি বই পড়া এ হেন রাখাল মাস্টারের বাড়িতে এক রবিবারের সকালে এসে হাজির হন তিন আগন্তুক। দুই সাহেব আর এক বাঙালি। রাখাল তখন বারান্দার তক্তপোশে বসে হুঁকো টানছেন আর কবিতা লিখছেন। বাড়ি থেকে একশো গজ দূরের রাস্তায় ফিটন গাড়ি থেকে নেমে তাঁরা যখন রাখালের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন, তখন পাকা গোয়েন্দার মতোই তাঁদের পর্যবেক্ষণ করেছেন রাখাল, সেটা বোঝা যায় একটু পরেই, কারণ সম্পূর্ণ অচেনা শার্লক

এবং ওয়াটসন সম্পর্কে নানান তথ্য দিয়ে তাঁদের রীতিমতো তাজ্জব করে দিয়েছিলেন এই বাঙালি ধুরন্ধর। স্বয়ং শার্লক হোমস্‌কেও শেষমেশ স্বীকার করতে হয়েছে, যে দেশে রাখাল মুস্তৌফির মতো মানুষ আছে, সেখানে তাঁরও পসার জমবে না !

পরশুরামেরই আরেকটি গল্প *সরলাক্ষ হোম* থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা দরকার –

"এখন সরলাক্ষ হোমের পরিচয় জানা দরকার। লোকটির আসল নাম সরলচন্দ্র সোম। বিএ পাস করে সে স্থির করলে আর পড়বে না, চাকরিও করবে না, বুদ্ধি খাটিয়ে স্বাধীনভাবে রোজগার করবে। প্রথমে সে রাজজ্যোতিষীর ব্যবসা শুরু করলে। কিন্তু তাতে কিছু হল না। কারণ সামুদ্রিক আর ফলিত জ্যোতিষের বুলি তার তেমন রপ্ত নেই, মক্কেলরা তার বক্তৃতায় মুগ্ধ হল না। তারপর সে সরলাক্ষ হোম নাম নিয়ে ডিটেকটিভ সেজে বসল, কিন্তু তাতেও সুবিধা হল না। সম্প্রতি সে একেবারে নতুন ধরনের ব্যবসা ফেঁদেছে, মক্কেলও অল্পস্বল্প আসছে।
সরলাক্ষ হোমের বাড়িতে ঢুকতেই যে ঘর, সেখানে একটা ছোট টেবিল আর তিনটে চেয়ার আছে, মক্কেলরা সেখানে অপেক্ষা করে। তারপরের ঘরটি কনসাল্টিং রুম, সেখানে সরলাক্ষ আর তার বন্ধু বটুক সেন গল্প করছে। বটুক সরলাক্ষর চাইতে বয়সে কিছু বড়, সম্প্রতি পাস করে ডাক্তার হয়েছে, কিন্তু এখনও কেউ তাকে ডাকে না।"[১২]

পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, যে সরলাক্ষ হোম এবং বটুক সেন – এই নামকরণ আসলে যথাক্রমে বিশ্ববন্দিত গোয়েন্দা শার্লক হোমস আর তার বন্ধু-সহকারী ওয়াটসনের নামের বঙ্গীকরণ মাত্র।

বাংলার আরেক খুদে গোয়েন্দার কথা বলে হোমস্‌-নামা শেষ করব। নারায়ণ সান্যালের ছোটদের জন্যে লেখা গোয়েন্দা গল্পের নায়ক, শার্লক হেবো। *গুরুবিদায় পর্ব* গল্পে নারায়ণ সান্যাল হেবোর পরিচয় প্রসঙ্গে লিখছেন –

"হেবো জন্ম-ডিটেক্টিভ। বাংলার ভবিষ্যৎ শার্লক হোমস্‌। হেবোকে না চিনলেও শার্লক হোম্‌সকে নিশ্চয় চেন তোমরা। স্যার আর্থার কনান ডয়েলের অমর সৃষ্টি গোয়েন্দা-কুলতিলক শার্লক হোমসের কাহিনী দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে। হেবোর কাকা মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে ডিটেকটিভ গল্প লেখেন, তাছাড়া ওর মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু পুলিশের একজন বড় অফিসার। সুতরাং ছেলেবেলা থেকে চোর ডাকাতের কথা শুনে শুনে তাদের ধরনধারণ ভালই জানা ছিল হেবোর। এ ছাড়া ওর মেজদা মাঝে-মাঝে লাইব্রেরি থেকে লুকিয়ে ডিটেকটিভ বই নিয়ে আসত, আর বাবা-মা-কাকাদের চোখ এড়িয়ে উপক্রমণিকা আড়াল দিয়ে মেজদা সেগুলো নিয়ে গোগ্রাসে গিলত। বড়রা কেউ টের পেতেন না,

এমনভাবে লুকিয়ে রাখত সে বইগুলো। কখনও পুরানো খবরের কাগজের স্তূপের নিচে, কখনও আলমারির পিছনে, কখনও বা রান্নাঘরের কুলুঙ্গিতে, আচারের শিশিগুলোর পিছনে। হেবো আবার মেজদার নজর এড়িয়ে সেগুলি যথারীতি হস্তগত করত, আর একের পর এক শেষ করে ফেলত। অসংখ্য গোয়েন্দা গল্প পড়ে পড়ে চোর ধরা ব্যাপারটা তার কাছে 'জলবৎ তরলং' হয়ে গেছে। মাথাটা হেবোর এমনিতেই বেশ সাফা। হেডমাস্টারমশাই বলেন, মন দিয়ে পড়লে ও নিশ্চয়ই ক্লাসে ফার্স্ট হত। কিন্তু হেবোকে গোয়েন্দাগিরির ভূতে পেয়েছে – পাশ করার জন্য যেটুকু দরকার শুধু সেইটুকু সম্পর্ক সে বজায় রেখেছে পড়ার বইয়ের সঙ্গে। বাকি সময় সে মেতে থাকে তার গোয়েন্দাগিরির মালমশলা নিয়ে। ডিটেকটিভ সুলভ সবকয়টি গুণই আছে তার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, অনুসন্ধিৎসা, সূক্ষ্ম যুক্তির বিশ্লেষণ, ইনটুইশান, সাহস আর ধৈর্য। এ কাজের যাবতীয় সরঞ্জাম সে একে একে সংগ্রহ করেছে। নোটবই, ডায়রি, মেজদির সেলাইয়ের বাক্স থেকে উদ্ধার করা একটা ছেঁড়া মাপবার ফিতে, দাদুর বাতিল চশমার পুরু একটা লেন্স। নোটবইতে সময়ে অসময়ে হেবো অনেক কিছু টুকে রাখে। কোন সমস্যার ক্লু কখন কোথায় দরকার হবে তা কি কেউ আগে থেকে বলতে পারে ? মেজদা ওর চেয়ে দু বছরের বড় – শার্লক হেবো নামটা সেই দিয়েছে ..."[১৩]

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে জগৎবিখ্যাত ডিটেকটিভ শার্লক হোমসের প্রত্যক্ষ প্রভাব বা প্রসঙ্গ যেখানে যেখানে ছড়িয়ে আছে, সেগুলি উল্লেখ করা গেল। কিন্তু, তাছাড়াও বাংলা সাহিত্যের বহু গোয়েন্দা চরিত্রকে পড়ার সময় কখনও কখনও যে তাদের মধ্যেও কোথাও শার্লক নানাভাবে চমক দিয়ে ওঠেন, সে কথা গোয়েন্দা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন।

❖

আর্নেস্ট উইলিয়াম হর্নাং (১৮৬৬-১৯২১), যিনি সম্পর্কে আবার স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের ভগ্নীপতি, তিনি সৃষ্টি করলেন র‍্যাফ্‌ল্‌স বলে একটি চরিত্র, যে একাধারে ভদ্রলোক, গোয়েন্দা, চোর এবং দুর্দান্ত ক্রিকেটার। র‍্যাফ্‌ল্‌সের গল্প বাংলায় অনুবাদ হয়েছে কি না, জানা যায় না। কিন্তু শশধর দত্তের *দস্যু মোহন সিরিজ* বা গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর *গোয়েন্দা যখন চোর হয়* বইতে যে র‍্যাফ্‌ল্‌সের থেকে প্রভাবিত হননি, তা বলা যায় না। সুকুমার সেনের মতে, বুদ্ধদেব বসুর *ছায়া কালো কালো* ও *ভূতের চেয়ে অদ্ভুত* – এই কাহিনিগুলিতে এডমন্ড ক্লেরিহিউ বেন্টলির (১৮৭৫-১৯৫৬) প্রভাব আছে।

কোনান ডয়েলের পরবর্তীকালের অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্রিটিশ লেখকদের মধ্যে অন্যতম এডগার ওয়ালেস (১৮৭৫-১৯৩২)। ১৯০৫ সাল থেকে প্রায় ৩০ বছর ধরে তাঁর ১৭৫টি বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র জে জি রিডার বা ইন্সপেক্টর এল্ক-এর বই সম্ভবত বাংলায় অনূদিত হয়নি, তবে *দ্য ফোর জাস্ট মেন, দ্য থ্রি জাস্ট মেন* প্রভৃতি অত্যন্ত জনপ্রিয় বই বাংলায় অনুবাদ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ রাহা। ওয়ালেসের সমসাময়িক জি কে চেস্টারটন (১৮৭৪-১৯৩৬) অনেক ধরণের বই লিখেছেন, কিন্তু আমাদের আলোচনায় আসবে তাঁর ফাদার ব্রাউন নামের জনৈক ক্যাথলিক পাদ্রীর কাহিনি। ফাদার ব্রাউনকে নিয়ে চেস্টারটন প্রায় ৫৬টি গল্প লিখেছেন, যা পাঁচটি বইয়ে গ্রন্থিত। ফাদার ব্রাউন অবশ্য শার্লক হোমসের মতো ডিডাকশনের সাহায্য নেন না, তিনি বাইবেলের অনুশাসন মেনে এবং কিছুটা নিজের আন্দাজে অনেক সময় অনেক রহস্য সমাধান করেছেন, অনেক অপরাধীকে চিহ্নিত করেছেন। বাংলায় ফাদার ঘনশ্যাম নাম দিয়ে অদ্রীশ বর্ধন এই সিরিজের সবক'টি কাহিনি অনুবাদ করেছেন।

******

১৯শে জুন, ১৮৪২ থেকে ১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৩ পর্যন্ত প্যারিস শহরের প্রেক্ষাপটে লেখা প্রায় নব্বইটি রহস্য কাহিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, যা *দ্য মিস্ট্রিজ অব প্যারিস* নামে পাঠক মহলে প্রসিদ্ধ। লেখক বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ইউজিন স্যু (১৮০৪-১৮৫৭)। সেই সিরিজের মধ্যে ক্রাইম কাহিনীর মশলায় সাঁতলানো কেচ্ছা কেলেংকারির ব্যঞ্জন পরিবেশিত হত। ঠিক একই ব্যাপার খানিকটা ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। দারোগা প্রিয়নাথবাবুকে যদি ভিদকের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯১৯) তুলনীয় হতে পারেন ইউজিন স্যু – এঁর সঙ্গে। প্রিয়নাথবাবুর সঙ্গে ভুবনচন্দ্রের কোন পরিচয় বা যোগাযোগ ছিল কি না জানা যায় না, কিন্তু একথা জানা যায় যে, প্রিয়নাথবাবুর অনেককাল আগে থেকেই ভুবনচন্দ্র কেচ্ছাকেলেংকারি ও ক্রাইম কাহিনি বা ঘটনা নিয়ে নানান বিদেশি সাহিত্য থেকে অনুবাদ এবং নিজস্ব উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন। একসময় ভুবনচন্দ্রের রহস্য উপন্যাস *হরিদাসের গুপ্তকথা* বটতলার বাজার সরগরম করে রেখেছিল। অধ্যাপক সেনের বই

থেকে জানা যাচ্ছে, এই বইটির আদি রূপ *এই এক নূতন ! আমার গুপ্তকথা* নাম দিয়ে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭১-১৮৭৩ সালের মধ্যে। *হরিদাসের গুপ্তকথা* বইটিতে দেশি-বিদেশি নানারকম কেচ্ছা ও অপরাধমূলক কাহিনি সন্নিবেশিত হয়ে এক অদ্ভুত স্বাদের রহস্য ও রোমান্স সৃষ্টি হয়েছে। ভুবনচন্দ্র, জর্জ উইলিয়াম ম্যাকআর্থার রেনল্ড্সের (১৮১৪-১৮৭৯) অনেক রোমান্টিক রহস্যকাহিনির অনুবাদও করেছিলেন। রেনল্ড্স প্রথম যুগের এক ক্রাইম-কাহিনি রচয়িতা। সম্ভবত ইউজিন স্যু – এরও আগে তাঁর বই বাংলায় অনূদিত হয়।

রেনল্ড্সের অনেকগুলি বই বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯১৯)। তিনি বটতলার গোয়েন্দা-কাহিনি লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর অনূদিত বইগুলির মধ্যে আছে – *ইয়ং ডাচেস* – এর অনুবাদ *রানী কৃষ্ণকামিনী, সোলজার্স ওয়াইফ* – এর অনুবাদ *সৈনিক সীমন্তিনী* ইত্যাদি। *হরিদাসের গুপ্তকথা* অনুসরণে তিনি *হরিদাসীর গুপ্তকথা* লিখেছিলেন।

******

পেশায় শিক্ষক এবং বাংলা সাহিত্যের গবেষক অম্বিকাচরণ গুপ্ত (১৮৫৯-১৯১৫), *গোয়েন্দার গল্প* নামে একটি ডিটেকটিভ পত্রিকা বের করেছিলেন। তিনি কিছু বিলেতি ক্রাইম উপন্যাসের ছায়ায় বাংলায় কিছু রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনি রচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *পুরাণ কাগজ বা নথির নকল* (১৮৯৯)। বইটির কাহিনি ছদ্ম ঐতিহাসিক, ক্রাইমঘটিত। বা বরং বলা ভাল, বইটিতে আসলে কোন কাহিনির বর্ণনাই নেই, আগাগোড়া চিঠি ও দলিল সাজানো। বইটির ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছিলেন –

"এদেশে ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে বাঙলা ভাষায় বড়ই শোচনীয় অবস্থা ছিল, কেবলমাত্র ছন্দোবন্ধে গ্রথিত কাব্য ভিন্ন ভাষায় আর কিছুই ছিল না...। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ষণে বাঙ্গালা ভাষার শ্রী ফিরিয়াছে, ঐশ্বর্য বাড়িয়াছে, গদ্য, কাব্য, নাটক, নভেল, প্রহসনাদিতে বাঙ্গালা ভাষার পুরপুষ্টি জন্মিতেছে। নানারকমের

ভালমন্দ অনেক জিনিস বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যাইতেছে। 'পুরাণ কাগজ' তাহাদের একটি সংখ্যা বৃদ্ধি করিল মাত্র।"[১৪]

******

১৩০৮ বঙ্গসনে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় *নন্দন কানন* নামে একটি ক্রাইম কাহিনি, উদ্ভট গল্প ইত্যাদি বিষয়ে মাসিক পত্রিকা ছাপাতে শুরু করেন। এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন তৎকালীন আরেক চর্চিত সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়। যদিও ঠিক পরের বছর অর্থাৎ ১৩০৯ থেকেই তা মাসিক পত্রিকার বদলে মাসিক ক্রাইম গ্রন্থ-সিরিজে পরিণত হয়। এই সিরিজের কোনো বইয়েই লেখক বা অনুবাদকের নাম থাকত না। নাম-পৃষ্ঠায় প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম এমনভাবে লেখা থাকত, যাতে মনে হত তিনিই লেখক। বলা বাহুল্য, বইগুলি সবই ইংরেজি গল্প-উপন্যসের স্বছন্দ অনুবাদ। এই বইগুলি আকারে বেশ বড়ই হতো, ছাপার কাগজের মানও বেশ ভালো, দু'একটি ছবিও থাকত। মূল্য আট আনা করে। এই *নন্দন কানন সিরিজের* বিজ্ঞাপন বেশ আকর্ষণীয় ছিল -

"আজকাল পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে দিন দিন যে নব নব ভাব, নব নব প্রতিভা, নব নব বুদ্ধিচাতুর্যের প্রভাব সাহিত্য-জগতে প্রকাশিত হইতেছে, সেই ভাব, সেই প্রতিভা, সেই অপূর্ব সাহিত্যসৃষ্টির মহিমায় মহিমান্বিত, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আদরের সুন্দর সুন্দর প্রেমের উপন্যাস এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানাবিধ ভৌগলিক দৃশ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক তত্ত্বপূর্ণ, বিস্ময়কর উপন্যাস এই নন্দন-কানন গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি মাসের প্রত্যেক পুস্তক নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন ঢঙ্গ, নূতন নূতন রহস্যমালা, নূতন নূতন সুরঞ্জিত চিত্রাবলী পরিশোভিত প্রায় ৩০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রত্যেক পুস্তকই ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, দৃশ্যসমন্বিত নানা দেশের প্রেমের, বিরহের ২/৩খানি তিন রংয়ের হাফটোন চিত্রসম্বলিত।"[১৫]

এই সিরিজে প্রকাশিত বইগুলির নাম – *কালরাত্রি, রূপসী কলঙ্কিনী, ছায়া গোয়েন্দা, রহস্য যবনিকা, তস্কর রহস্য, জাপান রহস্য, ভণ্ড পাদরী, তিন তাড়া, গৈবি খুন, মেয়ে বোম্বেটে, সোনার খনি, যখের ধন* ইত্যাদি।

******

১৩০৮ বঙ্গসনে এই *নন্দন কানন* পত্রিকায় দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) দীর্ঘ ক্রাইম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। *অজয়সিংহের কুঠি* । বইটি ইংরাজি বইয়ের অনুবাদ। *নন্দন কানন* ছাড়াও অন্যত্র নামে-বেনামে দীনেন্দ্রকুমারের ইংরাজি রহস্য-কাহিনির অনুবাদ হিসেবে কয়েকটি ডিটেকটিভ উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল রাইডার হ্যাগার্ডের *আয়েষা* ও *শী* বইদুটির অনুবাদ *রূপসী মরুবাসিনী* প্রথম খণ্ড ১৩১৫ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৩১৭ বঙ্গাব্দ। ক্যাপ্টেন ম্যারিয়টের *দ্য ফ্লাইং ডাচম্যান* এর অনুবাদ *ভূতের জাহাজ* ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীনেন্দ্রকুমারের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এরপর দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখতে শুরু করেন *রহস্যলহরী গ্রন্থমালা*, যেখানে গোয়েন্দা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল রবার্ট ব্লেক। এই রবার্ট ব্লেক কোনও বিদেশি ডিটেকটিভ নন, বা দীনেন্দ্রকুমারের নিজস্ব সৃষ্টি নয়। অধ্যাপক সুকুমার সেন জানিয়েছেন, দীনেন্দ্রকুমারের রবার্ট ব্লেক আসলে *সেক্সটন ব্লেক সিরিজের* গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা। সেক্সটন ব্লেক এক আশ্চর্য চরিত্র, যে ১৮৯৩ সাল থেকে প্রায় ১০০ বছর ধরে ৪০০০ গল্পে, কমিক স্ট্রিপ, টিভি সিরিয়াল ও সিনেমাতে আবির্ভূত হয়েছেন। হ্যারি ব্লাইথ, এডগার ওয়ালেস, লেসলি চার্টারিস, জন ক্রিজি, পিটার চিনি ও আরও অনেকে এসব কাহিনি লিখেছেন, এবং বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় তাঁকেই রবার্ট ব্লেকের আদলে হাজির করলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়। এই ধরণের বইয়ের সংখ্যা প্রায় দুশোরও বেশি। সব বইয়েই ডিটেকটিভ মিস্টার ব্লেক ও তার সহকারী স্মিথ।

******

১৯২০ – এর দশক থেকে ১৯৪০ – এর দশক পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় ক্রাইম কাহিনির স্বর্ণযুগ। এই স্বর্ণযুগেই রাজত্ব করেছেন রহস্যের রাণী, ব্রিটিশ লেখক আগাথা ক্রিস্টি (১৮৯০-১৯৭৬)। তাঁর সবথেকে জনপ্রিয় চরিত্র হল, এরক্যুল পোয়ারো, যিনি প্রাক্তন বেলজিয়ান পুলিশ এবং বেশ মজাদার মানুষ। এরক্যুল পোয়ারো প্রথম আবির্ভূত হন *দ্য মিস্টিরিয়াস অ্যাফেয়ার অ্যাট স্টাইলস্* (১৯২০) নামক কাহিনিতে। এবং শেষবারের মতো তাঁর আবির্ভাব ঘটে *কার্টেন* (১৯৭৫) - এ। ৩২টি উপন্যাস এবং প্রায় ৫১টি ছোটগল্প লেখা হয়েছিল এরক্যুল পোয়ারো – কে নিয়ে, যা সংখ্যায় শার্লক হোমসের তুলনায় অনেক বেশি। বিখ্যাত বাংলা ক্রাইম পত্রিকা *রোমাঞ্চ* – র পঁয়তাল্লিশতম পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল অনুকূল বর্মার কাহিনি অকল্পনীয় অনুকূল বর্মা। তেইশ – চব্বিশ বছর বয়সের যুবতী কল্পনা সেনের অনুরোধে অনুকূল বর্মা ব্যারাকপুরে যান মেজর ঘোষের একমাত্র পুত্র বরুণ ঘোষের মানসিক অস্থিরতা সম্পর্কে তদন্ত করতে। অনুকূল বর্মার তদন্তের ফলে বেঁচে যায় নিরপরাধীরা। এই কেসে চূড়ান্ত সফল হয়েছিলেন অনুকূল বর্মা। কিন্তু সম্পূর্ণ গল্পটি আগাথা ক্রিস্টির লেখা পোয়ারো – কাহিনি *দ্য লেবারস অব হারকিউলিস* গ্রন্থে সংকলিত *দ্য ক্রিটান বুল* গল্পটির বঙ্গীকরণ ছাড়া আর কিছুই না।

আগাথা ক্রিস্টির আরেক বিখ্যাত সৃষ্টি, মিস্ মার্পল। মার্পল ইংল্যান্ডের ছোট্ট গ্রাম সেন্ট মেরিজ মিড-এর বাসিন্দা। অন্যের ব্যাপারে বেশি কৌতূহলী, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, বয়স্ক এক গ্রাম্য মহিলা হিসবেই আগাথা, মিস মার্পলকে এনেছিলেন। সাধারণ গ্রাম্য মহিলাদের মতো মিস মার্পলকেও বেশিরভাগ সময়ই উল বুনতে দেখা যেত। কিংবা বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে। কিন্তু যাই করুন না কেন, তাঁর চোখ-কান যে সবসময়েই সজাগ, তা বোঝা যায় পরে, যখন তিনি একের পর এক যুক্তি সাজিয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহকারে অকাট্যভাবে কোনও রহস্যভেদ করতেন।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন *বিন্দিপিসির গোয়েন্দাগিরি* । কাঁথা সেলাই করা আর রাজ্যের খবর শোনা যাঁর জীবনের দুটি মূল উদ্দেশ্য, সেই গ্রাম্য, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের প্রৌঢ়া, অবিবাহিতা বিন্দিপিসি, কাঁথা সেলাই করতে করতেই এই গল্পে শুধুমাত্র তাঁর ভাইপো-ভাইঝিদের মুখ থেকে শুনেই ভেদ করেন বহুদিন আগে ঘটে যাওয়া এক খুনের রহস্য !

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন গোয়েন্দা কাহিনির একনিষ্ঠ পাঠক-সমালোচক। তিনি লিখেছিলেন *ঠাকুমার গোয়েন্দাগিরি* । সে গল্পের শুরুতেই অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে ঠাকুরদার। গল্প যত এগোয়, আমরা দেখি, শোকসন্তপ্তা সদ্যবিধবা ঠাকুমা ঘরে বসেই বুদ্ধি খাটিয়ে ধরে ফেলেন হত্যাকারীকে।

এই দু'জনের ওপরে মিস্ মার্পলের প্রভাব কোনভাবেই পাঠকের চোখ এড়ায় না। যদিও, মিস্ মার্পলের ছায়ায় বেড়ে উঠলেও স্বাদে-গন্ধে এই পিসিমা-ঠাকুমারা কিন্তু আদ্যন্ত বাঙালি। একজন তাই কাঁথায় পদ্মফুল তুলতে পারদর্শী, আর কীর্তনের আসরে ভক্তের কান্না আর মায়াকান্নার সূক্ষ্ম তফাত কিছুতেই অন্যজনের তীক্ষ্ণ নজর এড়ায় না।

প্রসঙ্গত, ২০০৩ – এ চিত্রপরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের পরিচালনায় *শুভ মহরৎ* নামে একটি বাংলা চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছিল। সিনেমাটি আগাথা ক্রিস্টির মিস্ মার্পল – কাহিনি *দ্য মিরর ক্র্যাকড্ ফ্রম সাইড টু সাইড* গল্পটি অবলম্বনে নির্মিত হয়। সিনেমাটিতে মুখ্য ভূমিকায় রাঙাপিসি-র চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত বাঙালি অভিনেত্রী রাখী গুলজার। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন আরেক বিখ্যাত বাঙালি অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। সিনেমায় এই রাঙাপিসি আসলে মল্লিকা ওরফে মিলি বলে একটি মেয়ের পিসি, যে মেয়েটি একজন সাংবাদিক, সদ্য চাকরি নিয়ে জামশেদপুর থেকে কলকাতায় পিসির সাথে থাকবে বলে এসেছে। রাঙাপিসি একলা বিধবা মানুষ, পোষা মেনি বিড়াল হরিদাসীকে নিয়েই তাঁর সংসার। সেলাই-ফোঁড়াই করে সময় কাটে। সাংবাদিক ভাইঝির কাছ থেকে একটি, এবং ক্রমান্বয়ে আরও একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর এহেন রাঙাপিসির কাছে পৌঁছয়। এবং তিনি নিজের অসাধারণ বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে ঘরে বসেই সেই হত্যারহস্যের সমাধান করেন।

******

আর্ল স্ট্যানলি গার্ডনার (১৮৮৯-১৯৭০) প্রায় ২০০টিরও বেশি কাহিনি রচনা করেছেন তাঁর গোয়েন্দা পেরি ম্যাসনকে নিয়ে। পেরি ম্যাসন পেশায় উকিল। বাংলায় নারায়ণ সান্যালের *'কাঁটা' সিরিজের* গোয়েন্দাও পেশায় একজন উকিল। প্রসন্নকুমার বাসু, ওরফে

পিকে বাসু, বার অ্যাট ল। পি কে বাসুর চরিত্রটি যে মার্কিন লেখক গার্ডনারের বিখ্যাত চরিত্র পেরি ম্যাসনের আদলে তৈরি, তা সান্যালমশাই একাধিকবার স্বীকার করেছেন।

******

প্রসিদ্ধ বেলজিয়ান সাহিত্যিক জর্জ সিমেনঁ (১৯০৩-১৯৮৯) ২০০টিরও বেশি বই লিখেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র জুল মেইগ্রে ফরাসি পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা। মেইগ্রে পুলিশের লোক হলেও মানবিক ব্যক্তিত্ব ও আটপৌরে জীবনযাপনের বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন সিমেনঁ। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র লালবাজারের গোয়েন্দা অফিসার শবর দাশগুপ্তের ওপরে জুল মেইগ্রের প্রভাব থাকতে পারে। কারণ, শবর গোয়েন্দা বটে, সেই সঙ্গে একজন সংবেদনশীল মানুষও। শবরের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক হয়তো পুলিশের মতো নয়। অপরাধীকে সে শুধু অপরাধের নিরিখেই বিচার করতে চায় না কখনও। তার পাথুরে চরিত্র, নির্বিকার হাবভাব এবং আবেগহীন আচরণ দেখে বোঝা যায় না যে, আসলে লোকটা কতখানি সংবেদনশীল।

******

লেসলি চার্টারিস (১৯০৭-১৯৯৩) – এর গোয়েন্দা সেন্ট বা সাইমন টেম্পলার আধা-গোয়েন্দা আধা-তস্কর। তাঁর মৃত্যুর পরেও সেন্ট-কাহিনি লিখেছেন আরও অনেক লেখক। এঁদের গল্পের কিছু কিছু প্রভাব বাংলা ক্রাইম-সাহিত্যেও পড়েছে।

******

কিশোর-কিশোরীদের জন্য গোয়েন্দা গল্প লিখেছেন এরিখ কাস্টনার (১৮৯৯-১৯৭৪) – এই জার্মান লেখকের সৃষ্ট চরিত্র এমিল অবলম্বনে লেখা হয়েছে দু'টি বিখ্যাত গল্প – কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের *এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী* ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের *দেড়শো খোকার কান্ড* (১৯৪৭)।

******

দীর্ঘদিন ধরে ছোটদের গল্প লেখায় সিদ্ধহস্ত এনিড ব্লাইটন (১৮৯৭-১৯৬৮)। তাঁর *ফেমাস ফাইভ, সিক্রেট সেভেন, ফাইভ ফাইন্ড-আউটার্স* প্রভৃতি সিরিজে কিশোর-কিশোরীরাই দলবেঁধে নানান রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে। এই *ফেমাস ফাইভ সিরিজ* প্রকাশ হতে শুরু করে ১৯৪৩ সালে। ১৯৪৩-এ প্রকাশিত *ফাইভ অন আ ট্রেজার আইল্যান্ড* থেকে শুরু করে ১৯৬২-র *ফাইভ আর টুগেদার এগেন* পর্যন্ত তিনি এই সিরিজের প্রায় একুশটি উপন্যাস লিখেছিলেন। *ফেমাস ফাইভে* - র পাঁচ খুদে সদস্যের মধ্যে অ্যানি এবং তার তুতো বোন জর্জিনা হলো কিশোরী। আর আছে অ্যানির ভাই জুলিয়ান ও ডিক এবং জর্জিনার পোষ্য বিশালদেহী মংগ্রেল কুকুর টিমোথি ওরফে টিমি – এই হলো ফেমাস ফাইভের দল।

জুলিয়ান, ডিক এবং অ্যানি বোর্ডিং স্কুলে পড়ে। স্কুলের ছুটিতে প্রতিবার তারা বেড়াতে যায় কর্নওয়ালের সমুদ্র উপকূলে কিরিন শহরে আঙ্কল কোয়েন্টিন ও আন্টি ফ্যানির বাড়িতে। সেখানে থাকে এই আঙ্কল-আন্টির মেয়ে জর্জিনা। সে বেশ ডাকাবুকো মেয়ে, ইংরিজিতে যাকে বলে টমবয়, নিজের পরিচয় দেয় জর্জ নামে। মাথার চুল ছোট করে কেটে রাখে, ছেলেদের পোশাক পরে। রেগে গেলে তার হুঁশ থাকে না। ব্লাইটন

পরবর্তীকালে স্বীকার করেন, ওই মেয়েটিকে তিনি নিজের ছোটবেলার আদলেই গড়েছিলেন। কোনো কোনো গল্পে জিপসি মেয়ে জো-কে তাদের সঙ্গী হতে দেখা যায়।

স্কুলছুটির দিনগুলিতে এই ফেমাস ফাইভ জড়িয়ে পড়ে নানান রহস্যময় ঘটনা বা রোমাঞ্চকর অভিযানের সাথে। তাদের বেশিরভাগ কাহিনি কিরিন দ্বীপের সাগর-উপসাগর লাগোয়া খাঁড়ি, সেখানকার পাথুরে পাহাড়ি অঞ্চল, প্রাচীন পরিত্যক্ত প্রাসাদ, জলদস্যু আর চোরাচালানকারীদের লুকোন সুড়ঙ্গ ইত্যাদির পটভূমিকায় রচিত। কোনো কোনো ছুটিতে দূরে কোথাও ক্যাম্পে থাকতে বা চড়ুইভাতি করতে দেখা যায় তাদের। আঙ্কল কোয়েন্টিন হলেন বিজ্ঞানী, তিনি অপহৃত হলেও ভরসা সেই বিখ্যাত পাঁচ খুদে।

ব্লাইটনের ফেমাস ফাইভের আদলেই বাংলায় সন্দেশ পত্রিকার পাতায় নলিনী দাশ তাঁর *গোয়েন্দা গন্ডালু* সিরিজের চারটি স্কুলপড়ুয়া কিশোরী মেয়ের রহস্য ও রোমাঞ্চকর অভিযানের গল্প লিখতেন। গন্ডালুর গল্পগুলি পড়লেই বোঝা যায়, শুধু চরিত্রের ক্ষেত্রেই নয়, অনেকসময় গল্পের কাহিনির ক্ষেত্রেও ব্লাইটনের অনুবর্তিনী হয়েছেন লেখিকা।

******

গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল এবং শিপ্রানদী তীরবর্তী প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরের প্রেক্ষাপটে নবরত্ন সভার অন্যতম, বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কালিদাসকে গোয়েন্দা হিসেবে হাজির করেছেন অধ্যাপক সুকুমার সেন (১৬ জানুয়ারি, ১৯০১ - ৩ মার্চ, ১৯৯২)। শব্দবিদ্যার অনুসন্ধান সুকুমার সেনকে অনুপ্রাণিত করেছিল গোয়েন্দা গল্প রচনায়। যেহেতু প্রাচীনকালে কালিদাসকে মনে করা হত সব থেকে বুদ্ধিমান, সেই কারণেই তিনি কালিদাসকে গোয়েন্দা বেছেছিলেন। এই ব্যাপারে অধ্যাপক সেন প্রভাবিত হয়েছিলেন ওলন্দাজ লেখক রিচার্ড ভ্যান গুলিক এবং মার্কিন লেখক লিলিয়ান ডি লা টারের ভাবনা থেকে। কারণ এঁদের দুজনেরই গোয়েন্দা চরিত্র বাস্তব মানুষ, কাল্পনিক নয়। ভ্যান গুলিক লিখতেন চীনা বিচারক ডি-এর কাহিনি। আর ডি লা টারের গল্পের গোয়েন্দা ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিবিদ ও লেখক স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-১৭৮৪) এবং তার

সহকারীর ভূমিকায় স্যামুয়েলের জীবনীকার ও শিষ্য জেমস বসওয়েল (১৭৪০-১৭৯৫)। এছাড়াও হয়তো ইউরোপীয় লেখক বিলিয়ান বেলাটফের দ্বারাও কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যিনি সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত নাটককার বেন জনসনকে চরিত্র বানিয়ে গপ্পো লিখেছিলেন।

প্রসঙ্গত, বাস্তব গোয়েন্দা চরিত্র হিসেবে মহাকবি কালিদাস বা স্যামুয়েল জনসনের সাথে একই সারিতে আরও একটি নাম আসতে পারে। বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান মনোবিদ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, এবং তাঁর সহকারীর ভূমিকায় তাঁরই অনুগামী কার্ল ইয়ুং। উপন্যাসের নাম *দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অব মার্ডার* (২০০৬)। লেখক ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেড রুবেনফেল্ড। উপন্যাসটির পটভূমি বিশ শতকের প্রথম দশকের আমেরিকা। আরও নির্দিষ্ট করে বললে ১৯০৯ সাল, যে বছর অগাস্ট মাসে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় পৌঁছলেন ফ্রয়েড এবং ইয়ুং। এই পর্যন্ত ঘটনাবলী বাস্তব। এরপরেই লেখক কল্পনার আশ্রয় নিয়ে গড়ে তুলেছেন এক হত্যারহস্য। রুবেনফেল্ডের উপন্যাসে দেখা যায় ফ্রয়েড যেদিন জাহাজ থেকে নেমে প্রথম এবং শেষবারের মতো পা রাখেন মার্কিন – মুলুকে, তারপরের দিন সকালেই নিউ ইয়র্কের ব্রডওয়ের পেন্টহাউসে পাওয়া গেল খুন হওয়া এক উঠতি অভিনেত্রীর মৃতদেহ। তার পরের রাতেও খুন হল আরেক তরুণী। ফ্রয়েডের আমেরিকান ভক্ত স্ট্রাথাম ইয়াংগার এবং কার্ল ইয়ুং – এঁর সহায়তায় ফ্রয়েড চিহ্নিত করলেন খুনিকে। এই কাহিনিতে গোয়েন্দার ভূমিকায় হাজির মনোবিজ্ঞানী নিজেই।

******

গোয়েন্দা বরুণ মিত্রকে নিয়ে বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন বিখ্যাত অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৮-২০২০)। তাঁর কাহিনি সংকলনের মুখবন্ধে লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বরুণ মিত্রকে নিয়ে লেখা প্রতিটি কাহিনিই বিভিন্ন বিদেশি লেখকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। যেমন, *তাসের কেল্লা* উপন্যাসটি আগাথা ক্রিস্টির পোয়ারো – কাহিনি *কার্ডস অন দ্য টেবল* থেকে নেওয়া। *কার্ডস অন দ্য টেবল* উপন্যাসে একটি বিশেষ ভূমিকায় উপস্থিত ছিলেন রহস্য কাহিনির লেখিকা অ্যারিয়াডনে

অলিভার। *তাসের কেল্লা* – তে তিনি পরিণত হয়েছেন ডিটেকটিভ উপন্যাস ও কিছু আলোড়ন তোলা রহস্য কাহিনির লেখিকা তপতী রায়ের চরিত্রে।

অস্টিন ফ্রিম্যানের লেখা ডক্টর থর্নডাইকের কিছু কাহিনির অনুকরণেও কয়েকটি গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেই কাহিনিগুলিতে গোয়েন্দা হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন শংকর সেন নামের এক ডাক্তারকে। থর্নডাইকের মতো গোয়েন্দার জায়গা যে একজন ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিক ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়, তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন লেখক। এখানে থর্নডাইকের সহকারী ডাঃ জার্ভিসের ভূমিকায় থাকতেন ডাঃ শংকর সেনের বন্ধু অতনু বসু।

******

আরেকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করব। বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে এই গবেষণা সন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ের প্রেক্ষিতে শুধু বলার, যে, বাঙালি মেয়ে গোয়েন্দারা তাদের জীবনে, যাপনে, আচারে, আচরণে, পোশাক পরিচ্ছদে, খ্যাদ্যাভাসে, ভাবনায়, চিন্তায়, কাজে কর্মে এতটাই ‘বাঙালি’, যে তাদের সঙ্গে বা তাদের ওপরে কোন বিদেশি মহিলার প্রভাব বা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়াই যায় না প্রায়। তাই, এ কথা বলাই যায়, সৌরীন্দ্রমোহনের বিন্দিপিসি বা প্রতুলচন্দ্রের ঠাকুরমার ক্ষেত্রে মিস্ মার্পলের প্রভাবটুকু ছাড়া বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের আর সব মেয়েরা নিজেদের জ্ঞান – গরিমায়, স্বকৃতিত্বে - স্বমহিমায় পুরদস্তর বাঙালি আমেজেই আসর মাত করে রেখেছে।

তথ্যসূত্র

১. সেন সুকুমার; *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* ; আনন্দ পাবলিশার্স; তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২; কলকাতা; পৃষ্ঠা ৪৪।

২. সেন সুকুমার; *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* ; আনন্দ পাবলিশার্স; তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২; কলকাতা; পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭।

৩. ডয়েল আর্থার কোন্যান; *শার্লক হোমস সমগ্র* (প্রথম খণ্ড); লালমাটি; প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০১১; কলকাতা; পৃষ্ঠা ২২-২৩।

৪. রায় সত্যজিৎ; *ফেলুদা সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; প্রথম প্রকাশ, ২০০৫; কলকাতা; পৃষ্ঠা ১৯৪-১৯৫।

৫. সেন সুকুমার; *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* ; আনন্দ পাবলিশার্স; তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২; কলকাতা; পৃষ্ঠা পৃ ৪৮।

৬. ডয়েল আর্থার কোন্যান; *শার্লক হোমস সমগ্র* (প্রথম খণ্ড); লালমাটি; প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০১১; কলকাতা; পৃষ্ঠা ২৩।

৭. সেন সুকুমার; *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* ; আনন্দ পাবলিশার্স; তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২; কলকাতা; পৃষ্ঠা পৃ ৫৬।

৮. সেন সুকুমার; *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* ; আনন্দ পাবলিশার্স; তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২; কলকাতা; পৃষ্ঠা পৃ ৫৬-৫৭।

৯. সেন সুকুমার; *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* ; আনন্দ পাবলিশার্স; তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২; কলকাতা; পৃষ্ঠা ৫৯।

১০. সেন সুকুমার; *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* ; আনন্দ পাবলিশার্স; তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২; কলকাতা; পৃষ্ঠা পৃ ৫৭-৫৮।

১১. *The Original of "Sherlock Holmes"* is an interview with Dr. Joseph Bell published on 28 December, 1893 in The Pall Mall Gazette. https://www.arthurconandoyle.com/index.php/The_Original_of_Sherlock_Holmes ২৮.১২.২০২৩, রাত ৮.৩৪ মিনিট।

১২. বসু রাজশেখর; *পরশুরাম গল্পসমগ্র* ; সম্পা. দীপংকর বসু; এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ; অখণ্ড সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯২; কলকাতা; পৃষ্ঠা ৪৮০।

১৩. সান্যাল নারায়ণ; *শার্লক হেবো* ; উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির; প্রথম উজ্জ্বল সংস্করণ, বইমেলা-ফেব্রুয়ারি ১৯৯২; কলকাতা; পৃষ্ঠা ৭।

১৪. সেন সুকুমার; *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* ; আনন্দ পাবলিশার্স; তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২; কলকাতা; পৃষ্ঠা ১৮৪।

১৫. সেন সুকুমার; *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* ; আনন্দ পাবলিশার্স; তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২; কলকাতা; পৃষ্ঠা ১৮৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের পেশাদার গোয়েন্দারা

আমাদের বর্তমান গবেষণার কালসীমা যেহেতু ১৮৯০ থেকে ২০১৫, তাই এই অধ্যায়ের আলোচনার সূত্রপাত হবে মূলত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের *দারোগার দপ্তর* - এর সময় থেকে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে এই আলোচনার মুখবন্ধ হিসেবে আরও দু'টি রচনার কথা উল্লেখ করতেই হবে। এক, *বাঁকাউল্লার দপ্তর* আর দুই, *সেকালের দারোগার কাহিনী* ।

ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি বইতে অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখছেন –

"ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যের পরেই বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা-কাহিনী রচনা শুরু হয়েছিল। ডিটেকটিভ কাহিনীর যথার্থ উৎপত্তি হয়েছিল পুলিশী ব্যবস্থার প্রবর্তনের পরেই। এ ব্যবস্থা ফরাসী দেশে প্রথম চালু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে, নেপোলিয়নের সময়। তারপর ব্রিটেনে ও ভারতে পুলিশী ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। সুতরাং পুলিশী ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে লেখা কোনো গোয়েন্দা-কাহিনী জাতীয় রচনাকে আধুনিক অর্থে ডিটেকটিভ কাহিনী বলতে পারি না।

...আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ডিটেকটিভ কাহিনীর আমদানি হয়েছে ইংরেজী থেকে। সকলে অবগত আছেন কিনা জানি না এদেশে পুলিশের ব্যবস্থা প্রথম হয় বিলেতে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ স্থাপনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। তবে এ পুলিশ শুধু কলকাতার জন্যেই ছিল না, সম্পূর্ণ দেশের অর্থাৎ তখন দেশের যতটা ইংরেজ অধিকার ছিল ততটার জন্যে। সে হল ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কথা।"[১]

বাঁকাউল্লার দপ্তর - এর চর্চাপদ সংস্করণের 'কিসসা বাঁকাউল্লা-কা' শীর্ষক ভূমিকা অংশ লিখতে গিয়ে প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ও সৌম্যেন পাল জানাচ্ছেন –

"যতদূর সন্ধান পাওয়া যায়, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম ক্রাইম কাহিনি হল পুলিশের দারোগা বাঁকাউল্লার কীর্তিকলাপ। *বাঁকাউল্লার দপ্তর* নাম দিয়ে প্রকাশিত দারোগা সাহেবের বারোটি কীর্তির প্রথম প্রকাশ যে

কবে, সে সম্বন্ধে জানা যায় না। তবে *বাঁকাউল্লার দপ্তরে* বর্ণিত ঘটনার সময়কাল যতদূর সম্ভব উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের একেবারে শেষ দিক কিংবা চল্লিশের দশকে। কারণ ঠগী দমনের জন্য নির্দিষ্ট আলাদা বিভাগের সুপারিনটেন্ডেন্ট স্লীম্যান সাহেব কমিশনার পদে উন্নীত হয়েছিলেন ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে।"[২]

এই কর্নেল স্লীম্যান (সুকুমার সেন লিখছেন : শ্লীম্যান) কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার পর কয়েকজন দারোগা নিয়োগ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বরকতউল্লা। ভদ্রবংশীয় চতুর বাঙালি যুবক। অসাধারণ ধূর্ততা ও চাতুর্যের জন্য লোকের মুখে মুখে তাঁর বদলে হয়ে গিয়েছিল বাঁকাউল্লা। অধ্যাপক সেন লিখছেন

"বরকতউল্লার দক্ষতার কতকগুলি কাহিনী ঠগী কমিশনের ফাইল থেকে উদ্ধার করে ছাপা হয়েছিল ইংরেজীতে। কবে এবং কে তা করেছিলেন জানা নেই। অনুমান করি ১৮৫৫ সালের আগে নয়।"[৩]

খাঁটি বাঙালি দারোগা বাঁকাউল্লা তাঁর নিজের সম্পর্কে কিছু তথ্য জানিয়েছেন *বাঁকাউল্লার দপ্তরের* প্রথম অধ্যায়ে। তাছাড়া অধ্যাপক সেন বাঁকাউল্লার বিষয়ক আরও কিছু তথ্য জোগাড় করেছেন ১২৪৪ বঙ্গসনে প্রথম প্রকাশিত মহম্মদ মিরণ রচিত *বাহারদানেস* গ্রন্থ থেকে। সেই সমস্ত তথ্য একত্র করে বলা যায়, বাঁকাউল্লার আসল নাম বরকতউল্লা খাঁ। স্বচ্ছল পরিবারে তাঁর জন্ম। অনুমান, তাঁর দেশ ছিল হুগলি জেলার বালিয়া পরগণায়। সেখান থেকে কিছুটা ফার্সি শিখে এসে কলকাতা বা কোনো জেলা সদরের মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষান্তেই দারোগার চাকরিতে যোগদান।

উত্তম পুরুষে বর্ণিত কাহিনির গোয়েন্দা বাঁকাউল্লা শিক্ষিত বাঙালি যুবাপুরুষ। গ্রাম এবং শহর, দুই অঞ্চলেরই জীবনযাত্রা বা আদব-কায়দা, সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সহজেই সমাজের যে-কোন স্তরের মানুষের সাথে মিশে যেতে পারেন। নিজে মুসলিম হলেও অন্য ধর্মের বা অন্য জাতের মানুষের প্রতি তাঁর কোন বিরাগ বা অশ্রদ্ধা তো কখনও প্রকাশ পায়ইনি, বরং ঠিক তার উলটো ছবি অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেখা গেছে কোন কোন গল্পে।

কী জানাচ্ছেন বাঁকাউল্লা তাঁর আত্মকথায় –

“লর্ড হেস্টিংস হইতে হার্ডিঞ্জ, - ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি ও ফৌজদারি ভার গ্রহণ হইতে, বাঙ্গালা দেশে শান্তি-সংস্থাপনের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সে সময়ের দেশের অবস্থা, আধুনিক সুশাসিত প্রজা-লোকেরা ধারণায় আনিতেও পারেন না। সে বড় বিষম কাল। ‘জোর যার মুলুক তার’ এই চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য তখন দেশের লোকের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছিল, প্রত্যক্ষ প্রমাণও হাতে হাতে মিলিত। চুরি ডাকাতি, জাল জুয়াচুরি, খুন জখমের ত কথাই ছিল না। তখনকার লোক একটা লোকের প্রাণনাশ করিতে, মশকবধের দ্বিধাও অনুভব করিত না। লোকের দেহে তখন অসীম শক্তি ছিল, শক্তির সহকারী সাহসও ছিল; সেই শক্তি সাহসে ধর্মজ্ঞানহীন ইতর লোকেরা লোকের যথাসর্বস্ব লুঠিয়া খাইত। অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থের সন্তানও এই জঘন্য জীবিকা অবলম্বন করিতেন, নেতৃত্ব করিতেন, কেহবা খুনে ডাকাতির আড্ডাধারী ছিলেন।

...বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের আমলেই কড়াকড়ির সূত্রপাত কড়াকড়ির সূত্রপাত। ঠগী কমিস্যনর দেশে দেশে, নগরে নগরে – এমন কি প্রতি পল্লীর মাদ্রাসা পাঠশালায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; লোকের মুখে অনুসন্ধান লইতেছেন, একটু বনেদি বড়লোকের চালাক ছেলে পাইলেই, - কমিস্যনর বাহাদুর তাহাদিগকে দারগাগিরি দেবেন।

কোম্পানির শাসনাধীন দারগাগিরি বড় হইতেও বড় পদ। হাকিমত্ব হাকিম হইতেও অধিক। কি খ্যাতি প্রতিপত্তিতে, কি শাসনে জুলুমে, মানে সম্ভ্রমে থানার দারগারা জেলার বড় হাকিম হইতেও বড়। কমিস্যনর বাহাদুর এই লোভনীয় পদের জন্য দেশের চালাক চতুর ছোকরা খুঁজিতেছেন। যাহারা লায়েক, তাদাদের পক্ষে এ বড় সুসময়।

জেলার যিনি মীরমুন্সী, সেই মুন্সী সাহেবের একটা মাদ্রাসা ছিল; সকালে বিকালে সাহেব পাঠ দিতেন, দশ বারটি ছাত্র আমরা মুন্সী সাহেবের নিকট পাঠ লইতাম। বয়স তখন আমার একুশ বাইশ। চৌহারা হাফেজ দেশ হইতে সারিয়া আসিয়াছিলেন; এখানে সরিফের প্রায় তাবৎ বয়েৎ কণ্ঠস্থ করিয়াছি; পাঠ সাঙ্গের আর বিলম্ব নাই।

বেশ মনে পড়ে, মাঘ মাস, - খুব শীত, রৌদ্রে বসিয়া ছাত্রদলে বকামী করিতেছি, মুন্সী সাহেব হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন, ‘তুমি দারগা হইবে ?’

মানে সম্ভ্রমে বা ক্ষমতা প্রতিপত্তিতে এ পদটি যে অদ্বিতীয়, তাহা দেশের বালবাচ্ছা সকলেই জানে; পয়সাও প্রচুর। ঘুষ-ঘাসের একটা সত্য মিথ্যাময় অপবাদ পুলিশের চরিত্রে চিরদিনই আছে সত্য, তথাপি সৎ পথেও পয়সার অভাব ছিল না। চুরি ডাকাতি, জাল জুয়াচুরি, কি খুন জখমের মামলা কিনারা করিতে পারিলে, বিভাগীয় পুরস্কার ছিল অতি প্রচুর। তেমন তেমন মকর্দমার সুরৎহালের জন্য, দারগারা পাঁচ

সাতশত, হাজার টাকাও পুরস্কার পাইয়াছে, জানি। তখনও এ কথা শুনিয়াছিলাম। এ হেন চাকরির প্রস্তাবে পরম আনন্দিত হইয়া কহিলাম, 'মেহেরবাণী হয় ত করিব।' মুন্সী সাহেব বলিলেন, 'এক বাজে কমিস্যনর সাহেবের সহিত মোলাকাৎ করিও।' মোনাসেব নোকরি পাইবা।

দেখা করিলাম, মনোনীত হইলাম; স্থূল স্থূল উপদেশ লইয়া পরদিন হইতেই কাজে বাহির হইলাম। পদ পাইলাম গোয়েন্দা-পুলিশের দারদাগিরি। এলাকা, সমস্ত বঙ্গদেশ। প্রয়োজন হইলে বিদেশ গমনেও বাধা নাই। দেশের সর্বত্রই চুরি ডাকাতি, - খুন খারাপি হইতেছে, দেশে দেশে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিয়া তাহার অনুসন্ধানই প্রধান কার্য; তৎসহ ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর প্রয়োজনমত আদেশ পালন। কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম।"[৪]

বাঁকাউল্লার দপ্তর – এর সম্পাদকদ্বয় লিখছেন –

"*বাঁকাউল্লার দপ্তর* -এর রচনাকাল প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুকুমার সেন সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন যে, ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের আগে বইটি ছাপা হয়েছিল। তবে তার কত আগে, সে সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চিত হওয়া যায়নি প্রমাণাভাবে। অধ্যাপক সেন, আরও জানিয়েছেন, বরকতউল্লার সফল তদন্তের কিছু কাহিনি পুলিশের ফাইল থেকে উদ্ধার করে ইংরেজি ভাষায় ছাপা হয়েছিল আনুমানিক ১৮৫৫ সালের পর। তার বেশ কিছুকাল পরে এটি বাংলায় রূপান্তরিত ও মুদ্রিত হয় *বাঁকাউল্লার দপ্তর* নামে। অধ্যাপক সেন যেহেতু এই গ্রন্থের সঠিক প্রকাশকাল সম্পর্কে স্থির-নিশ্চিত হতে পারেননি, তাই তিনি মন্তব্য করেছিলেন *বাঁকাউল্লার দপ্তর* যদি প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের *দারোগার দপ্তর*-এর আগে প্রকাশিত হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এই বইয়ের নামের অনুসরণে প্রিয়নাথবাবু তাঁর বইয়ের নামকরণ করেছিলেন। আর যদি *দারোগার দপ্তর* আগে প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে সেই বইয়ের নামে প্রভাবিত *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এর নামকরণ করা হয়েছিল।"[৫]

যদিও, *বাঁকাউল্লার দপ্তর* - এর প্রকৃত লেখক কে, তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে আজও বিতর্ক আছে, তবে আমাদের বর্তমান আলোচনায় সে প্রসঙ্গ অবান্তর।

বাঁকাউল্লার দপ্তর – এর উল্লেখযোগ্য কাহিনিগুলি হল –

হাতকাটা হরিশ, নবীন নবেসেন্ধা, রায় মহাশয়, দেওয়ানজি, হারানী, কেঁচো খুঁড়িতে সাপ!, হরিদাস বনাম কৃষ্ণদাস, বহুরূপী, গহনাভোজী কুমীর, উমোকান্ত, নিস্তার, মামুদ হাতি ইত্যাদি।

******

গিরিশচন্দ্র বসুর লেখা *সেকালের দারোগার কাহিনী* প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে ১২৯৫ বঙ্গসনে অর্থাৎ ১৮৮৮ সালে। পরবর্তীকালে অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় জানুয়ারি, ১৯৫৮-তে।

ইংরাজি ১৮৫৩ সালের ভাদ্র মাসে নবদ্বীপ থানার দারোগা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৬০ পর্যন্ত তিনি এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। নিজের বইয়ের ভূমিকা অংশে গিরিশিচন্দ্র বসু লিখছেন –

"...আর এক কথা এই যে আমাদের দেশে ইতিহাসের সম্পূর্ণ অভাব আছে। পূর্ব্বকালের কথা দূরে যাউক, আমাদের মধ্যে জীবিত বৃদ্ধ লোকের প্রথম কিম্বা মধ্য বয়সে দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল, ভবিষ্যতে তাহারও ঠিক বৃত্তান্ত পাওয়া দুর্লভ হইবে। ইংরাজের অধীনে দেশীয় কত শত বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তি শাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় স্বীয় বিভাগে বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন কিন্তু কেহই বঙ্গভাষায় তাঁহার বহূদর্শিতার ফল লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক কিম্বা আহ্লাদের কার্য্য বিবেচনা করেন নাই। আজকাল কত জন কত রুপক, কত নাটক, কত কবিতা লিখিতেছেন; কিন্তু কেহই দেশের অব্যবহিত পূর্ব্বকালের বৃত্তান্ত সমস্ত আপন আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে বিবৃত করিতে লেখনী ধারণ করেন নাই। অনেকে অনেক বিষয় লেখা অযোগ্য বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারেন, কিন্তু যিনি ভাবীকালে বঙ্গদেশের ইতিহাস লিখিবেন তিনি দেখিবেন যে অনেক তুচ্ছ সংবাদ অভাবে সম্পূর্ণ ইতিহাস অঙ্গহীন থাকিবে। এই বিবেচনায় কেবল বর্ত্তমান পাঠকগণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নহে, কিন্তু ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকদিগের সাহায্যের উদ্দেশ্যে, এই দেশের দস্যুদিগের কীর্ত্তিকলাপের এবং সেই সঙ্গে ভূতপূর্ব্ব পুলিশের কার্য্য-প্রণালীর যতদূর পারি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"[৬]

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের কথামুখ লিখতে গিয়ে সম্পাদকদ্বয় লিখছেন –

"*সেকালের দারোগার কাহিনী*-তে 'সেকাল' হলো উনিশ শতকের ছয়ের দশক। গিরিশচন্দ্র বসু ১৮৫৩ থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ নবদ্বীপ-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর অঞ্চলে পুলিশের দারোগা ছিলেন। এই সময়কার

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর বর্ণনীয় বিষয়। তারপর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে উনিশ শতকের নয়ের দশকে স্মৃতিকাহিনীর আকারে এই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন (১৮৮৬)। হয়তো কালের ব্যবধান সত্যই খুব বেশি নয়, কিন্তু এই সময়টা ছিল খুবই অস্থির, অত্যন্ত দ্রুত সব কিছুর পরিবর্তন ঘটেছে...

গিরিশচন্দ্র যে উদ্দেশ্যে স্মৃতিকথা লেখেন তা বহুল পরিমানে সিদ্ধ হয়েছে; আধুনিক ঐতিহাসিক তাঁর রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, This is a book of exceptional worth, containing valuable information about the dacoits of mid-nineteenth century."[৭]

সেকালের দারোগার কাহিনিতে সংকলিত হয়েছে – *আমি নবদ্বীপের দারোগা হই, মনোহর ঘোষ, নীলকুঠী, চোরের আবদার, চোর বড় , না দারোগা বড় ?, খড়ে পারের রাবণ রাজা, আমরা মার খাই, হাকিম ও আমলাদের কথা, বেদিয়াজাতি ও বেদিয়া চোরের কথা, সাহেব চোর ইত্যাদি* কাহিনিগুলি।

❖

দারোগার দপ্তর -এর প্রসঙ্গ অবতারণা করতে গেলে আবার অধ্যাপক সেনেরই স্মরণাপন্ন হতে হয়। *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* বইতে অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখছেন –

"বাস্তব ও অবাস্তব ডিটেকটিভ কাহিনীর সূত্রপাত রীতিমতো করেছিলেন প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯৪৭)। ইনি কলকাতা ডিটেকটিভ পুলিশে কাজ করেছিলেন তেত্রিশ বছর ধরে। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, প্রিয়নাথ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ডিটেকটিভ পুলিশে চাকরিতে যোগদান করেন। আত্মজীবনীর উপক্রমণিকায় (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) প্রিয়নাথ লিখছেন, দীর্ঘকাল ডিটেকিটভ পুলিশের কার্য করিয়া যে সকল মকদ্দমার কিনারা করিতে সমর্থ বা সময় সময় অকৃতকার্য হইয়াছি, তাহা আমি অনেক সময় দারোগার দপ্তরে প্রকাশ করিয়া থাকি।"[৮]

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছিলেন, লেখক বলে জনসমাজে আত্মপরিচয় দেওয়ার জন্য নয়, বরং বন্ধুবর্গের অনুরোধ এড়াতে না পেরেই তিনি এই দুঃসাহসিক

কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যে দুঃসাহসিক কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যে নতুন পথের দিশা দেখাল, এ বড় কম কথা নয়।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ই জুন। নদিয়ার জয়রামপুরের চুয়াডাঙ্গায়। তাঁকে বলা হয়েছে বাংলা গোয়েন্দা গল্পের পথিকৃৎ। পেশায় ছিলেন পুলিশ কর্মচারী। তিনি *দারোগার দপ্তর* নামে একটি মাসিক পত্রিকা ১২৯৭ বঙ্গাব্দ থেকে দীর্ঘ এক যুগ চালিয়েছেন। কর্মজীবনের সাফল্যের কারণে ইংরেজ সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সুকুমার সেন বলছেন *দারোগার দপ্তর* - এর প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৩০০ সালে অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। শহরে - গাঁয়ে সর্বত্র শিক্ষিত ভদ্র বাঙালির ঘরে এই দু-চার সংখ্যা দেখা যেত।

১২৯৯ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বর্ষে *দারোগার দপ্তর* - এর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এভাবে – প্রথম থেকে দ্বাদশ সংখ্যক দারোগার দপ্তরের মূল্য ছিল এক টাকা। যাঁরা ত্রয়োদশ সংখ্যা থেকে অগ্রিম মূল্য দিয়ে এক বছরের গ্রাহক হবেন, তাঁদের পক্ষে উপরোক্ত বারো খন্ড পুস্তকের মূল্য পড়বে দেড় টাকা ।

দারোগার দপ্তর - এর তৃতীয় বছরের ভূমিকায় প্রিয়নাথ লিখেছিলেন –

"*দারোগার দপ্তর* যখন প্রথম নিয়মিতরূপে মাসে মাসে বাহির করিতে আরম্ভ করি, সেই সময়ে আমার এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল না যে, ইহাতে যত প্রবন্ধ বাহির হইবে, তাহার ঘটনা সমস্তই প্রকৃত, বা সমস্তই আমা-কর্তৃক অনুসন্ধিত। এই ভাবিয়া 'Stories' নামেই ইহার নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু দুই এক সংখ্যা বাহির হইবামাত্রই দেখিলাম, পাঠকগণ 'Stories' এই কথাটি ভুলিয়া গিয়া, ইহার সমস্তই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। সংবাদপত্র সম্পাদকগণও সমস্ত ঘটনাই প্রকৃত বলিয়া সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। কোন কোন বিজ্ঞ সমালোচক অনুসন্ধানকারীর কোনরূপ দোষ না থাকিলেও লেখকের প্রতি অন্যায় কটাক্ষ প্রদান করিতেও ত্রুটি করিতেছেন না। এইসকল অবস্থা দেখিয়া আমি এরূপ পন্থা অবলম্বন করিব মনে করিয়াছি যে, তাহাতে তাঁহারা প্রকৃত ও কল্পিত ঘটনাদ্বয়ের পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ হন। .....পাঠকগণ

পাছে প্রকৃত ঘটনাকে অপ্রকৃত এবং অপ্রকৃত ঘটনাকে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত এখন হইতে আমি নিয়ম করিলাম, যে সকল প্রবন্ধ পূর্বের ন্যায় প্রথম পুরুষে বক্তাভাবে লিখিত হইবে, তাহার সমস্তই প্রকৃত ঘটনা। কেবল অধিকাংশ স্থলে নাম ও ঠিকানার পরিবর্তন থাকিবে মাত্র। প্রথম পুরুষ ব্যতিরেকে যে সকল ঘটনা লিখিত হইবে, তাহার সমস্তই অপ্রকৃত, স্বকপোলকল্পিত, অথবা ইংরাজি বা অপর কোনো গ্রন্থের ভাবালম্বনে লিখিত হইবে।”[৯]

দ্বিতীয় বছরের ভূমিকায় এই পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ বাণীনাথ নন্দী জানিয়েছিলেন, বিদেশে তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যে ডিটেকটিভ গল্পের বাহুল্য আছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশে পাঠকসমাজের মধ্যে পড়ার আগ্রহ থাকলেও তখনও সেই ধরণের লেখালেখির বিশেষ চল ছিল না। সেই অভাব কিছুটা মেটানোর জন্যই তাঁরা প্রতি মাসে নিয়ম করে *দারোগার দপ্তর* প্রকাশ করতে থাকেন। এ বিষয়ে তিনি জানাচ্ছেন –

“গ্রন্থকার ও প্রকাশক দুইজন বিভিন্ন ব্যক্তি হইলে সেই উভয় কার্যে সুশৃঙ্খলার সম্ভাবনা অধিক বলিয়াই আমরা সেই পন্থা অবলম্বন করিলাম। ডিটেকটিভ পুলিশের বিখ্যাত কর্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত অনেকগুলি ডিটেকটিভের গল্প আমাদের হস্তগত হইয়াছে, সেইগুলি ক্রমে ক্রমে ধারাবাহিকরূপে এই মাসিক পুস্তকে প্রকাশিত হইতে চলিল। বিশেষতঃ যাহাতে এই পুস্তকগুলি বাঙ্গালাভাষার বাস্তবিক পরিপুষ্টি সাধন করিতে পারে, আমরা যথোচিত রূপে তাহার চেষ্টা করিব।”[১০]

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় যে শুধুমাত্র বিচক্ষণ পুলিশ কর্মচারীই ছিলেন না, সেই সাথে যে একজন সুলেখকও ছিলেন, তার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে *বনমালী দাসের হত্যা, যমালয়ের ফেরতা মানুষ, জুয়াচোরের বাহাদুরি, জালিয়াৎ যদু, জুয়াচোরের তীর্থযাত্রা, অদ্ভূত হত্যা, চোরের গাড়ি চড়া, চোরে চতুরে, চোরের চক্ষুদান, চোরের উপর বাটপাড়ি, জুয়াচোরের শিবপূজা, কৃত্রিম মুদ্রা, কুলসম, আসমানী লাশ* ইত্যাদি গল্পের পর গল্পে। তিনি যে তাঁর কার্যক্ষেত্রে কতদূর গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, তা তাঁর নিজের লেখা থেকেই বোঝা যায় -

"যে সকল লোমহর্ষণকারী হত্যাকান্ডের নায়ক স্থির না হয়, অথবা যে মোকদ্দমার হত্যাকারী পলায়িত বা লুক্কায়িত থাকে, সেই সকল মোকদ্দমার সন্ধানের ভার অধিকাংশই আমার হস্তে পতিত হয়। যে সকল স্থানে চুরি, জুয়াচুরি, জাল প্রভৃতির কোন সন্ধান প্রথমে পাওয়া যায় না, সেই সকল স্থানেও আমাকে সর্ব্বদা গমন করিতে হয়।"[১১]

অথবা আরেক জায়গায় লিখছেন –

"কোন ব্যক্তি সর্প কর্তৃক দংশিত হইয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিলে, সাপের ওঝার যেমন আর স্থির থাকিবার যো নাই, শ্রবণমাত্রই যেমন তাহাকে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া সর্পাঘাতের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে হয়; সেইরূপ খুনের কথা শ্রবণ করিলে, সাপের ওঝার মত আ,আমাদিগকেও সেই হত্যা-স্থানে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়।"[১২]

প্রিয়নাথবাবু বেশ রসিক মানুষও ছিলেন। তাঁর রসিকতার নমুনা *দারোগার দপ্তরের* ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে। এমনকি, নিজের পেশাকে নিয়েও তিনি রসিকতা করতে ছাড়েননি। যেমন, 'বামুন ঠাকুর'-এর কাহিনি লিখতে গিয়ে তিনি লিখছেন

"পাঠক মহাশয় ! দেখিলেন, আমরা কিরূপ সৎপথ অবলম্বন করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়া থাকি ? আপনারা যদি ভ্রমক্রমেও একটি মিথ্যা কথা বলেন, তাহা হইলে তাহার জন্য অনুশোচনা আপনাদিগের হৃদয় হইতে সহসা দূর হয় না। আর আমরা ভ্রমক্রমেও একটি সত্য কথা বলিতে শিখি নাই। পলে পলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কেবল মিথ্যা কথাই বলিয়া থাকি। আর এই নিমিত্তই আপনারা আমাদিগের বোধ হয়, এত বিশ্বাস করেন !!"[১৩]

দারোগার দপ্তর - এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, প্রিয়নাথবাবু তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীদের, এমনকি অনেক সময় তাঁর অধস্তন কর্মচারীদেরও কিছু চমকপ্রদ তদন্তের ঘটনা তাঁর লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। যেমন, 'প্রমদা' গল্পে প্রিয়নাথ পাঠকের দরবারে জনৈক গ্রাম্য দারোগা বাঁশীরামের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির চমৎকার এক কাহিনি

পরিবেশন করেছেন। সামান্য একজন গ্রাম্য দারোগাও যে তার কাজের প্রতি কতদূর সজাগ এবং আত্মবিশ্বাসী, তা যে গ্রামে সে খুনের তদন্ত করতে গেছে, সেই গ্রামের পঞ্চায়েৎ-এর সাথে বাঁশীরামের একটি কথোপকথনেই স্পষ্ট হয় –

"পঞ্চায়েৎ - ..... আপনারা কোন সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, কোন্ ব্যক্তির দ্বারা সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার দিকে একেবারেই লক্ষ্য না করিয়া, প্রথমে অনাবশ্যক কথার আন্দোলনে যে কেন সময় নষ্ট করিয়া থাকেন, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন, নবকুমার হত হইয়াছেন; কোন ব্যক্তি তাহাকে হত্যা করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। আপনি সেই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত একবারের নিমিত্তও ভাবিয়াছেন কি যে, কাহার দ্বারা এই হত্যাকান্ড সম্পন্ন হইল ? সে দিকে আপনার লক্ষ্য একবারের নিমিত্তও পতিত হয় নাই। কেবল মিথ্যা বিষয় লইয়া, অর্থাৎ কিরূপ অস্ত্রের দ্বারা নবকুমারকে আঘাত করা হইয়াছে, নবকুমার সেই সময় বসিয়াছিল, কি দাঁড়াইয়াছিল, সম্মুখ হইতে মারিয়েছে, কি পশ্চাৎ হইতে মারিয়াছে, প্রভৃতি নানারূপ বাজে কথায় সময় নষ্ট করিতেছেন। এ সকল বিষয় তর্ক দ্বারা অনুমান করিয়া লওয়া অপেক্ষা যদি হত্যাকারীকে ধরিতে পারেন, তাহা হইলে তখন আপনার প্রয়োজন মত তাহারই নিকট সকল কথা জানিয়া লইতে পারিবেন। আমার বিবেচনায় এই সকল বিষয়ে সময় নষ্ট করা অপেক্ষা, কাহার দ্বারা এই হত্যাকান্ড সম্পন্ন হইয়াছে, সেই বিষয় অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চায়েতের কথা শুনিয়া বাঁশীরাম একটু হাসিলেন ও কহিলেন, আপনারা যেরূপ সরল প্রকৃতির লোক, সেইরূপ ভাবেই আমাকে বলিলেন। কাহার দ্বারা এই হত্যা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাকে একেবারে ধরিবার যদি চেষ্টা করি, তাহা হইলে এই সকল বাজে কথার প্রয়োজন কি? পুলিস-কর্ম্মচারী যদি সর্বজ্ঞ হইতেন, ভূত ভবিষ্যৎ স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে কোন বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকই হইত না। যেমন কোন অপরাধ সংঘঠিত হইত, অমনি পুলিশ-কর্ম্মচারী দ্রুতপদে গমন করিয়া সেই অপরাধীকে রাজদ্বারে লইয়া উপস্থিত করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ক্ষমতা, ঈশ্বর পুলিশ-কর্ম্মচারীকে প্রদান করেন নাই বলিয়া, প্রথমে এই সকল অনুসন্ধান যাহাকে আপনারা বাজে অনুসন্ধান বলিয়া বিবেচনা করেন – আমাদিগকে করিতে হয়। নতুবা ইহার প্রকৃত পথ আমরা কোনরূপেই প্রাপ্ত হইতেপারি না। যে সকল বিষয় আপনারা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উড়াইয়া দেন, সেই সকল বিষয় হইতেই আমরা ইহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হই। তাহার দৃষ্টান্ত, এই বর্ত্তমান অনুসন্ধানেই কেন দেখুন না ? .....এইরূপ সামান্য সামান্য অবস্থা দৃষ্টি করিয়া, এই সকল মোকদ্দমার নায়ক স্থির করিতে হয় বলিয়াই, যে বিষয় আপনাদিগের ভাল লাগে না, আমাদিগকে সেই সকল বিষয়ই বিশেষ সতর্কতার সহিত দেখিতে হয়। এই নিমিত্ত আমরা দোষী ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যে সকল বিষয়কে আপনারা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন, সেই সকল বিষয়কেই আমাদিগকে প্রথমে লক্ষ্য করিতে হয়। যদি সেই

সকল অবস্থা হইতে কোন সূত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে মোকদ্দমার উপায় হয়। ও দোষী ব্যক্তি পরিত্রাণ পায় না। যদি কোন সূত্র পাওয়া না যায়, তাহা হইলে উহার অনুসন্ধান কিছু কঠিন হইয়া উঠে।”[১৪]

দারোগার দপ্তর – এ সংকলিত কাহিনিগুলি প্রকাশের কাল অনুসারে নিচে সাজিয়ে দেওয়া হল -

যমালয়ের ফেরতা মানুষ; জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯, অদ্ভুত-হত্যা; আশ্বিন ১২৯৯, চোরের গাড়ি চড়া; কার্তিক ১২৯৯, কৃত্রিম মুদ্রা; চৈত্র ১২৯৯, কুল্‌সম বৈশাখ ১৩০০; আস্‌মানী লাস (ভয়ানক লোমহর্ষণকর অদ্ভুত ঘটনা !!); জ্যৈষ্ঠ ১৩০০, চোরের উপর !! (অতি অদ্ভুত অনুসন্ধান কাহিনী); আষাঢ় ১৩০০, শঠে শঠে (কুটিল কৌশলের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত); শ্রাবণ ১৩০০, মার ধন চুরি (ধনী-পুত্রের প্রেমের দায় !); ভাদ্র ১৩০০, হত্যারহস্য (খুনীকে গুম করিবার চেষ্টা); আশ্বিন ১৩০০, কাটামুণ্ড (বেওয়ারিস মালের অনুসন্ধান !); কার্তিক ১৩০০, বামুন ঠাকুর (বিদ্যার অভাবে অবিদ্যার প্রভাব); অগ্রহায়ণ ১৩০০, এ কি ! খুন !! (ছোরাবিদ্ধ স্ত্রীর সহিত ধৃত স্বামীর আশ্চর্য রহস্য); পৌষ ১৩০০, বিষম সমস্যা (হৃতা সর্বস্বা বারাঙ্গনার মৃতদেহের অদ্ভুত রহস্য !); মাঘ ১৩০০, বলিহারি বুদ্ধি ! (কোন গুপ্তহত্যার গূঢ় রহস্যভেদ ও চোরের স্ত্রীর অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব); ফাল্গুন ১৩০০, আবীর-জান (কামিনীর কুটিলচক্র ভেদ); চৈত্র ১৩০০, গিরিজাসুন্দরী (রাজধানীর রাজবর্ত্মে রমণী-হত্যা); বৈশাখ ১৩০১, প্রমদা (কূলবধূ ব্যভিচারে ঘটায় প্রমাদ!); জ্যৈষ্ঠ ১৩০১, বাঃ গ্রন্থকার (অর্থাৎ পুস্তক-প্রণেতার অদ্ভুত জুয়াচুরি রহস্য !); আষাঢ় ১৩০১, যেমন তেমনি ! (অর্থাৎ, চতুর পালিত পুত্রের বিদ্যা প্রকাশ !!); ভাদ্র ১৩০১, নিরুদ্দেশ ভাই (অর্থাৎ উত্তরাধিকারী পুত্রের বিষয় প্রাপ্তির আশ্চর্য রহস্য ?); আশ্বিন ১৩০১, অর্থই অনর্থ (অর্থাৎ অর্থলাভে বিশ্বস্ত বন্ধুর সর্ব্বনাশ !); কার্তিক ১৩০১, চতুর চোর (অর্থাৎ প্রচুর পাহারার ভিতরেও চুরি করার রহস্য !); অগ্রহায়ণ ১৩০১, ইংরেজ ডাকাত প্রথম অংশ (হিলি ও ওয়ার্ণার নামক দুইজন দস্যুর অদ্ভুত বৃত্তান্ত); পৌষ ১৩০১, ইংরেজ ডাকাত শেষ অংশ (হিলি ও ওয়ার্ণার নামক দুইজন দস্যুর অদ্ভুত বৃত্তান্ত); মাঘ ১৩০১, ডাক চোর (পোষ্ট-আফিসের ডাকপত্র ও মণি-অর্ডারাদি হরণ-রহস্য !); ফাল্গুন ১৩০১, সিঁদেল চোর (একটি প্রসিদ্ধ মুসলমান চোরের জীবন-

কাহিনী); চৈত্র ১৩০১, মুণ্ডচুরি (অর্থাৎ একটি মস্তকহীন মনুষ্যের আশ্চর্য্য রহস্য !); বৈশাখ ১৩০২, এ আবার কি ! (অর্থাৎ আত্মহত্যা না খুন ?); জ্যৈষ্ঠ ১৩০২, কাপ্তেন মতি (অর্থাৎ নোট জালকারীর অদ্ভুত রহস্য); আষাঢ় ১৩০২, স্ত্রী কি পুরুষ ? (অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ চিহ্নবিশিষ্ট লাসের টুক্‌রার ভয়ানক আশ্চর্য্য রহস্য !); শ্রাবণ ১৩০২, ঘটনা-চক্র (অর্থাৎ দ্বীপান্তরিত কয়েদীর অদ্ভুত আত্মত্যাগ কাহিনী); ভাদ্র ১৩০২, বালক চুরি (বালক চুরির ও ভয়ানক হত্যাকান্ডের অত্যদ্ভুত রহস্য !); আশ্বিন ১৩০২, চোরের বুদ্ধি (অর্থাৎ চরিত্রহীনের তীক্ষ্ণবুদ্ধির দৃষ্টান্ত রহস্য !); কার্তিক ১৩০২, নীলে কয়লা (অর্থাৎ জুয়াচোরের অদ্ভুত সাহস !); অগ্রহায়ণ ১৩০২, পিতৃ – শ্রাদ্ধ ("কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামন মরে !"); পৌষ ১৩০২, এ কি পিতৃ-হত্যা ? (অর্থাৎ পিতৃ-হত্যাপরাধে অভিযুক্ত পুত্রের অদ্ভুত রহস্য !); মাঘ ১৩০২, বেকুব বৈজ্ঞানিক (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকের চক্ষুতে অজ্ঞলোকের ধূলিনিক্ষেপের অদ্ভুত রহস্য !); ফাল্গুন ১৩০২, পুলিস-বুদ্ধি (অর্থাৎ সামান্য পুলিশ কর্মচারীর বুদ্ধিবলে সেসন জজের রায় পরিবর্তনের আশ্চর্য্য রহস্য !); চৈত্র ১৩০২, চক্রভেদ (অর্থাৎ কুটিল চক্রীদিগের মন্ত্রভেদে অসমর্থ হইলেও ঘটনাচক্রে সমস্ত প্রকাশের রহস্য !); বৈশাখ ১৩০৩, পথে খুন ! প্রথম অংশ (অর্থাৎ রাজবর্ত্মে গাড়ির ভিতর হত্যা ও তৎহত্যাকারী ধৃত করিবার অদ্ভুত কৌশল !); জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩, পথে খুন ! শেষ অংশ (অর্থাৎ রাজবর্ত্মে গাড়ির ভিতর হত্যা ও তৎহত্যাকারী ধৃত করিবার অদ্ভুত কৌশল !); আষাঢ় ১৩০৩, জুয়াচুরি (অর্থাৎ জুয়াচোরদিগের অত্যাশ্চর্য্য অভেদ্য কতিপয় কার্য্য-কৌশল); শ্রাবণ ১৩০৩, পালোয়ানী চুরি (অথবা যেমন চোর, তেমনই পুলিশ !); ভাদ্র ১৩০৩, হিন্দু-রমণী (অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষীভূত একটি সতীর আশ্চর্য্য স্বামীভক্তি !); আশ্বিন ১৩০৩, রেলে যম (অর্থাৎ রেলওয়ে যাত্রীর মহাদুর্ঘটনার একটি লোমহর্ষণকর দৃষ্টান্ত !); কার্তিক ১৩০৩, ডাকাত - সর্দ্দার (অর্থাৎ প্রসিদ্ধ দস্যু - দলপতি কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর বীভৎস কাহিনী); অগ্রহায়ণ ১৩০৩, কি ভয়ানক ! (অর্থাৎ সিঁদ – চুরি মোকদ্দমার অনুসন্ধানে অদ্ভুত ভয়াবহ রহস্য প্রকাশ); পৌষ ১৩০৩, চোর চৌঘুড়িতে (অর্থাৎ ভদ্র (!) চোরের সাহসকে বলিহারি !); মাঘ ১৩০৩, কৃপণের দণ্ড (অর্থাৎ অর্থের নিমিত্ত কৃপণের যে কিরূপ পরিণাম হয়, তাহার অদ্ভুত দৃষ্টান্ত !); ফাল্গুন ১৩০৩, বিশ্বাস কারে করি ? (অর্থাৎ আত্মীয় কর্ত্তৃক একটি বালিকার হত্যারহস্য ও পুলিশের জুলুম); চৈত্র ১৩০৩, শেষ লীলা (অর্থাৎ ত্রৈলোক্যতারিণীর জীবনের শেষ অভিনয় !); আশ্বিন ১৩০৫, দায়ে খুন (অর্থাৎ যেমন জুয়াচুরি তেমনই সাজা !); ফাল্গুন

১৩০৫, চেনা দায় (অর্থাৎ কলিকাতার জুয়াচোরগণকে চেনা ভার !); চৈত্র ১৩০৫, খুনিতে – খুনিতে (অর্থাৎ যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল !); আষাঢ় ১৩০৬, সাবাইস চোর (অর্থাৎ চোরের অদ্ভুত বুদ্ধি !); শ্রাবণ ১৩০৬, কি না হয় ? (অর্থাৎ ঘোড়দৌড়ের কাণ্ড কারখানা !); ভাদ্র ১৩০৬, মা, না রাক্ষসী ? (অর্থাৎ সতী, অসতী হইলে তাহার ভয়ানক ফল !); আশ্বিন ১৩০৬, গুপ্ত রহস্য (অর্থাৎ জনৈক ধনশালী ব্যক্তির চরিত্রের গুপ্ত কথা প্রকাশ !); কার্তিক ১৩০৬, ঘুসখোরি বুদ্ধি (অর্থাৎ জনৈক সেকেলে পুলিশ-কর্ম্মচারীর ঘুষ লইবার অদ্ভুত উপায় !); অগ্রহায়ণ ১৩০৬, কৃপনের ধন প্রথম অংশ (অর্থাৎ কৃপণের ধন ও জীবনের পরিণাম !); পৌষ ১৩০৬, কৃপনের ধন শেষ অংশ (অর্থাৎ কৃপণের ধন ও জীবনের পরিণাম !); মাঘ ১৩০৬, কয়েক রকম (অর্থাৎ কয়েক প্রকার জুয়াচুরির অদ্ভুত রহস্য !); ফাল্গুন ১৩০৬, কুঠিয়াল সাহেব ! প্রথম অংশ (অর্থাৎ সেকেলে নীলকর সাহেবের ভীষণ-অত্যাচার কাহিনী !); কার্তিক ১৩০৭, কুঠিয়াল সাহেব ! শেষ অংশ (অর্থাৎ সেকেলে নীলকর সাহেবের ভীষণ-অত্যাচার কাহিনী !); অগ্রহায়ণ ১৩০৭, মিস্ মেরি; বৈশাখ ১৩০৮,সহুরে মেয়ে (অর্থাৎ কলিকাতা নিবাসী জনৈক বালিকার অদ্ভুত রহস্য !); জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮, বিষম ভ্রম ! প্রথম অংশ (অর্থাৎ লাস সনাক্তে বিষম ভ্রম !); আষাঢ় ১৩০৮, বিষম ভ্রম ! শেষ অংশ (অর্থাৎ লাস সনাক্তে বিষম ভ্রম !); শ্রাবণ ১৩০৮, লাল পাগড়ি ! প্রথম অংশ (অর্থাৎ লাল-পাগড়ি পরিহিতের অদ্ভুত রহস্য !); ভাদ্র ১৩০৮, লাল পাগড়ি ! শেষ অংশ (অর্থাৎ লাল-পাগড়ি পরিহিতের অদ্ভুত রহস্য !); আশ্বিন ১৩০৮, কু-বুদ্ধি প্রথম অংশ (অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের বুঝিবার বিষম ভ্রম); অগ্রহায়ণ ১৩০৮, কু-বুদ্ধি শেষ অংশ (অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের বুঝিবার বিষম ভ্রম); পৌষ ১৩০৮, রাঙ্গা বউ (অর্থাৎ স্ত্রী চরিত্রের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত !); মাঘ ১৩০৮, ডাক্তারবাবু প্রথম কাণ্ড (অর্থাৎ কুপথগামী বুদ্ধিমান লোকের ভয়ানক জীবনী !); ফাল্গুন ১৩০৮, ডাক্তারবাবু শেষ কাণ্ড (অর্থাৎ কুপথগামী বুদ্ধিমান লোকের ভয়ানক জীবনী !); চৈত্র ১৩০৮, গুপ্ত – রহস্য (অর্থাৎ তারামণির প্রমুখাৎ ভয়ানক গুপ্ত – রহস্য প্রকাশ); জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, মণিপুরের সেনাপতি প্রথম অংশ (অর্থাৎ টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের জন্ম হইতে ১৩ আগষ্ট ফাঁসী হওয়ার দিবস পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনার আশ্চর্য্য রহস্য !); আষাঢ় ১৩১১, মণিপুরের সেনাপতি দ্বিতীয় অংশ (অর্থাৎ টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের জন্ম হইতে ১৩ আগষ্ট ফাঁসী হওয়ার দিবস পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনার আশ্চর্য্য রহস্য !); শ্রাবণ ১৩১১, মণিপুরের সেনাপতি শেষ অংশ (অর্থাৎ টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের জন্ম হইতে

১৩ আগষ্ট ফাঁসী হওয়ার দিবস পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনার আশ্চর্য্য রহস্য !); ভাদ্র ১৩১১, কামতাপ্রসাদ (অর্থাৎ যেমন দস্যু, তেমনই জীবনী !); আশ্বিন ১৩১১, সাবাইস বুদ্ধি (অর্থাৎ একটি স্ত্রীলোকের অদ্ভুত জুয়াচুরি রহস্য !); কার্তিক ১৩১১, বিষম বুদ্ধি (অর্থাৎ হত্যাকারীকে বাঁচাইবার অদ্ভুত রহস্য !); অগ্রহায়ণ ১৩১১, রাজা সাহেব প্রথম অংশ; পৌষ ১৩১১, রাজা সাহেব দ্বিতীয় অংশ; মাঘ ১৩১১, রাজা সাহেব শেষ অংশ; ফাল্গুন ১৩১১, অদ্ভুত ভিখারী (বা বিষম ভ্রমে পতিত পুলিস কর্ম্মচারীর হত্যার অনুসন্ধান); চৈত্র ১৩১১, ভীষণ হত্যা; বৈশাখ ১৩১৩, নকল রাণী (অর্থাৎ স্বামী হত্যাপবাদের কলঙ্ক বিমোচনের চেষ্টা); জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩, দীর্ঘকেশী (অর্থাৎ দীর্ঘকেশী স্ত্রীলোকের মস্তক সম্বন্ধে অদ্ভুত রহস্য); আষাঢ় ১৩১৩, উভয় সঙ্কট; শ্রাবণ ১৩১৩, মানিনী; ভাদ্র ১৩১৩, কাল – পরিণয়; আশ্বিন ১৩১৩, জীবন বীমা (অর্থাৎ জীবনবীমার ভয়ানক চুরি !); কার্তিক ১৩১৩, ছবি; অগ্রহায়ণ ১৩১৩, খুনী কে ? পৌষ ১৩১৩, বাঁশী; মাঘ ১৩১৩, রক্ষক না ভক্ষক (অর্থাৎ ছেলেধরা বা সহরে অশান্তি !); ফাল্গুন ১৩১৩, চূর্ণ প্রতিমা (বা, পাগলের অদ্ভুত পাগলামি); চৈত্র ১৩১৩।

******

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের পর তাঁরই অনুসরণে বাংলা ক্রাইম কাহিনির ধারাটিকে আরও খানিকটা এগিয়ে দিলেন শরচ্চন্দ্র দেব। তিনি প্রকাশ করতেন মাসিক *গোয়েন্দা কাহিনী* পুস্তকমালা । এই পত্রিকাটি ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৮ পর্যন্ত চলেছিল।

শরচ্চন্দ্র দেবের *গোয়েন্দা কাহিনী* - র আগে কোন বই এত বেশি মুদ্রিত হয়নি। *গোয়েন্দা কাহিনীর* প্রত্যেক খণ্ড সপ্তাহে দু'দিন করে সাময়িক পত্রের মতো ফর্মা ধরে বিক্রি হত। ছাপা হতো কলুটোলার ৪৯ নম্বর ফিয়ার্স লেনের মোহন প্রেসে। *গোয়েন্দা কাহিনী* - র কার্যালয় ছিল সিমলার কাছে, চোরবাগানে। পত্রিকাটির সব সংখ্যাই প্রকাশিত হতো 'শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার সঙ্কলিত' বলে। তবে লেখক অনেকেই ছিলেন বলে অনুমান। শরচ্চন্দ্র তো ছিলেনই, সম্ভবত পাঁচকড়ি দে এবং আরও অনেকে মিলে এই পত্রিকায় লেখালেখি করতেন।

সেকালে যে ইংরেজি শিক্ষিত, সমাজের মান্যগণ্য লোকেরাও *গোয়েন্দা কাহিনী* পড়তেন, তা বোঝা যায় এই *গোয়েন্দা কাহিনী* পুস্তকমালার উৎসর্গপত্রগুলি দেখলে। প্রত্যেক সংখ্যা কোন না কোন বিখ্যাত পণ্ডিত অথবা সাহিত্যিককে উৎসর্গ করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, দামোদর মুখোপাধ্যায়ের মত স্বনামধন্য মানুষেরা।

বাংলা ক্রাইম কাহিনিকে ইংরেজি শিক্ষিত পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার কৃতিত্ব প্রধানত শরচ্চন্দ্রেরই।

গোয়েন্দা কাহিনী পুস্তকমালায় প্রকাশিত কাহিনিগুলি –

সাবাস চুরি, উইল জাল, রঘু ডাকাত, ডবল খুন, চতুরে চতুরে, খুন না হত্যা, ভীষণ নরহত্যা, ভীষণ নারীহত্যা, ভাতৃহত্যা, স্বামিহত্যা, বাহাদুর চোর, দিনে ডাকাতি, অদলবদল, এরা কি, গুম খুন ইত্যাদি।

******

শরচ্চন্দ্র সরকারের বইকে পুনঃপ্রকাশের মাধ্যমে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন পাঁচকড়ি দে। পাঁচকড়ি দে'র প্রথম বই *সতী শোভনা* , যার মূল বিদেশি। ইনি প্রথম বাংলা সাহিত্যে জোড়া গোয়েন্দার ধারণা নিয়ে আসেন। তাঁর গোয়েন্দা চরিত্রদের নাম ছিল দেবেন্দ্রবিজয়, এবং তার গুরু অরিন্দম।

যদিও, *পরিমল* নামক কাহিনিতে সঞ্জীবচন্দ্র নামের এক ডিটেকটিভকে দেখতে পাওয়া যায়। *গোয়েন্দার গ্রেপ্তার* নামের একটি সিরিজে পাঁচকড়িবাবুর *জুমেলিয়া* উপন্যাসটি কিছুদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ১৮৯৯ – তে বইটি *মায়াবিনী* নাম দিয়ে

সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হয়। এই *মায়াবিনী* – তেই প্রথম দেবেন্দ্রবিজয়ের আবির্ভাব ঘটে। এরপর ১৯০১ – এ প্রকাশিত হয় *মায়াবী,* যেখানে দেবেন্দ্রবিজয়ের সাথে দেখা দেন তার গুরু অরিন্দম।

১৯০৩ – এ প্রকাশিত হয় *জীবন্মৃত রহস্য* । লেখকের মতে 'হিপনটিক রহস্য'। এই গল্পে ডিটেকটিভের স্থান নিয়েছেন ডাক্তার বেন্টউড। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। বইটির পঞ্চম সংস্করণে নাম পরিবর্তন করে *সেলিনাসুন্দরী* রাখা হয়েছিল। *নীলবসনা সুন্দরী* প্রকাশিত হয় ১৯০৪ – এ। ডিটেকটিভ সেই অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয়।

এছাড়াও, পাঁচকড়ি দে'র আরও কয়েকটি কাহিনি হল –

মনোরমা, কালসর্পী, প্রতিজ্ঞাপালন, বিষমবৈসূচন, ভীষণ প্রতিহিংসা, রহস্যবিপ্লব, লক্ষ টাকা ইত্যাদি।

******

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রায় সমসময়ে বা কিছুকাল পরে বটতলার সাহিত্য নামে এক বিশেষ রুচির, বিশেষ ধরণের বই বেশ কিছুদিন ধরে সাধারণ জনমানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। অধ্যাপক সেন লিখছেন –

"প্রিয়নাথের সঙ্গে ভুবনচন্দ্রের কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা জানি না এবং একথাও মানতে হয় যে প্রিয়নাথের অনেককাল আগে ভুবনচন্দ্র কেচ্ছাকেলেঙ্কারি ও ক্রাইম কাহিনী ঘটনা নিয়ে বড় রহস্য উপন্যাস লিখতে বা অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন। একদা ভুবনচন্দ্রের রহস্য উপন্যাস 'হরিদাসের গুপ্তকথা' বটতলা বইয়ের বাজারকে সরগরম করে রেখেছিল।

...ভুবনচন্দ্র অনেকগুলি ছোটবড় বিলাতী বইয়ের কাহিনীকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন।

...ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এবং আরো দু'একজন) বটতলার বাজারে যে উৎকট উদ্ভট রোমান্টিক কেচ্ছা-ক্রাইম কাহিনী চালু করেছিলেন তার একটা পরিণতি হয়েছিল পুরোপুরি দুশমন কাহিনীতে।"[১৫]

মূলত সমাজের নিচুতলার মানুষ বলে যারা পরিচিত, সেইরকম নানান পেশার চরিত্র সম্বলিত এইধরণের কাহিনিতে স্থূলরুচি, যৌনকেচ্ছা-কেলেংকারি এবং মোটাদাগের অপরাধমূলক গল্প বলা হতো। তদন্তের চমৎকারিত্বের বর্ণনার তুলনায় দুর্ঘটনার ভয়ংকরতার বর্ণনাই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠত। খুব সঙ্গত কারণেই, আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিসর থেকে এই অংশটিকে বাদ রাখা হল।

❖

ভারতী পত্রিকাকে ঘিরে যে লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, হেমেন্দ্রকুমার রায় (২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮- ১৮ই এপ্রিল, ১৯৬৩) ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূলধারার সাহিত্যচর্চা করতে করতে তিনি হঠাৎ করেই শিশু-কিশোর সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। মানবিকতায় ভরপুর গল্প-উপন্যাস, গা-ছমছমে ভূতুড়ে কাহিনির পাশাপাশি ইতিহাস-আশ্রিত কাহিনিরও সেখানে উজ্জ্বল উপস্থিতি। হেমেন্দ্রকুমারকে ছোটদের সাহিত্যের আঙিনায় নিয়ে এসেছিলেন *মৌচাক* - এর সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার।

কীভাবে এসেছিলেন শিশু-কিশোর সাহিত্যে, *মৌচাক* - এর রজতজয়ন্তী বর্ষের এক সংখ্যায় লেখক নিজেই জানিয়েছিলেন সে কথা –

"একদিন সুধীরকে বললুম, 'অ্যাডভেঞ্চারের গল্প হচ্ছে বিলাতের ছোটদের সাহিত্যের একটি প্রধান অবলম্বন। আমার মনে হয়, এখানেও ছোটদের মহলে এরকম রচনার আদর কম হবে না। একবার পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয় ?"[১৬]

বলাই বাহুল্য, সুধীরবাবু সাগ্রহে সম্মত হয়েছিলেন। অতঃপর আত্মপ্রকাশ করে দুই বন্ধু বিমল ও কুমারের রুদ্ধশ্বাস অভিযানের কাহিনি *যখের ধন*, এবং সাহিত্যজগতে তা যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তা 'বিস্ময়জনক' ও 'আশাপ্রদ'।

এবার আসা যাক হেমেন্দ্রকুমারের গোয়েন্দা জয়ন্ত ও তার সহকারী-বন্ধু মানিকের কথায়। বাংলা ভাষায় প্রথম গোয়েন্দাকাহিনি কে লেখেন, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, গিরিশচন্দ্র বসুই প্রথম, তাঁর *সেকালের দারোগার কাহিনির* সূত্রে। *নবজীবন* পত্রিকায় চার বছর ধরে ছাপা হয়েছিল এটি। নিজের তদন্তসূত্রে পাওয়া অভিজ্ঞতা থেকে গল্প শুনিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন সেকালের আরেক দারোগাও, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। প্রিয়নাথের প্রায় সমসাময়িক আরও দু'জন লেখক, পাঁচকড়ি দে এবং দীনেন্দ্রকুমার রায়ও গোয়েন্দা গল্প লিখে পাঠকসমাজে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে পাঁচকড়ি দে বড়দের জন্য লিখতেন, আর দীনেন্দ্রকুমার বেশিরভাগই বিদেশি ক্রাইম-অ্যাডভেঞ্চার ও রহস্যকাহিনি অনুবাদ করেছেন।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সরলাবালা দাসী প্রমুখ সাহিত্যিকেরা দু'-একটি করে শিশু-কিশোর পাঠ্য গোয়েন্দাকাহিনি লিখলেও সেগুলি বিক্ষিপ্ত প্রয়াস। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা সাহিত্যে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের আগে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ছোটদের জন্য গোয়েন্দাসাহিত্যের চর্চা কেউ করেননি। ড সুকুমার সেনের মতে, বাংলা ডিটেকটিভ কাহিনিতে তিনি নতুনত্বের আমদানি করেছিলেন মূলত দু'ভাবে

এক, ত্রিশূল ডিটেকটিভের কল্পনা

দুই, গোয়েন্দাগিরিতে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগের ভাবনা

হেমেন্দ্রকুমারের গোয়েন্দাকাহিনিতে গোয়েন্দা আর তার সহকারী ছাড়াও থাকেন একজন পুলিশ কর্মচারী। জয়ন্ত-মানিক-সুন্দরবাবু। এই ত্রিশূল ডিটেকটিভের ভাবনা পরবর্তীকালে বহু অনুসৃত হয়েছে। এমনকি সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা-তোপসে-লালমোহনবাবুও তার ব্যতিক্রম নয়। ত্রিভূজের তৃতীয় কোণ অর্থাৎ সরসতায় ভরপুর পুলিশ ইন্সপেক্টর সুন্দরবাবু একান্তই হেমেন্দ্রকুমারের মৌলিক ভাবনা।

নানান লেখা-স্মৃতিকথায় জানা যায়, হেমেন্দ্রকুমার প্রচুর পড়তেন। বিশেষ করে বিদেশি রহস্য-গোয়েন্দা গল্পে তাঁর বাড়তি আগ্রহ ছিল। সেসব কাহিনির নির্যাস অথবা গোটা গল্পটাই কখনো কখনো তিনি নিজের লেখাতে ব্যবহারও করেছেন। গোয়েন্দাগিরিতে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগের ভাবনাও সম্ভবত তিনি পাশ্চাত্যের লেখা থেকেই পেয়েছিলেন। তবে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে বিজ্ঞানের ব্যবহার যে তাঁর কলমেই প্রথম, সে ব্যাপারে তিনি নিজেই আমাদের জানিয়েছিলেন *জয়ন্তের কীর্তি* উপন্যাসের পরিশিষ্ট অংশে –

"যাঁরা *জয়ন্তের কীর্তি* শেষ পর্যন্ত পড়বেন, তাঁরা যে খালি গল্পের জন্যই পড়বেন, একথা জানি। কিন্তু *জয়ন্তের কীর্তির* মধ্যে গল্প ছাড়াও আর একটি যা লক্ষ্য করবার বিষয় তা হচ্ছে এই; এটি হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অপরাধের কাহিনী এবং বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে নতুন। এর আখ্যানবস্তু কাল্পনিক হলেও কতকগুলি সত্য তথ্য ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপর নির্ভর করেই তা কল্পনা করা হয়েছে। ...এই উপন্যাসের মধ্যে অপরাধীরা যেসব নতুন উপায় অবলম্বন করেছে এবং জয়ন্ত যেসব পদ্ধতিতে অপরাধ আবিষ্কার করেছে, তাও আধুনিক অপরাধ-বিজ্ঞানসম্মত। এদেশে ও-রকম বৈজ্ঞানিক অপরাধী ও বৈজ্ঞানিক ডিটেকটিভ এখনও আত্মপ্রকাশ করেনি বটে, কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকায় তারা যথেষ্ট সুলভ। ...বৈজ্ঞানিক পুলিশের আবির্ভাবে আধুনিক অপরাধ-কাহিনী নতুনতায় বিচিত্র হয়ে উঠেছে, এর কাছে সেকেলে গোয়েন্দা-কাহিনী অনেক সময়ে ছেলেভুলানো গল্প বলেই মনে হয়।"[১৭]

জয়ন্তের কীর্তি সম্ভবত জয়ন্ত-মানিকের প্রথম অভিযান। এই গল্পে জয়ন্তর বয়স একুশ-বাইশের বেশি হবে না। তবে তার লম্বা-চওড়া চেহারার জন্যে বয়সের চাইতে তাকে অনেক বেশি বড় দেখায়। তার মতো দীর্ঘদেহী যুবক বাঙালি জাতটার মধ্যে বড় একটা

দেখা যায় না – তার মাথার উচ্চতা ছয় ফুট চার ইঞ্চি। বুকের ছাতি পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি চওড়া। ছয়-সাত মণ ওজন সে অনায়াসে তুলে ফেলতে পারে। ভিড়ের ভিতরেও সে নিজেকে লুকোতে পারে না। সকলের উপরে জেগে থাকে তার মাথাই। ডন-বৈঠক, কুস্তি, জিমনাস্টিক করে নিজের শরীরটিকে রীতিমত উপযুক্ত করে তুলেছিল সে। ইতিমধ্যেই সে একজন নিপুন মুষ্টিযোদ্ধা বলে বিখ্যাত, আপাতত এক জাপানি মল্লের কাছে যুযুৎসুর কৌশল শিখছে।

জয়ন্তের বন্ধু-সহকারী মানিকলাল তার থেকে বছর দু-একের ছোটই হবে। ব্যায়াম করে তার দেহও যথেষ্ট বলশালী, যদিও তার আকার সাধারণ বাঙালির মতোই, পাঁচজনের মধ্যে চট করে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারে। জয়ন্ত-মানিক দু'জনেই এক কলেজে পড়াশুনো করত। কিন্তু গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের অভিঘাতে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের ইতি ঘটে। তারা দু'জনেই মাতৃ-পিতৃহীন, দু'জনেই কিছু কিছু পৈতৃক সম্পত্তির মালিক, কাজেই জীবনযাপনে স্বাধীন।

ছেলেবেলা থেকেই বিলাতি ডিটেকটিভ গল্প পড়বার ভারি শখ তাদের। এসব গল্প তারা একসাথে বসেই পড়ত এবং গল্প শেষ হলে তাদের ভিতরে উত্তপ্ত আলোচনা চলত। এডগার অ্যালান পো, এমিল গে-বোরিও, আর্থার কোনান ডয়েল, মরিস লেবলাঙ্ক প্রমুখ বিখ্যাত লেখকদের কাহিনি তো বটেই, হাতে সময় থাকলে তারা অখ্যাত লেখকদেরও অবহেলা করত না। কোনান ডয়েলের বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দাপ্রবর শার্লক হোমস তাদের কাছে ছিলেন উপাস্য দেবতা।

জয়ন্তের প্রথম মামলা গল্পে মানিকের বয়ানেই জানা যায়, কলেজে পড়তেই জয়ন্তের কার্যকলাপ কেমন তাক লাগানো ছিল –

"আমি আর জয়ন্ত তখন 'থার্ড-ইয়ারের' ছাত্র। সে যে ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা হবে, জয়ন্ত তখনও একথা জানত না বটে, কিন্তু সেই সময় থেকেই দেশ-বিদেশের অপরাধ-বিজ্ঞান, নামজাদা গোয়েন্দা ও অপরাধীদের কার্যকলাপ নিয়ে দস্তুরমত মস্তিষ্কচালনা শুরু করে দিয়েছে। সময়ে সময়ে অতি তুচ্ছ সূত্র অবলম্বন করে সে এমন সব বৃহৎ তথ্য আবিষ্কার করত যে, আমরা - তার সহপাঠীরা – বিস্ময়ে অবাক না হয়ে পারতুম না।"[১৮]

ক্রমে এই জয়ন্ত-মানিক জুটির পর্যবেক্ষণ শক্তি এতটাই বেড়ে উঠল যে, পাড়ার কয়েকটা ছোটখাটো চুরির আসামীকে তারা পুলিশের আগেই ধরে ফেলে সত্যিই সবাইকে অবাক করে দিত। তারপর একটা শক্ত খুনের 'কেসে' তারা খুবই নামজাদা হয়ে পড়ল। পুলিশ যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল, সেই সময়েই 'কেস'টা হাতে নিয়ে জয়ন্ত হপ্তা খানেকের ভিতরে খুনীকে ধরে পুলিশের কবলে সমর্পণ করেছিল ! ...এইরকম আরও চার-পাঁচটা জটিল চুরি ও খুনের রহস্যভেদ করে জয়ন্ত মানিকলালের নাম এখন সুপরিচিত।

এবারে আসা যাক, ত্রিভুজের তৃতীয় কোণ, অর্থাৎ পুলিশ কর্মচারী সুন্দরবাবুর কথায়। মনে রাখা দরকার, বাংলা রহস্যকাহিনির একেবারে গোড়ার দিকে কিন্তু দারোগাদেরই জয় জয়কার। *সেকালের দারোগা কাহিনী* , *দারোগার দপ্তর* কিংবা *বাঁকাউল্লার দপ্তর* সে কথারই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু, হেমেন্দ্রকুমার তাঁর 'দারোগা'র পরিকল্পনায় বেশ খানিকটা পরিবর্তন আনলেন। বস্তুত, এক নতুন পথের জন্ম দিলেন বলা যেতে পারে। একটি সুরসিক মন তাঁর ছিল। এবং রহস্য-রোমাঞ্চকাহিনির মধ্যে তিনি অত্যন্ত কৌশলে যে নির্মল রসিকতার মিশেল করেছিলেন, তা মূলত ঘনিয়ে উঠেছে পুলিশ কর্মচারী সুন্দরবাবুকে কেন্দ্র করেই, অকর্মণ্য ও ভোঁতা বুদ্ধির সরকারি পুলিশের যে ট্র্যাডিশন পরবর্তী বহু গোয়েন্দা গল্প-লেখকের কলমে ফিরে ফিরে এসেছে। সুন্দরবাবু সুবিপুল ভুঁড়ির মালিক তিনি এবং তার সাথে মানানসইভাবে খাদ্যরসিকও। তাকে চা খাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি টোস্ট, ডিমপোচ, জ্যাম ইত্যাদির কথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেন না। ঘোরতর ভূত-বিশ্বাসী আর মাঝে-মধ্যে অননুকরণীয় ভঙ্গিতে 'হুম্' বলে

ওঠেন। *শনি-মঙ্গলের রহস্য* গল্পে মানিক লঘু পরিহাসের ভঙ্গিতে সুন্দরবাবুর বর্ণনা দিয়েছে –

"বেচারা সুন্দরবাবু ! মাথা জোড়া টাক, ...বামন হাতীর মতো নাদুস নুদুস দেহ, দু-পা দৌড়তে গেলেই হাপরের মতো হাঁপাতে থাকে, বড় জাতের ধামার মতো ভুঁড়ি, তার খোরাক যোগাতে যোগাতেই সারাদিন ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়।"[১৯]

তিনি জয়ন্ত-মানিকের অভিযানে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে সুন্দরবাবু 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতির পক্ষপাতী হয়ে উঠছিলেন। সহসা বিপদের মাঝখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগ্রহ তার হয় না। আসল বিপদের কাছ থেকে নিরাপদ ব্যবধানে থেকে কেবল 'জোর তদন্তের' দ্বারাই তিনি কার্যোদ্ধার করতে চান। *জয়ন্তের কীর্তি, শনি মঙ্গলের রহস্য, মানুষ পিশাচ, পদ্মরাগ বুদ্ধ, জগত শেঠের রত্নকুঠী* ইত্যাদি গল্প-উপন্যাস এই তিনমূর্তির উপস্থিতিতে উজ্জ্বল।

হেমেন্দ্রকুমার তাঁর বেশ কিছু কাহিনিতে চরিত্র বদল করেছেন, একঘেয়েমি এড়াবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত। তাদের মধ্যে হেমন্ত-রবিন-সতীশবাবুর জুটি আবার প্রথম দিকের কয়েকটি উপন্যাসে রয়েছে বিমল-কুমার সঙ্গে দিশি কুকুর বাঘা। তবে তাদের কাহিনি মূলত রোমাঞ্চকর অভিযানের, তাই বর্তমান আলোচনার পরিসরে বিস্তৃতভাবে থাকছে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, *নৃমুন্ড শিকারী* - তে জয়ন্ত-মানিক-সুন্দরবাবু তো বটেই, তাদের সাথে বিমল-কুমার আর বাঘাও হাজির।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা যেমন রহস্য-রোমাঞ্চের ঠাসবুনোটে অনবদ্য। ছোটদের হাসিমুখ দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। হেমেন্দ্রকুমারের গোয়েন্দা কাহিনিতে আছে জয়ন্ত-মানিক-সুন্দরবাবু। সাহসে, শক্তিতে অতুলনীয় জয়ন্ত-মানিক ঘরকুনো অপবাদ ঘুচিয়ে রহস্য উন্মোচনে আনন্দযজ্ঞে সামিল হয়েছে। পরাধীন দেশের সবুজ-তরুণ পাঠকমনকেও

হয়তো তাদের এই দুঃসাহসিকতা, নির্ভীকতা উজ্জীবিত করেছিল। সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভেতরে আবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত বঙ্গসন্তান দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করেছিল। ফলে শখের ডিটেকটিভ জয়ন্ত এবং বন্ধু মানিকলালের নাম-ডাক যত বেড়েছে, পাল্লা দিয়ে বেড়েছে হেমেন্দ্রকুমারের জনপ্রিয়তা। সত্যজিৎ-যুগের আগে কিশোর-সাহিত্যের জগতে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছিলেন তিনি।

ছোটদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমারের স্পষ্ট ধারণা ছিল। গল্প বলতেন চমৎকার। সহজ সরল ভঙ্গি, বলার মধ্যে রয়েছে কথকতার মেজাজ। গোয়েন্দা সাহিত্যে অনেক সময়ই কল্পনার বাড়াবাড়ি থাকে। আগেই বলছিলাম, গোয়েন্দাটি অতিমানব, অসীম ক্ষমতাধারী, যা-খুশি-তাই করতে পারে – এভাবে দেখানোর চেষ্টা থাকে। হেমেন্দ্রকুমারের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। এমন কোন অতিমানব সৃষ্টি করেননি তিনি, তাঁর চরিত্রগুলি বিশ্বাসযোগ্য, রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয়। এসব কারণেই হেমেন্দ্রকুমার সফল। রামধনু – র সম্পাদক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন –

"কী করে রহস্যের পর রহস্যের জট পাকিয়ে গল্পকে এমন করে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায় যে কিশোর-পাঠক এমন কৌতূহলী হয়ে উঠবে যে একবার পড়া শুরু করলে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে শেষ-পৃষ্ঠা পর্যন্ত না গিয়ে থামতে পারবে না – সে কৌশল তাঁর জানা ছিল। এজন্য তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলো আজও পুরোনো হয়নি – প্রথম যুগের পড়ুয়াদের ছেলেমেয়ে এবং পরে তাঁদেরও ছেলেমেয়ে অর্থাৎ তিন পুরুষ ধরে আজও তারা তা পরম আগ্রহে উপভোগ করে চলেছে।"[২০]

তবে তাঁর মানুষ পিশাচ বা প্রেতাত্মার প্রতিশোধ উপন্যাস দু'টিতে তিনি ভৌতিক পরিবেশ, গা-ছমছমে আবহ এবং অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। যা পড়তে পড়তে কিশোর মন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। তাদের সহজ মনে ছড়িয়ে যেতে পারে কুসংস্কারের গভীর শিকড়।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা জয়ন্ত – মানিক কাহিনিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য –

জয়ন্তের প্রথম মামলা, জয়ন্তের কীর্তি, মানুষ পিশাচ, শনি – মঙ্গলের রহস্য, সোনার আনারস, নবযুগের মহাদানব, মরণ খেলার খেলোয়াড়, নৃ-মুণ্ড শিকারী, সাজাহানের ময়ূর, মৃত্যু – মল্লার, ছত্রপতির ছোরা, রত্নপুরের যাত্রী, ফিরোজা মুকুট রহস্য, কাপালিকের কবলে, বজ্রভৈরবের মন্ত্র, প্রভাত রক্তমাখা, হত্যাকারী হত্যাকাহিনী, ভেনাস ছোরার রহস্য, আনুবিসের অভিশাপ, হত্যা এবং তারপর, হত্যা হাহাকারে, জগত শেঠের রত্নকুঠী, পদ্মরাগ বুদ্ধ, নিতান্ত হালকা মামলা, একখানা উল্টে পড়া চেয়ার, আমার গোয়েন্দাগিরি, নেতাজীর ছয়মূর্তি, কাঁচের কফিন, একরত্তি মাটি, একপাটি জুতো, খানিকটা তামার তার, অলৌকিক, বন – সাই রহস্য, কামরার মামলা, ডবল মামলার হামলা, এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে, রিভলভার, পলাতক চায়ের পেয়ালা, ব্রহ্মরাজের পদ্মরাগ ইত্যাদি।

❖

'সত্যান্বেষী' ব্যোমকেশ বক্সীর নাম শোনেনি, এমন বাঙালি বোধহয় খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। বাংলা সাহিত্যের এই বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্রটির স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০)। মাসিক বসুমতী পত্রিকার পাতায় *পথের কাঁটা* গল্পে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ব্যোমকেশের। প্রকাশকাল ৭ই আষাঢ়, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ। যদিও পরবর্তীকালে শরদিন্দুবাবু যখন ব্যোমকেশকে নিয়ে গোয়েন্দাকাহিনির সিরিজ লেখবার কথা ভাবেন, তখন *সত্যান্বেষী* নামক একটি গল্পের অবতারণা করেন, যে গল্পের প্রেক্ষাপট জুড়ে রয়েছে ১৩৩১ সালের কলকাতা তথা বাংলা, যার মাধ্যমে তিনি পাঠককুলের সাথে তো বটেই, পরবর্তীকালে ব্যোমকেশের বন্ধু ও ছায়াসঙ্গী এবং সেইসাথে তার গল্পের কথক অজিতের সঙ্গেও 'অফিসিয়ালি' ব্যোমকেশের পরিচয় করিয়ে দেন। এই গল্পেই ব্যোমকেশ নিজের সম্পর্কে বলে–

"ডিটেকটিভ কথাটা শুনতে ভাল নয়, গোয়েন্দা শব্দটা আরও খারাপ। তাই নিজের খেতাব দিয়েছি – সত্যান্বেষী।"[২১]

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে একবার শরদিন্দু জানিয়েছিলেন – গোয়েন্দাকাহিনিকে তিনি নিছক গোয়েন্দাকাহিনি হিসাবে নয়, বরং 'ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে' রেখে দিতে চান। প্রতিটি কাহিনির মধ্যে তিনি পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যাতে সেগুলিকে একেকটি সামাজিক উপন্যাস হিসাবেও পড়া যাবে, মানুষের সহজ সাধারণ জীবনে কতগুলি সমস্যা অতর্কিতে দেখা দেয়, সেগুলির সমাধানই ব্যোমকেশ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করে অজিত তখন সাহিত্যচর্চায় মগ্ন। মধ্য কলকাতার এক মেসবাড়িতে তার বসবাস। সেখানেই ঘটনাচক্রে ব্যোমকেশের অনুসন্ধানের সঙ্গী হয়ে পড়ে সে। যদিও, প্রথমে ব্যোমকেশ সবার কাছেই নাম-পরিচয় গোপন করে রেখেছিল তদন্তের স্বার্থে। কিন্তু, তার মধ্যে যে অসাধারণত্বটুকু ছিল, তা অজিতের দৃষ্টি এড়ায়নি –

"তাহার বয়স বোধকরি তেইশ-চব্বিশ হইবে, দেখিলে, শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রঙ ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা, - মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে।"[২২]

এই কাহিনির শেষে জানা যায়, হ্যারিসন রোডের একটি বাড়ির তেতলায় চার-পাঁচটি ঘর নিয়ে ব্যোমকেশের বাসা। সঙ্গী ভৃত্য পুঁটিরাম। অনুকূলবাবুর মেস, মানে যেখানে এই গল্পের সূত্রপাত, সেই মেস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এবং ব্যোমকেশের সাথে বন্ধুত্বের সুবাদে অজিতও এই বাড়িতেই পরবর্তীকালে ব্যোমকেশের সঙ্গী হবে।

কে এই ব্যোমকেশ ? জানা যায়, তার বাবা ছিলেন স্কুল মাস্টার। স্কুলে অংক শেখাতেন আর বাড়িতে সাংখ্য দর্শন পড়তেন। মা ছিলেন বৈষ্ণব বংশের মেয়ে, নন্দগোপাল নিয়েই

থাকতেন। ব্যোমকেশের যখন সতেরো বছর বয়েস তখন তার বাবা যক্ষ্মা রোগে মারা যান। পরে মা-ও ওই একই রোগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্য আত্মীয়স্বজন অনাথ কিশোরটিকে দেখেনি, তাই ব্যোমকেশও আর তাদের সাথে যোগাযোগ রাখেনি। ছাত্র হিসাবে সে ছিল মেধাবী, 'জলপানি' পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অতিক্রম করেছে। কলেজে পড়েছে সে বহরমপুরে, অধীত বিষয় কি ছিল তা জানা যায় না, তবে ইতিহাস হতে পারে, কারণ *দুর্গ রহস্য* - তে ঈশানচন্দ্র মজুমদার নামক একজন সম্পর্কে ব্যোমকেশ জানিয়েছে –

"ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। বহরমপুরে আমি কিছুদিন তার ছাত্র ছিলাম।"

ব্যোমকেশ ধূমপান করতে ভালোবাসে। আগে চুরুট খেলেও পরবর্তীকালে সিগারেটই তার প্রিয়। গোড়ার দিকে সে তাস-পাশা খেলতে জানত না, মধ্যবয়সে অজিতের কাছ থেকে দাবা খেলা শিখে এতই পারঙ্গম হয়ে উঠেছিল যে, অজিতকেও সহজেই মাৎ করে দিত। ব্যোমকেশ-কাহিনি নিয়ে তৈরি হাল আমলের প্রায় সব চলচ্চিত্রেই, এমনকি বিশ্ববরেণ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ছবিও তার ব্যতিক্রম নয়, যেখানে তাকে একটি ভারী গোছের চশমা পরাতে দেখা গেছে। যদিও শরদিন্দু লেখাতে কোথাও ব্যোমকেশের চশমার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং সেখানে খুব চিত্তাকর্ষক আরেকটি বস্তু ব্যোমকেশকে ব্যবহার করতে দেখা গেছে, সেটি হল তার ছাতা।

"ছাতাটি ব্যোমকেশের প্রিয় ছাতা; অতিশয় জীর্ণ, লোহার বাঁট, এবং কামানিতে মরচে ধরেছে। কাপড় বিবর্ণ এবং বহুছিদ্রযুক্ত। এই ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তায় বেরুলে নিজে অদৃশ্য থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তির অনুসরণ করা যায়; ফুটো দিয়ে বাইরের লোককে দেখা যায়, কিন্তু বাইরের লোক ছাতাধারীর মুখ দেখতে পায় না। সত্যান্বেষীর উপযুক্ত ছাতা।"[২৩]

ফেরা যাক *পথের কাঁটা* প্রসঙ্গে। এখানে অজিত লিখছে –

"ব্যোমকেশ অদ্ভূত লোক। ...বাহির হইতে তাহাকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া একবারও মনে হয় না যে, তাহার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে। কিন্তু তাহাকে খোঁচা দিয়া, প্রতিবাদ করিয়া, একটু উত্তেজিত করিয়া দিতে পারিলে ভিতরকার মানুষটি কচ্ছপের মত বাহির হইয়া আসে। সে স্বভাবত স্বল্পভাষী, কিন্তু ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করিয়া একবার তাহাকে চটাইয়া দিতে পারিলে তাহার ছুরির মত শানিত ঝকঝকে বুদ্ধি, সংকোচ ও সংযমের পর্দা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহার কথাবার্তা সত্যই শুনিবার মত বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।"[২৪]

ব্যোমকেশ মনে করে, সত্যিকারের খাঁটি খবর পেতে চাইলে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়া উচিত। কারণ কাজের খবর ওইখানেই থাকে। দেশের কোথায় কি হচ্ছে, কে কি ফিকির বের করে দিনে-দুপুরে ডাকাতি করেছে, কে চোরাই মাল পাচার করার নতুন ফন্দি আঁটছে, এইসব দরকারি খবর পাওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন পড়া দরকার। তার মতে, কোন তদন্তের ক্ষেত্রে অনুমানই হলো আসল প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে যা মনে হয়, তাকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো অনুমান ছাড়া আর কিছু থাকে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণকে সে অবিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত অনুমানকে সে মোটেই হেলাফেলা করে না।

পরবর্তী ব্যোমকেশ-কাহিনি *সীমন্ত-হীরায়* স্যর দিগিন্দ্রনারায়ণ ব্যোমকেশের ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে বলেছিলেন –

"তুমি ছেলেমানুষ বটে। কিন্তু তোমার করোটির গঠন থেকে বুঝতে পারছি তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে। ...খুলির মধ্যে অন্তত পঞ্চান্ন আউন্স ব্রেন্-ম্যাটার আছে। তবে ব্রেন-ম্যাটার থাকলেই শুধু হয় না, কনভল্যুশনের উপর সব নির্ভর করে। ...হনু আর চোয়াল উঁচু, মৃদঙ্গ-মুখ, বাঁকা নাক। ত্বরিতকর্মা, কূটবুদ্ধি, একগুঁয়ে। Intuition খুব বেশি; reasoning power মন্দ developed নয় কিন্তু এখনো mature করেনি। তবে মোটের উপর বুদ্ধির বেশ শৃঙ্খলা আছে – বুদ্ধিমান বলা চলে।"[২৫]

এই গল্পটি প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলার, শরদিন্দুবাবু যদিও সমস্ত ব্যোমকেশ-কাহিনিকে তার নিজস্ব সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই *সীমন্ত-হীরা* গল্পে চোরাই জিনিস লুকানোর পদ্ধতিটির সাথে বিখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক এডগার অ্যালান পো'র ডিটেকটিভ

গল্প *The Purloined Letter* - এর চোরাই চিঠি লুকিয়ে রাখার পদ্ধতির যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

নানান কাহিনিসূত্র থেকে জানা যায়, অকারণে বাড়ির বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যোমকেশের একটা মজ্জাগত বিমুখতা ছিল। কাজ না থাকলে সে ঘরের কোনে চুপ করে বসে থাকতে ভালোবাসতো। অথবা সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে শেষ পৃষ্ঠার দক্ষিণ-পূর্ব কোণ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে বাকি সময়টুকু নিজের লাইব্রেরি ঘরে দরজা বন্ধ করে কাটিয়ে দিতে পারত। 'উপসংহার' গল্পে অজিত তো বলেই ফেলেছে –

"চিরদিনই লক্ষ্য করিয়াছি, চিন্তা করিবার একটা বড় রকম খোরাক পাইলে ব্যোমকেশ কেমন যেন নিশ্চল সমাহিত হইয়া যায়। তখন তাহার সহিত কথা কহিতে যাওয়া প্রাণান্তকর হইয়া উঠে, হয় কথা শুনিতে পায় না, নয়তো এমন তেরিয়া হইয়া উঠে যে হাতাহাতি না করিয়া আর উপায়ান্তর থাকে না।"[২৬]

ব্যোমকেশ-অজিতের এই অম্লমধুর সম্পর্ক দেখে খুব সংগত কারণেই পাঠকের মনে আরেক বিশ্ববিখ্যাত জুটির কথা আসতে পারে – শার্লক হোমস এবং ডক্টর ওয়াটসন। এই জুটির বহু গল্পে আমরা দেখেছি শার্লকের আপাত নিষ্ক্রিয় ভাব এবং তা দেখে ওয়াটসনের বিরক্তির উদ্রেক হওয়া। যদিও, এ প্রসঙ্গে 'ব্যোমকেশ - উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে অধ্যাপক সুকুমার সেনের একটি উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য –

"ব্যোমকেশ হোম্‌সের মত উৎকেন্দ্রিক প্রকৃতির নয়, বিজ্ঞানদক্ষ নয়, গুণী বেহালাদার নয়; নেশাখোরও নয়, সে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাঙ্গালী যুবক। শিক্ষিত, মেধাবী, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সংযতবাক্, সহৃদয়। তাঁর চারিত্র্যে মনস্বিতা ও গাম্ভীর্য ছাড়া এমন কিছু নেই যাতে তাঁকে সমান স্তরের সমান বয়সের বাঙালী ছেলের থেকে স্বতন্ত্র মনে করতে হয়। সুতরাং সখের ডিটেকটিভ বাঙালী ছেলে রূপে ব্যোমকেশ বক্সী সম্পূর্ণ সুসংগত ও সার্থক সৃষ্টি।"[২৭]

আদিম রিপু, রক্তের দাগ ইত্যাদি গল্পে জানা যায়, ভারত সরকারের তরফ থেকে কখনও কখনও কোন গোপনীয় কাজে ব্যোমকেশের সাহায্য নেওয়া হয়। বিশেষত, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সাথে তো ব্যোমকেশের খুবই সুসম্পর্ক। স্বাধীনতার পর প্রথম বসন্তের পটভূমিতে রচিত *রক্তের দাগ* গল্পে ব্যোমকেশের স্ত্রী সত্যবতী কাশ্মীরে বেড়াতে যাবার বায়না ধরলে অজিত খোঁজ নিয়ে এসে জানায়, সেখানে লড়াই বেধেছে, সাধারণ লোককে যেতে দিচ্ছে না। যেতে হলে ভারত সরকারের পারমিট চাই। এই কথা শুনে ব্যোমকেশ বলে –

"পারমিট যোগাড় করা শক্ত হবে না। ভারত সরকারের সঙ্গে এখন আমার গভীর প্রণয়, অন্তত যতদিন বল্লভভাই প্যাটেল বেঁচে আছেন।"[২৮]

তবে ব্যোমকেশ-প্রসঙ্গ শেষ করার আগে একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হবে। ব্যোমকেশ, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিখ্যাত গোয়েন্দাদের মতো 'অতিমানবিক' নয়, বরং সে আর দশটা রক্তমাংসের মানুষের মতো, একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে, সেজেগুজে, সিল্কের পাঞ্জাবি পরে, এসেন্স মাখানো রুমাল নিয়ে তার সাথে দেখাও করতে যায়, তার বিবাহিত জীবনে যেমন দাম্পত্য কলহ আছে, অজিতের সাথে খুনসুটি আছে, তেমনই আছে সুখ-শান্তি-বন্ধুত্বে ঘেরা সহজ সাংসারিক যাপন। ব্যোমকেশের বেশিরভাগ গল্প পড়লে পাঠক সেই গল্পের প্রেক্ষাপট, তার সমাজ-অর্থনীতি, তার চরিত্র, তাতে ঘটে যাওয়া অপরাধের প্রবণতার সাথে নিজেকে একাত্ম করতে পারে। নিজের চারপাশকে মেলাতে পারে। আর তাই ব্যোমকেশ তখন আর শুধুমাত্র একজন গল্পের বইয়ের গোয়েন্দা থাকে না। হয়ে ওঠে তাদেরই অন্তরের কাঙ্ক্ষিত 'সত্যান্বেষী'। শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের এই সৃষ্টি সম্ভবত এই কারণেই একইসাথে সমকালীন এবং কালোত্তীর্ণ।

গ্রন্থকারের ডায়রি থেকে পাওয়া রচনা – সমাপ্তিকাল অনুসারে ব্যোমকেশ গল্প – কাহিনির তালিকাটি এরকম –

পথের কাঁটা (৭ই আষাঢ়, ১৩৩৯), *সীমন্ত – হীরা* (৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯), *সত্যান্বেষী* (২৪শে মাঘ, ১৩৩৯), *মাকড়সার রস* (১৫ই বৈশাখ, ১৩৪০), *অর্থমনর্থম্* (৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০), *চোরাবালি* (১২ই শ্রাবণ, ১৩৪১), *অগ্নিবাণ* (৫ই বৈশাখ, ১৩৪২), *উপসংহার* (১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২), *রক্তমুখী নীলা* (২৪শে ভাদ্র, ১৩৪৩), *ব্যোমকেশ ও বরদা* (১৩ই কার্তিক, ১৩৪৩), *চিত্রচোর* (৮ই পৌষ, ১৩৫৮), *দুর্গরহস্য* (২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯), *চিড়িয়াখানা* (২০শে জুলাই, ১৯৫৩), *আদিম রিপু* (৮ই জানুয়ারি, ১৯৫৫), *বহ্নি – পতঙ্গ* (১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬), *রক্তের দাগ* (২৪শে আষাঢ়, ১৩৬৩), *মণিমন্ডন* (১৮ই মাঘ, ১৩৬৫), *অমৃতের মৃত্যু* (৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬), *শৈলরহস্য* (২০শে আষাঢ়, ১৩৬৬), *অচিন পাখি* (১৩ই বৈশাখ, ১৩৬৭), *কহেন কবি কালিদাস* (বৈশাখ, ১৩৬৮), *অদৃশ্য ত্রিকোণ* (১লা ভাদ্র, ১৩৬৮), *খুঁজি খুঁজি নারি* (২১শে ভাদ্র, ১৩৬৮), *অদ্বিতীয়* (২রা ফাল্গুন, ১৩৬৮), *মগ্নমৈনাক* (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩), *দুষ্টচক্র* (১লা জুলাই, ১৯৬৩), *হেঁয়ালির ছন্দ* (২৩শে জানুয়ারি, ১৯৬৪), *রুম নম্বর দুই* (১৩ই জুলাই, ১৯৬৪), *ছলনার ছন্দ* (১৬ই নভেম্বর, ১৯৬৫), *শজারুর কাঁটা* (১৫ই মার্চ, ১৯৬৭), *বেণীসংহার* (১৫ই মে, ১৯৬৮), *লোহার বিস্কুট* (৫ই মে, ১৯৬৯), *বিশুপাল বধ* (অসম্পূর্ণ; জুলাই, ১৯৭০)।

❖

জন্মসূত্রে বিদেশি অথচ দীর্ঘদিন বাংলার জল-হাওয়ায় থাকার এবং কাজ করার সুবাদে মনে প্রাণে-বাঙালি-বনে-যাওয়া এমন গোয়েন্দা বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের সম্ভারে প্রায় নেই-ই, ব্যতিক্রম অবশ্যই শিশুসাহিত্যিক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের (১৯০৩ - ১৯৩৯) গোয়েন্দাপ্রবর হুকা-কাশি।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের পিতৃদেব বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন মাসিক কিশোর-পাঠ্য পত্রিকা *রামধনু* - র প্রতিষ্ঠাতা। ১৩৩৪-এর মাঘে, ইংরেজির ১৯২৮ সাল থেকে তাঁরই সম্পাদনায়

রামধনু পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। *হুকা-কাশি সমগ্র* - র ভূমিকায় পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন –

"'সন্দেশ' যেমন পারিবারিক পত্রিকা, মূলত পরিবারের সাহিত্যসেবীদের দিকে তাকিয়ে প্রকাশ, 'রামধনু'ও অনেকাংশে তেমন। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন সাহিত্যপ্রাণ মানুষ। ছোটদের জন্যও তিনি লিখেছেন কিছু। কন্যারা অল্পস্বল্প লিখতেন। তিন পুত্রের মধ্যম ও কনিষ্ঠজন সাহিত্য-রচনায় উৎসাহী ছিলেন প্রবলভাবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র অধ্যাপনা করতেন, মধ্যম পুত্র তখন সবে এই বৃত্তিতে যোগ দিয়েছেন। কনিষ্ঠ পুত্র পড়তেন কলেজে। তাঁদের লেখকসত্তায় জলসিঞ্চনই শুধু নয়, সামগ্রিকভাবে ছোটদের সাহিত্যরই সমৃদ্ধি ঘটাতে চেয়েছিলেন বিশ্বেশ্বর। ...দুই পুত্রকে সাহিত্য রচনায় প্রাণিত করতে চেয়েছিলেন সত্য, পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের নব্য পাঠকদের কাছেও 'রামধনু' নিয়ে পৌঁছতে চেয়েছিলেন বিশ্বেশ্বর। ছোটদের মধ্যে জাগাতে চেয়েছিলেন শুভবোধ, দিতে চেয়েছিলেন নৈতিক শিক্ষা। প্রথম সংখ্যার মুখবন্ধে লিখেছিলেন, 'আকাশে রামধনু দেখায় সূর্যের কিরণ, আমাদের 'রামধনু' দেখাইবে জ্ঞানের কিরণ। জ্ঞান রামধনুর মতোই বিচিত্র, রামধনুর মতনই মনোরম।'"[২৯]

কাজেই, ভট্টাচার্য পরিবারে সাহিত্যচর্চার আবহ ছিল গোড়া থেকেই। *রামধনু* প্রকাশের বহু আগে থেকেই লেখালেখি করছেন মনোরঞ্জন। *রামধনু* পত্রিকার প্রয়োজনেই তাঁর কিশোর-গোয়েন্দা কাহিনি লেখার অবতারণা। এবং ১৯২৮ – এ *পদ্মরাগ* উপন্যাসের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় হুকা-কাশির আগমন। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের আরেক দিকপাল লেখক সত্যজিৎ রায়ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের হুকা-কাশি-কাহিনির গুণমুগ্ধ ছিলেন। নিজের স্মৃতিকথা *যখন ছোট ছিলাম* – এ তিনি লিখেছিলেন –

"আরেকটা ছোটদের বাংলা মাসিক পত্রিকা তখন বেরোত যেটা বেশ ভালো লাগত, সেটা হল রামধনু। রামধনুর আপিস ছিল বকুলবাগান রোড আর শ্যামানন্দ রোডের মোড়ে, আমাদের বাড়ি থেকে দুশো গজ দূরে। এই কাগজের সম্পাদক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ করে ভীষণ খুশি হয়েছিলাম, কারণ ওঁর লেখা জাপানী গোয়েন্দা হুকা-কাশির 'পদ্মরাগ' আর 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি' আমার দারুণ ভালো লেগেছিল।"[৩০]

শুধুমাত্র সত্যজিৎ-ই নন, মনোরঞ্জনের হুকা-কাশির ভক্ত ছিলেন শরদিন্দু, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো সাহিত্যিকেরাও। বিভিন্ন স্মৃতিকথায়, দিনলিপিতে এ কথার প্রমাণ মেলে।

কিন্তু হুকা-কাশির এমন বিচিত্র নামকরণের ইতিহাসটির খবর পাওয়া যায় *হুকা-কাশি সমগ্র* - র 'লেখক পরিচিতি' অংশে। সেখানে জানা যায়, 'আমাদের মনোরঞ্জন' নিবন্ধে ননীগোপাল মজুমদার এ বিষয়ে এক অনবদ্য ঘটনার উল্লেখ করেছেন –

"'একদিনের কথা মনে পড়ে। রামধনু অফিসে গিয়ে দেখি মনোরঞ্জনবাবু মৃদু মৃদু হাসছেন।
আমি বললাম, ব্যাপার কী ?
মনোরঞ্জনবাবু বললেন, তুমি আমাকে কনগ্রাচুলেট করতে পারো।
আমি বললাম, কারণ ?
কারণ আমি এমন একটি চরিত্রের কল্পনা করেছি, যাতে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন জিনিসের আবির্ভাব হবে।
যথা ?
হুকা-কাশি।
বলে তাঁর প্রচন্ড হাসি।
আমি তো অবাক। ঐ অদ্ভূত নামটির অর্থ কী ?
হাসতে হাসতে বললেন, 'হুকা খেলে কী হয় ? কাশি তো ? এ দুইয়ে মিলিয়ে হল আমার ডিটেকটিভ উপন্যাসের নায়কের নাম। অবশ্য ঐ অদ্ভূত নামটির জন্য ভদ্রলোককে জাপানি বানাতে হল। ..."'[৩১]

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন –

"'পদ্মরাগ-এর পর 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি' ও 'সোনার হরিণ'-এ ও হুকাকাশির উপস্থিতি। সদর্প পদচারণা। পড়তে পড়তে আমরা মুগ্ধ হই তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। গোলা নেই, গুলি নেই, নেই বন্দুকের গুড়ুম-গুড়ুম, অথচ কী অনায়াস ভঙ্গিতেই না হুকাকাশি রহস্যজাল বারবার ছিঁড়ে ফেলেছে। মূল অপরাধী বা আসামীকে সনাক্ত করেছে। এই সনাক্তকরণে কোথাও অতিনাটকীয়তা নেই। বিশ্বাসযোগ্যতার স্বাভাবিক পরিবেশ বারবার রচিত হয়েছে মনোরঞ্জনের দক্ষ কলমে। রহস্য উদঘাটনের সূত্র হিসাবে প্রায়শই তুচ্ছ

কোনো বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন মনোরঞ্জন। আপাতভাবে যা তুচ্ছাতিতুচ্ছ, সেখানেই আশ্চর্য কৌশলে জারিত হয়েছে রহস্য। জাপানি গোয়েন্দার বাঙালি সহকারী রণজিৎ রহস্য ভেদের কাজে বরাবরই হুকাকাশির ভাবশিষ্য। দুজনের সেই মিলিত বুদ্ধির জোরেই যাবতীয় রহস্যের দরজা-জানলা খুলে গেছে। আবার রহস্য-জট ছাড়াতে গিয়ে মাঝেমধ্যে বিপদেও পড়তে হয়েছে তাকে। উপন্যাসের দীর্ঘ পরিসরে রহস্য ঘনীভূত করার বাড়তি সুযোগ মেলে। গল্পের ছোট পরিসরে তা কম মনে হতে পারে। এমন ধারণা যে কতখানি ভুল, তা হুকাকাশিকে নিয়ে লেখা গল্পগুলি পড়লেই বোঝা যায়। 'শান্তিধামে অশান্তি', 'হীরক রহস্য', 'চন্ডেশ্বরপুরের রহস্য', 'তেরো নম্বর বাড়ির রহস্য' – উল্লিখিত এইসব গল্পের পরিসর সংক্ষিপ্ত হলেও রহস্যে কখনো ঘাটতি পড়েনি। রহস্য যথারীতি জমাট বেঁধেছে, রহস্যের ঠাসবুনোটে প্রতিটি গল্পই জমজমাট। দুঃখের বিষয়, ব্যোমকেশের মধ্যে যার ছায়া পাওয়া যায়, সেই হুকাকাশি আজ বিস্মৃতির অতলে।"[৩২]

হুকা-কাশি বাঙালি নন, নাম শুনেই তা মালুম হয়। তিনি জন্মসূত্রে জাপানি। তাঁর চেহারা যে ঠিক কীরকম, তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও জাপানিদের মতো তথাকথিত 'খাসা চ্যাপ্টা নাকটা, থ্যাবড়া মুখখানা আর মিটমিট চোখ দুটো' তাঁর যে ছিল না এ কথা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, কারণ ছদ্মবেশ ধারণে তিনি অত্যন্ত পটু। তখন তাঁকে চিনতে পারে, সাধ্য কার। বস্তুত, প্রথম উপন্যাসেই লেখক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হুকা-কাশিকে পাঠকমহলে হাজির করেন ছদ্মবেশের আড়ালেই। এই কারণেই মনে হয়, হুকা-কাশির চেহারা খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল না, তাই এতবার এতরকম ছদ্মবেশ নিয়ে নিজেকে সহজেই আড়াল করে ফেলতে পারতেন।

হুকা-কাশি কলকাতার ডাফ স্ট্রিট নিবাসী একজন মানুষ যিনি পেশিবহুল বা রিভলভারধারী গোয়েন্দা নন, বরং মগজের ওপর ভরসা রাখতে পছন্দ করেন। তবে প্রয়োজনে জাপানি জুজুৎসুর মোক্ষম প্যাঁচেও তিনি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে সক্ষম। *সোনার হরিণ* উপন্যাসে মনোরঞ্জন এক মক্কেলের বয়ানে হুকা-কাশি-চরিত পাঠকের সামনে হাজির করেছেন –

“ আপনার কাজের ধারা কী রকম তা আগেই শুনেছিলাম, এখনও কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করলাম – লাঠির সাহায্য নেই, মাংসপেশির অনাবশ্যক চালনা নেই, কথায় কথায় পিস্তল ছোড়া আর রক্তারক্তি কান্ড নেই – শুধু যুক্তিতর্কের সাহায্য আর মস্তিষ্কের ব্যবহার। বাস্তবিক এ একটা শিক্ষার, একটা অনুপ্রেরণার বিষয়। আমি জোর করে বলতে পারি, আমেরিকা হলে সেখানকার উৎসাহী যুবকদের ভেতর আপনার জীবনচরিতকার হবার জন্য দস্তুরমতো রেষারেষি পড়ে যেত। প্রত্যেকটি অ্যাডভেঞ্চারেআপনার নিত্যকার সঙ্গী হয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত ঘটনা পরপর তারা লিখে রাখত, তারপর অ্যাডভেঞ্চার শেষ হয়ে গেলে বই-এর আকারে তা প্রকাশ করে সমস্ত জগতের সঙ্গে আপনার প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তবে তারা ক্ষান্ত হত !”[৩৩]

হুকা-কাশি জাপানি হলেও বাংলা বলতে, পড়তে তো বটেই এমনকি সাবলীলভাবে লিখতে পর্যন্ত পারেন। ধুতি-পাঞ্জাবির মতো পোষাকে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দবোধ করেন। পুজোর সময়ে বা অন্য ছুটিতে বেড়াতেও যান বাঙালিদের মতো। তবু হুকা-কাশি বাঙালি নন, জাপানি। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কেন তিনি ‘জাপানি’, অন্য কোনো দেশের নয় ? এর পিছনে কী স্রষ্টার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল ?

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় লেখা গোয়েন্দা গল্পে বিদেশি গোয়েন্দা চরিত্র এই প্রথম নয়। এর আগে দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখেছিলেন ইংরেজ গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেক-কে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কাহিনি। রবার্ট ব্লেক হলেন খোদ লন্ডনের বাসিন্দা। তার জন্ম-কর্ম সবই লন্ডন এবং তার আশেপাশের পিকাডিলি স্কোয়ার, ক্রয়ডন বা সোহো-র মতো জায়গায়। ব্রিটিশ কান্ট্রি-সাইড, কুয়াশা ঢাকা আবহ, টেমস নদীর প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে দীনেন্দ্রকুমারের ব্লেক-কাহিনিগুলিতে। কিন্তু মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের গোয়েন্দা হুকা-কাশি তো আর জাপানে গোয়েন্দাগিরি করেন না। তাহলে প্রশ্ন, তিনি ‘জাপানি’-ই হতে গেলেন কেন ?

এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক ও চিন্তক প্রসেনজিৎ বসুর মতামতটি উল্লেখযোগ্য –

“হয়তো তাঁর গল্পের প্রোটাগনিস্টকে একটু বিশেষভাবে উপস্থিত করতেই তাঁকে বিদেশি করতে চেয়েছিলেন লেখক। আর পরাধীন ভারতবর্ষে, উনিশশো বিশের দশকে, সারা দেশ যখন গান্ধিজীর প্রচার করা জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আছে, তখন মনোরঞ্জনের মতো যুবক যে তাঁর কাহিনির প্রধান চরিত্রকে ইংরেজ করবেন না, সে-কথা অনুমান করে নেওয়া এমন কিছু কষ্টসাধ্য নয়। ...মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের গল্পের গোয়েন্দা ইংরেজ না হয়ে জাপানি হওয়ার একমাত্র না হলেও, এটাই হয়তো প্রধান কারণ। তৎকালের কলকাতায় উন্নত দেশের নাগরিকদের মধ্যে ইংরেজ ছাড়া জাপানিদের দেখা পাওয়া যতটা সহজ ছিল, জার্মান বা ফরাসী ততটা ছিল না। আর আমেরিকান তো সে-যুগের সাধারণ বাঙালি বা ভারতীয়ের কাছে ইংরেজরই সমান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ১৮৬৮ থেকে ১৮৭০-এ জাপানে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটতে শুরু করে। পশ্চিমী চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে জাপানের শাসকবৃন্দ আমেরিকান এবং ইয়োরোপীয় শিল্প-চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদি জাপানে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। ১৯০২ সালে ইঙ্গ-জাপানি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তারই কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষ নেয় জাপান। যুদ্ধ-পরবর্তী ভার্সাই কনফারেন্সে (১৯১৯) জাপান উপস্থিত থাকে তৎকালীন বিশ্বের পাঁচ বৃহৎ-শক্তি বা বিগ ফাইভের অন্যতম হিসেবে। ১৯২৩ সালে ইঙ্গ-জাপান চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। কিন্তু ততদিনে জাপানের সামরিক শক্তি, শিল্প, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি অন্য যে-কোনও দেশের ঈর্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

এহেন পরিস্থিতিতে লেখকের মনে হতেই পারে যে গল্পের নায়ক ডিটেকটিভকে যদি বিদেশিই করতে হয়, তাহলে তিনি হবেন জাপানি। হয়তো বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চের তৎকালীন অবস্থাও মিস্টার হুকা-কাশির সৃষ্টির আর-এক কারণ।”[৩৪]

হুকা-কাশি বিশ্বাস করেন, কোনও একটা দুষ্কার্যে কে অপরাধী তা বার করতে হলে লোকের বাড়ি গিয়ে আড়িপাতার মোটেই দরকার হয় না। এও একটা বিজ্ঞান – অনেকটা যেন অঙ্ক কষারই মতো। অঙ্ক যেমন ঠিকমতো ধাপে ধাপে কষে গেলে ফল শেষ পর্যন্ত মিলবেই, তেমনই যুক্তিতর্কের সাহায্যে ঠিকমতো ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে পারলে যা জানা আবশ্যক নিশ্চয়ই তা জানতে পারা যায়।

হুকা-কাশিকে নিয়ে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের লেখা গল্পগুলি হল -

পদ্মরাগ (প্রকাশিত হয় *রামধনু* পত্রিকায় মাঘ, ১৩৩৬ থেকে ১৭টি কিস্তিতে), *হীরক রহস্য, তেরো নম্বর বাড়ির রহস্য, ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি* (প্রকাশিত হয় *রামধনু* পত্রিকায় আশ্বিন, ১৩৩৭ থেকে ১১টি কিস্তিতে আশ্বিন, ১৩৩৮ পর্যন্ত), *শান্তিধামের অশান্তি, সংসক্তপুরের রহস্য* (প্রকাশিত হয় সুনির্মল বসু সম্পাদিত *আরতি* পত্রিকায় ১৯৩৮ সালে), *চণ্ডেশ্বরপুরের রহস্য, সোনার হরিণ* (প্রকাশিত হয় *রামধনু* পত্রিকায় মাঘ, ১৩৪১ থেকে ২৬টি কিস্তিতে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪ পর্যন্ত)।

❖

হুকা-কাশির কথা যখন উঠল, তখন তো কল্কেকাশি আর না এসে পারেন না। শিবরাম চক্রবর্তীর (১৩ই ডিসেম্বর, ১৯০৩ – ২৮শে আগস্ট, ১৯৮০) কাল্পনিক গোয়েন্দা কল্কেকাশি হলেন বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় এবং আপাতত শেষ গোয়েন্দা চরিত্র, যিনি বাঙালি নন। বলাই বাহুল্য, এ ব্যাপারে কল্কেকাশির পূর্বসূরী হলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের গল্প ও উপন্যাসের নামজাদা জাপানি গোয়েন্দা হুকা-কাশি। কল্কেকাশির গল্পের শুরুতেই শিবরাম জানিয়ে দিয়েছেন, কল্কেকাশি হলেন বিখ্যাত জাপানি গোয়েন্দা হুকা-কাশির ভাইরাভাই। তপ্ত কল্কের মতো গনগনে আর কাশির খনখনে তাঁর দাপট। নামডাকেও তিনি ভায়রার থেকে কিছু কম যান না।

বর্তমান নিবাস কলকাতার কাছাকাছি ডায়মন্ড হারবার রোডে হলেও কল্কেকাশি কিন্তু বাঙালি নন, কোরিয়ার অধিবাসী। যদিও তিনি বাংলা, ইংরাজি তো বটেই, কামস্কাটকার ভাষা এমনকি কোনো কোনো জীবজন্তুর ভাষাও বলতে বা বুঝতে পারেন। তিনি একাধারে আর্মচেয়ার ডিটেকটিভ, কারণ বহু খুনের কিনারা করেছেন খুনির কিনারায় না গিয়েও। আবার তিনি হার্ড-বয়েলড্ বা পোড় খাওয়া গোয়েন্দাও, কারণ কত ডাকাতকে তিনি কাত

করেছেন, চোরকে ছেঁচড়ে এনেছেন দেখতে না দেখতে, রাহাজানির সুরাহা করেছেন জানাজানি হওয়ার আগেই। কল্কেকাশির বাঁ পকেটে থাকে রিভলবার, ডান পকেটে হাতকড়া।

"বদলোক তিনি এক পলক তাকালেই টের পান। তাঁর চোখের সামনে সব পরিষ্কার। সমস্ত রহস্য, সবকিছুর হদিস, সরকারি পুলিশে যেসব তথ্যের ঠাঁই পায় না, থ হয়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত তাদের তাঁর কাছেই ছুটতে হয়। তিনি শখের গোয়েন্দা হলেও সখ্যের খাতিরে, জলের মতো তাদের সব সমস্যা সমাধান করে দেন।"[৩৫]

কল্কেকাশি সম্পর্কে এরকমই লিখছেন শিবরাম, *টিকটিকির ল্যাজের দিক* গল্পে।

শিবরাম চক্রবর্তী মাত্র কয়েকটি গল্প লিখেছেন গোয়েন্দা কল্কেকাশিকে নিয়ে। প্রথম কাহিনী *টিকটিকির ল্যাজের দিক, মৌচাক* পত্রিকায় (পৌষ ১৩৫৬) প্রকাশিত হয়। এছাড়া অন্যান্য গল্পগুলি হল *কল্কেকাশির কাণ্ড, কল্কেকাশির অবাক কাণ্ড, ইতরবিশেষ, সূত্র* । *কল্কেকাশির অবাক কান্ড* - তে শিবরামের অন্য দুই বিখ্যাত চরিত্র হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধনও এসেছেন। আরো একটি গল্পে কল্কেকাশিকে খুব সামান্যই পাওয়া যায়, তার নাম *রহস্যময় হর্ষবর্ধন* ।

কল্কেকাশি বিবাহিত মানুষ। বিবাহিত তো তিনি হবেনই, নাহলে হুকাকাশির ভায়রাভাই হবেন কী করে ? সেই হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে, জাপানি গোয়েন্দা হুকা-কাশিও বিবাহিত ছিলেন। কল্কেকাশি অন্তত দু'জন সন্তানের পিতা, কারণ *টিকটিকির ল্যাজের দিক* গল্পে তাঁর ছোটছেলের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিজের একখানা মোটর গাড়িও ছিল এই নামজাদা গোয়েন্দার। তিনি নিজেই সেই গাড়ি চালাতেন।

গোয়েন্দাদের সাধারণত বিচিত্র বিষয়ে দখল থাকে। কঙ্কেকাশির যেমন ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানে। *কঙ্কেকাশির অবাক কান্ড* গল্পে দেখা যায়, হ্যালির ধূমকেতুর পৃথিবীর পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময়টি একেবারে নির্ভূলভাবে নির্ণয় করতে পেরেছিলেন তিনি এবং তার ফলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকেও নিজেকে রক্ষা করে হর্ষবর্ধন-গোবর্ধনকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

বিশিষ্ঠ অধ্যাপক ও চিন্তক পল্লব সেনগুপ্ত একটি প্রবন্ধে লিখছেন –

"শিবরাম চক্রবর্তী ডিটেকটিভ গল্পের লেখক হিসেবে কখনওই বিশেষ সিরিয়াস ছিলেন না, এ কথা যতটা ঠিক – ততটাই আবার এই কথাটাও ঠিক যে, সামান্য যে-ক'টি গোয়েন্দা-গল্প তিনি লিখে গেছেন, তাদের মধ্যে একটা নতুন ধরনের আস্বাদও সৃষ্টি করেছিলেন তিনি, যা প্রতিষ্ঠিত ডিটেকটিভ কাহিনিকারদের লেখায় ঠিক সেভাবে মেলেনা। স্যাটায়ার, পান্ এবং হিউমারের মিশেলে তাঁর গোয়েন্দা গল্পগুলি এমনই একটা মাত্রায় পৌঁছয়, একান্তভাবেই শিবরামের যা নিজস্ব এলাকা।

...শিবরামের ডিটেকটিভ কাহিনির নিজস্বতাই হল, মূল ঘটনার সঙ্গে – তা সে ছোটবড় যে-রহস্যই হোক না কেন, হিউমারের সঙ্গে স্যাটায়ারের (পান্-সমেত) ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা। মায়, খুন-আত্মহত্যা-জাতীয় অতি-সিরিয়াস বিষয়-বিজড়িত-থাকা কাহিনির ক্ষেত্রেও এই বিশেষ টেক্‌নিক বা স্টাইলটাকেই দেখতে পাই আমরা। ...দেশে এবং বিদেশে শিবরামের এই গোয়েন্দাটি একান্তই অভূতপূর্ব। অনন্য।"[৩৬]

তাঁর গোয়েন্দা-কাহিনি লেখার সূত্রপাত কীভাবে, সে বিষয়ে *নারী রহস্যময়ী* উপন্যাসে স্বয়ং শিবরাম স্মৃতিচারণ করেছেন -

"রহস্য কাহিনী কখনো আমি লিখিনি, লিখতে পারিনে – আমার তাবৎ লেখাই হাস্যকর (হয়ত এটিও শেষ পর্যন্ত তাই হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিছুই বলা যায় না -)" তা সত্ত্বেও কেন যে এই রোমাঞ্চকর পথে অকস্মাৎ আমার পদার্পণ তার একটা কারণ আছে অবশ্যই। ...কফি হাউসে...একটি অচেনা মেয়ে আমার সামনের কৌচে এসে বসল। ...বলল সে... 'আপনার মত ডিটেকটিভ বই আর কেউ লিখতে পারে না – বাড়ি ফিরে বলব যে কফি হাউসে কার সঙ্গে আজ এক টেবিলে বসে খেয়েছি জানিস ? ...শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় !' ..."[৩৭]

শিবরামের কথায়, এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে, তাঁর কল্প-প্রতিবেশী হর্ষবর্ধনের কাছে তাঁকে প্রচুর ঠাট্টা-তামাশার সম্মুখীন হতে হয়। তারই প্রতিক্রিয়াতে সম্ভবত সাত তাড়াতাড়ি তাঁর এই 'রহস্যময়' ক্ষেত্রে আগমন !

তাহলে প্রশ্ন হল, কল্কেকাশির গল্পগুলি আসলে কোন জাতের গল্প ? গোয়েন্দাকাহিনি না হাস্যরসাত্মক ? উত্তর সম্ভবত – দু'টোই এবং সেইসাথে আরও অনেককিছু। কারণ সেগুলির মনোযোগী পাঠমাত্রেই অনুভব করা যায় যে তাদের প্রতিটির মধ্যেই নিহিত আছে এক অতলস্পর্শী জীবনদর্শন। যেমন, 'কল্কেকাশির কান্ড' গল্পে সমাজ-রাজনীতির ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাখা ফানুসটি সহাস্য শিব্রামীয় খোঁচায় চুপ্‌সে যায়, তেমনই আবার *টিকটিকির ল্যাজের দিক* গল্পটি স্বয়ং গোয়েন্দারই বুঝ-ভোম্বল বনে যাবার বিবরণ ! এ ধরণের গল্প – খোদ ডিটেকটিভেরই নিজ-বুদ্ধি-দোষে বোকা বনে যাওয়া – এ দেশে তো বটেই, বিদেশি সাহিত্যেও বিরলপ্রাপ্য। এ নিছকই শিব্রামীয় 'হিউ-স্যাটায়ার'।

অবশ্য, শিবরাম নিজেই তাঁর *কল্কেকাশির অবাক কান্ড* গল্পে 'তথাকথিত' সাহিত্যিক গোয়েন্দাদের একহাত নিয়েছেন, হর্ষবর্ধনের বয়ানে -

"তোর ওইসব বইটই এক-আধটু আমিও যে পড়িনি তা নয়। তবে পড়ে-টড়ে যা টের পেয়েছি তার মোদ্দা কথাটা এই যে, গোয়েন্দাদের মৃত্যু হয় না। তারা আত্মার মতোই অজর অমর অবিনশ্বর অকাট্য অবিদ্ধ ... তরোয়ালে কেটে ফেলা যায় না, গুলি দিয়ে বিদ্ধ করা যায় না, জলে সিদ্ধ করা যায় না – মারবেন কী ! কানের পাশ দিয়ে চলে যাবে যত গুলিগোলা। এই পরিচ্ছেদে দেখলেন আপনি যে হতভাগা খতম হল, আবার পরের পরিচ্ছেদেই দেখুন ফের বেঁচে উঠেছে আবার। অকাট্য অবিদ্ধ অখাদ্য।"[৩৮]

যে কাহিনিগুলিকে ঘিরে কল্কেকাশির গোয়েন্দাগিরি আবর্তিত হয়েছে সেগুলি হল -

কল্কেকাশির কাণ্ড, টিকিটিকির ল্যাজের দিক (প্রথম প্রকাশ মৌচাক পত্রিকার পৌষ, ১৩৫৬ সংখ্যায়), ইতরবিশেষ, সূত্র, কল্কেকাশির অবাক কাণ্ড।

❖

পরিমল গোস্বামীর (১৮৯৭-১৯৭৬) জনপ্রিয় গোয়েন্দার নাম হরতন হাজরা। অবশ্য এটা ঠিক তার নাম নয়, ছদ্মনাম। তার আসল নাম হল রতন হাজরা। নাম পরিবর্তনের কারণ একটাই। সে জানে রতন নামের গোয়েন্দাকে কেউ কোনদিন দাম দেবে না। গোয়েন্দাগিরিতে হরতনের প্রধান পরামর্শদাতা হলেন ব্রজবিলাস সরকার। হরতন এবং তার সহকারীরা তাঁকেই গুরু বলে মানে। তার কার্যকলাপের পেছনে ব্রজবিলাস সরকারেরই বুদ্ধির কলকাঠি বেশি নড়ে। হরতনের একজন সহকারী আছে, নাম রুহিতন রায়। সে আসলে হরতনের নির্দেশে হিতেন থেকে ঐ একই কারণে রুহিতন নামধারী হয়েছে।

এই একই নিয়ম হরতনের স্ত্রী কুসুমিতার ক্ষেত্রেও। আসলে কিন্তু সে সুমিতা। যদিও বাঙালি গোয়েন্দারা খুব একটা বিয়ে-থা সংসার করে না, কিন্তু হরতন তার গুরু ব্রজবিলাস সরকারের বিশেষ অনুমতিক্রমে কুসুমিতাকে বিয়ে করেছে। কারণ কুসুমিতা তার মক্কেলের মেয়ে যে তাদের তদন্তের সময় বেশ ভালো পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। পাঠক জানেন, পরিমল গোস্বামী তাঁর রসরচনা ও ব্যঙ্গাত্মক রচনার জন্য সমধিক খ্যাত। দীর্ঘদিন তিনি ‘এক-কলমী’ ছদ্মনামে *যুগান্তর* পত্রিকায় সরস ও রসাত্মক রচনা লিখতেন। হরতন-রুহিতন-কুসুমিতার ডিটেকটিভ ফার্মের কান্ড কারখানা নিয়ে রচিত এই গোয়েন্দাগল্পগুলিও তাঁর সেই রসিকতায় সিক্ত।

হরতনের তার ব্যাগে সবসময় অনুবীক্ষণ যন্ত্র, নানান ধরণের ম্যাগনিফাইং গ্লাস, বিস্তর রাসায়নিক দ্রব্য, ক্যামেরা, এনলার্জার, ডেভেলপিং ডিশসহ ছবি তোলার নানান সামগ্রী, ছদ্মবেশ নেওয়ার সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি জিনিসপত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, হরতন নিজেই ছবি তোলে, ডেভেলপ করে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক জানেন, লেখক

পরিমল গোস্বামী নিজেও ছিলেন একজন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার। তাহলে কী হরতন হাজরার মধ্যে কোথাও নিজেকেই আঁকতে চেয়েছিলেন তিনি ?

হরতন হাজরাকে নিয়ে লেখা কাহিনিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য – *বেনামী চিঠি, হীরের আংটি* ইত্যাদি।

❖

পরাশর বর্মা একাধারে কবি ও গোয়েন্দা। তার স্রষ্টা বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র (৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ - ৩ মে ১৯৮৮)।

পরাশরের প্রসঙ্গে আসার আগে, গোয়েন্দাকাহিনি সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি ব্যক্তিগত লেখা এখানে খুবই উল্লেখযোগ্য –

"লেখকেরা তাঁদের গল্প-উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রই মন থেকে তৈরি করেন। কোনও কোনও চরিত্র কিন্তু তাঁদের কাছে নিজে থেকেই আসে। পরাশর বর্মা যেমন আমার কাছে আসে অতর্কিত ভাবে।

ছেলেবেলা থেকেই ছাপার অক্ষরে লেখা প্রায় সবকিছুই গোগ্রাসে পড়া আমার একটা রোগ বলে স্বীকার করতে পারি। তার মধ্যে ডিটেকটিভ গল্প অবশ্যই বাদ পড়েনি।

ভাল করে ইংরেজি বোঝার আগে থেকেই স্যার আর্থার কোনান ডয়েল-এর অমর সৃষ্টি গোয়েন্দা-চূড়ামণি শার্লক হোমস-এর কীর্তিকলাপ দিয়ে শুরু করেছি। তার পর ছোট বড় নগণ্য বরেণ্য বিদেশি রহস্য সাহিত্যের প্রায় সব ডিটেকটিভের সঙ্গেই অল্পবিস্তর পরিচয় হয়েছে। কোনান ডয়েল-এর শার্লক হোমস থেকে আগাথা ক্রিস্টির হারক্যুলে পোয়ারো পর্যন্ত যেসব গোয়েন্দার বাহাদুরির বৃত্তান্ত উপভোগ করেছি, বাংলায় তাদের দেখাদেখি কাউকে আমদানি করার কথা কিন্তু কখনও মাথায় আসেনি।

...ভাল-মন্দ-সরেস-নিরেস যেমনই হোক, দুনিয়ার রহস্য-কাহিনির ফলন আর চাহিদা বোধহয় সবচেয়ে বেশি। আইন-শৃঙ্খলে বাঁধা আমাদের সাধারণ প্রাত্যহিক জীবন ক্রমশ ছক-বাঁধা যান্ত্রিকতায় একঘেয়ে হয়ে আসে বলে প্রতিষেধক হিসেবে এ-ধরনের বল্‌গাছাড়া কাল্পনিক উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের প্রয়োজনও বোধহয় এসব কাহিনি মেটায়।

রহস্য-ও-গোয়েন্দাকাহিনির পাঠক থেকে লেখক হওয়াটা সত্যিই নিতান্ত অপ্রত্যাশিত আর আকস্মিক। পরাশর যদি নিজে থেকে হঠাৎ একদিন দেখা না দিত তাহলে এ-পথ নিশ্চয় মাড়াতাম না।

পরাশর বর্মা ওই নামে গোয়েন্দা হিসাবেই অবশ্য আমায় দেখা দেয়নি। তবে ঘটনাচক্রে কয়েকটা অসংলগ্ন ব্যাপার এক সঙ্গে জড়িয়ে ওই চরিত্রটির আভাস আমার মনে যেন ফুটিয়ে তুলেছিল।

কলকাতার একটি বড় ওষুধ তৈরির প্রতিষ্ঠানে প্রচার-সচিব হিসেবে তখন কাজ করি। একটি সাপ্তাহিকের সম্পাদনাও সেই সঙ্গে করতে হয়।

সেদিন ছোটখাটো একটি নগণ্য পত্রিকা থেকে কে একজন বিজ্ঞাপনের অর্ডার নিতে এসেছিলেন। প্রায় মিনি-মাগনার বিজ্ঞাপন – তাই সরাসরি অর্ডারটা সই করে তাঁকে বিদায় করতে চেয়াছিলাম। কাগজের প্রতিনিধি কিন্তু চলে না গিয়ে একটু গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠতার সুরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার সবুজ কালি কী হল ?"

"সবুজ কালি ?" এক সঙ্গে অবাক আর বিরক্ত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে বলেছিলাম, "সবুজ কালির কথা কী বলছেন ?"

"না মানে", ভদ্রলোক খুব অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন, "আপনি সাধারণত সবুজ কালি ব্যবহার করেন কি না, তাই বললাম - "

ভদ্রলোককে রূঢ়ভাবেই বাধা দিয়ে বললাম, "আমি সবুজ কালি ব্যাবহার করি কে বললে আপনাকে ?"

প্রথমে একটু থতমত খেলেও ভদ্রলোকের মুখে তারপর একটু কৌতুকই ফুটে উঠল। তারই সুরে বললেন, "বললে আপনার ব্লটিং প্যাড।"

এ-কথার পর আমার টেবিলের ব্লটিং প্যাডটা দেখিয়ে তিনি আবার বললেন, "এ কামরায় তো আপনি একাই বসেন। ব্লটিং প্যাডে প্রায় সমস্ত ছাপই সবুজ থাকে, সুতরাং ওই কালিই আপনি ব্যবহার করেন বোঝা উচিত না কি !"

এবার হেসে ফেলে ভদ্রলোকের কাছে একটু বিশদ হলাম। বললাম, "আপনি লক্ষ্য করেছেন ঠিকই। তবে এ প্যাডটা গত দুদিনের মাত্র। এ দুদিন আমার নিজের পেনটা খারাপ হওয়ায় আমার এক আত্মীয়ের কলম ধার করে এনে ব্যবহার করছিলাম। তিনি সবুজ কালিই পছন্দ করেন। আমি কিন্তু কালো ছাড়া কিছু নয়। যাই হোক মীমাংসাটা ভুল হলেও আপনার খুঁটিয়ে দেখার ক্ষমতাটার তারিফ করছি।"

ভদ্রলোককে ওই বলে বিদায় দেবার পর টেবিলের একটা ট্রে-তে রাখা লেখার তাড়াগুলির ওপর নজর পড়েছিল। বেশির ভাগই তার কবিতার বান্ডিল। বেশির ভাগ রাবিশ ওই সবগুলোর ওপর একবার অন্তত চোখ বুলোতে হবে ভেবে যে, বিরক্তিটা মনে জাগল তার মধ্যে কেমন করে যেন গোয়েন্দা কবি পরাশর বর্মার আবির্ভাব। পরাশর নামটা হয়তো কোনও লেখার তাড়ার ওপর দেখেছিলাম। বর্মা পদবিটা আমার সংযোজন।"[৩৯]

এবার আসা যাক পরাশর প্রসঙ্গে। *রোমাঞ্চ* পত্রিকার পাতায় ১৯৩২ - লেখা *গোয়েন্দা কবি পরাশর* গল্পে দেখা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই গোয়েন্দা গল্পগুলির কথক কৃত্তিবাস ভদ্র একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। এদিকে কবিখ্যাতির আশায় পরাশর বর্মা কৃত্তিবাসের দপ্তরে আসে তার কবিতা ছাপানোর জন্য তদ্‌বির করতে। কারণ, গোয়েন্দাগিরিতে নয়, পরাশরের জীবনের অন্যতম উচ্চাশা হল কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করা। কৃত্তিবাসের সাথে পরাশরের প্রথম আলাপ তেমন জমেনি, হয়তো শেষ পর্যন্ত জমতও না, চূড়ান্ত অবহেলা নিয়েই ফিরতে হত পরাশরকে, যদি না তার অদ্ভূত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দিয়ে এক সাংঘাতিক গরমিল ধরে ফেলে কৃত্তিবাসকে অপমানিত হওয়ার হাত থেকে সে রক্ষা করতে পারত। পরবর্তীতে পরাশর ও কৃত্তিবাসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং কৃত্তিবাস হয়েছেন পরাশরের সহকারী এবং তার গল্পের কথক।

পরাশরের বন্ধু সম্পাদক কৃত্তিবাস ভদ্র অর্থাৎ এই গল্পগুলির কথকের মতে পরাশর বর্মার কবিতা শুধু অখাদ্যই নয়, জঘন্য। কিন্তু পরাশর এমন এক অদ্ভুত ব্যক্তি যে হেঁয়ালি করতে ভালবাসে, নিজেকে গোয়েন্দা নয়, কবি হিসেবে পরিচয় দেয়। রহস্য যখন সমাধানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এমন সময়েও পরাশর নিস্পৃহ থাকে। বাংলা সাহিত্যের দুর্ধর্ষ সব গোয়েন্দাদের মতো পরাশরের কাছে সাংঘাতিক কোন অস্ত্রও নেই, অপরাধীদের সাথে লড়াই করার মতো শারীরিক কলাকৌশলও জানা নেই অথবা সাংঘাতিক শক্তিশালীও সে নয়। তবে তার কাছে যা আছে, তা আবার সবার কাছে থাকে না। সেটা হলো কবিসুলভ কল্পনাশক্তি, আর পরিস্থিতি অনুযায়ি সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা। এবং অতি অবশ্যই চূড়ান্ত রসিকতাবোধ। তার নিদর্শন রয়েছে পরাশরকে নিয়ে লেখা কাহিনিগুলির নামকরণের

মধ্যেও। সেইজন্যেই তো অতীব জটিল দুর্বোধ্য সমস্যার সমাধান কবিতা পড়তে পড়তেও করে ফেলেছে এমন উদাহরণ আছে। লেখকের নিজের ভাষায় -

"কবি হয়েও পরাশর বর্মাকে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়, কিন্তু শার্লক হোমস, পোয়ারো কি মাইগ্রে কারও সঙ্গে কোনও আত্মীয়তা তার নেই। আত্মীয়তা পাতাবার চেষ্টাও সে কখনও করেনা। ...কবিতা লেখার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরি করা তার কাছে আসলে একটা মজার খেলা। তার কীর্তিকলাপ বর্ণনা আমার কাছেও কলমের একটা মন-মাতানো ছুটি।"[৪০]

পরাশরের জীবনের শুরুর দিক সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। শুধু এক বার তাকে বলতে শোনা গিয়েছিল যে তার ছাত্রজীবন কেটেছে গুয়াহাটি এবং লখনউ শহরে। সাধারণ গোয়েন্দাদের মতো তিনি গুরুগম্ভীর মোটেই নন। কৃত্তিবাসকে নিয়ে রসিকতা করা তার একটা স্বভাব। পরাশরের প্রথমদিকের কাহিনিগুলিতে তো তার কবিতাচর্চার ব্যাপারটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এমনকি কোন মক্কেল যদি কোন সমস্যা নিয়ে তার কাছে এসেছে, তার কথায় পাত্তা না দিয়ে সে তাকে নিজের কবিতা শোনাতে অথবা কবিতা-সংক্রান্ত আলোচনাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ! কবি ও গোয়েন্দার এই অদ্ভূত সম্মেলন ঘটানো বোধহয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বারাই সম্ভব !

যা হোক, পরাশর আর কৃত্তিবাস দুজনেই বর্তমানে খাস কলকাতার বাসিন্দা। কিন্তু তদন্তের খাতিরে তাদের বহুবার শহরের বাইরে যেতে হয়েছে। কাব্যচর্চা পাশে সরিয়ে রেখে পরাশর ক্রমশ গোয়েন্দাগিরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাতে তার মৌলিক চারিত্র্য কিছু বদলায়নি। সেই রসবোধ, সেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সেই বিপদে ঝুঁকি নেবার অভ্যেস।

পরাশরের কাহিনিগুলির আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা থেকে আরেকটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক –

“গোয়েন্দা কাহিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যের চেয়ে জাতে ছোট এরকম কোনও ধারণা থেকে তা লেখায় বিমুখ কিন্তু ছিলাম না। আমাদের বাংলা ভাষাতেই দু-একজন উন্নাসিক সাহিত্যিকের ডিটেকটিভ কাহিনি গোছের লেখার প্রতি একই অবজ্ঞার ভাব অবশ্য ছিল, এখনও হয়তো কারও কারও নেই এমন নয়। কলম নোংরা হবার ভয়ে তাঁরা গোয়েন্দা কাহিনি লেখেন না তো বটেই, পড়াটাও লজ্জাকর মনে করেন।

আর সব রসের মধ্যে রহস্যের রসে বঞ্চিত এ-সব ছুঁতমার্গীদের জন্য দুঃখ হওয়ারই কথা। তাঁরা শার্লক হোমসের আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ আর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দুর্ভেদ্য রহস্যের অপ্রত্যাশিত সমাধানের চমক উপভোগ করতে পারেন না, জি কে চেস্টারটনের ফাদার ব্রাউন-এর মাধ্যমে পুণ্যের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে পাপের কুজ্ঝটিকা ভেদের রসাল উত্তেজনা থেকে বঞ্চিত হয়। সিমেন-এর ইন্সপেক্টর মাইগ্রে-র সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হয় না। আগাথা ক্রিস্টি-র হারক্যুলে পোয়ারো-র গোয়েন্দাগিরির অভিনব বিচক্ষণতার সঙ্গে আশাতীত জীবনবীক্ষার স্বাদ তারা পায় না।

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, আর কিছু না হোক, দুনিয়ার আধুনিক কবিতার আদি প্রবর্তক হিসেবে যাঁর নামে এইসব গোঁড়া নাক-তোলা জাত্যভিমানীরা গদগদ, এ যুগের বিচক্ষণ যুক্তিনির্ভর গোয়েন্দা কাহিনিরও জন্ম যে সেই লেখকেরই কলমে এ খবরটা এদের অনেকের বোধহয় জানা নেই। বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো যাঁর কাছে এ কালের কবিতার প্রেরণা পেয়েছেন, বিশ্ব-বিমোহন শার্লক হোমস-এরও আদি মডেলের তিনিই সত্যি-স্রষ্টা।

এ মানুষটি ফরাসী জার্মান ইংরেজ বা ইওরোপের কোনও দেশেরই নন। তিনি মার্কিন। আগের শতাব্দীর গোড়ায় জন্ম নিয়ে মাত্র চল্লিশ বছরের পরমায়ুতে এমন কিছু নতুন পথ কাটার কাজ করে গিয়েছেন যার মুগ্ধ স্বীকৃতি পাচ্ছেন একশো বছরের পরে।

এই এডগার অ্যালেন পো-র কলমে যার জন্ম রহস্য-রোমাঞ্চের সেই গোয়েন্দাকাহিনিকে জাত বিচারে অচ্ছুত করে রাখা বোধহয় চলে না। আর তা করলেও তাকে ঠেকিয়ে রাখা কারও সাধ্য নয়।”[৪১]

প্রসঙ্গে ফেরা যাক। পরাশর-কাহিনি লেখার প্রেক্ষাপট হিসেবে এই উদ্ধৃতিটি স্মরণে রাখলে এই গল্প-উপন্যাসগুলির কাহিনির উপস্থাপনা, তার চরিত্রের অভিনবত্ব, বিশেষত অপরাধীদের মনস্তাত্বিক জটিলতার অপূর্ব বিন্যাসের সূত্রটি ধরে নিতে অসুবিধা হয় না। ফলে, খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কলমে পরাশর-কৃত্তিবাসের এই কাহিনিগুলি নিছক গোয়েন্দাগল্পের খোলস ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে একেকটি সারগর্ভ ন্যারেটিভ, যা সাহিত্যমূল্যের বিচারে ‘উন্নাসিক’ বাঙালি পাঠকের কাছেও নিশ্চয় মান্যতা পাবে।

পরাশরকে নিয়ে লেখা প্রথম গোয়েন্দাকাহিনির সম্ভাব্য সময় ১৯৩২। তখন থেকে শুরু করে আশির দশক পর্যন্ত পরাশরকে নিয়ে প্রায় তিরিশটির মতো গল্প-উপন্যাস লিখেছেন।

পরাশর বর্মা সিরিজের গল্প উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে –

গোয়েন্দা হলেন পরাশর, বর্মাক্লাবের নাম কুমতি, ভয়ংকর ভাড়াটে ও পরাশর বর্মা, রং নম্বর, সুন্দ উপসুন্দের আধুনিক উপাখ্যান, পরাশর বর্মা ও ভাঙা রেডিও, পরাশর বর্মা ও কবিতার ঘন্ট, অঙ্কে কাঁচা পরাশর বর্মা, পরাশরের কমা-সেমিকোলন, বেইমান বাটকারা, প্রেমের চোখে পরাশর বর্মা, গন্ধ পেলেন পরাশর বর্মা, নিলেম ডাকলেন পরাশর বর্মা, হার মানলেন পরাশর বর্মা, হিপি-সঙ্গে পরাশর বর্মা, ঘোড়া কিনলেন পরাশর বর্মা, ঘুড়ি ওড়ালেন পরাশর বর্মা, গোয়েন্দা কবি পরাশর, সাংঘাতিক শিশি ও পরাশর বর্মা, পরাশর বর্মা ও অশ্লীল বই, পরাশর বর্মা ও বাঁধানো ছবি, চেঞ্জে গেলেন পরাশর বর্মা, প্রেমের ত্রিকোণে পরাশর, পরাশর এবার জহুরি, পুবে বালি পশ্চিমে বালি, দূরবিন চোখে পরাশর বর্মা, ছবি চিনলেন পরাশর বর্মা, দুনৌকোয় পরাশর বর্মা, প্রেমের প্রান্তে পরাশর, নিজের জবানিতে পরাশর, পরাশর বর্মা ও বোম্বাই ধান্দা, কৃত্তিবাসের অজ্ঞাতবাস, তুরুপের তাস চুরি, পরাশরের শর, পরাশর পলাতক, স্ক্যান্ডাল পয়েন্ট, ফুটপাথের বই ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাংলার কিশোর পাঠককুলকে বিজ্ঞানমনস্কতা ও দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহিত করার জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯৩২-৩৩ সালে *মৌচাক* পত্রিকাতে লিখেছিলেন *কুহকের দেশে* উপন্যাসটি। এখানে লেখকের আরেক জনপ্রিয় চরিত্র 'মামাবাবু'-কে পাওয়া যায় একজন রহস্যভেদী হিসেবে। তবে সে রহস্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার সাথে অপরাধের কোন সম্পর্ক নেই। এর বারো-তেরো বছর পরে তিনি আবার ফিরে এসেছেন *ড্রাগনের নিঃশ্বাস* - এ। পরবর্তীকালে তাঁকে নিয়ে আরও বেশ কয়েকটি কাহিনি লিখেছেন প্রেমেন্দ্রবাবু। সেসব গল্পে মামাবাবুর বিজ্ঞানজিজ্ঞাসা ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং প্রচন্ড সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত, প্রেমেন্দ্র মিত্রের চরিত্রগুলির মধ্যে ঘনশ্যাম দাস ওরফে বিখ্যাত ঘনাদাকে নিয়ে লেখা কাহিনির সংখ্যা এবং জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। তাদের মধ্যে দুটি কাহিনিতে ঘনাদার সাথে পরাশরের মোলাকাতও হয়, সেগুলির নাম *ঘনাদা ফিরলেন* ও *পরাশরে ঘনাদায়* । বিজ্ঞানের জগতে বা আন্তর্জাতিক-রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে যেমন আছেন মামাবাবু এবং ঘনাদা, তেমনই সামাজিক প্রেক্ষিতে এবং মনুষ্যচরিত্রের রহস্য উন্মোচনে আছেন গোয়েন্দা-কবি পরাশর।

পরাশর-কাহিনি শেষ করবার আগে শুধু একটাই উত্তরের খোঁজ মনের ভেতরে থেকে যায় – যে মানুষটির সাথে সাক্ষাৎ হবার পরে প্রেমেন্দ্রবাবুর মনে পরাশর বর্মার ভাবনাটি আসে, সেই মানুষটি কি কখনও এই সৃষ্টি-ইতিহাস জানতে পেরেছিলেন ?

❖

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরেই যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয়, তিনি নীহাররঞ্জন গুপ্ত (১৯১০-১৯৮৬)। তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র কিরীটী রায় বাঙালি পাঠকদের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয়। মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত কিরীটী অমনিবাসের প্রথম খন্ডের শুরুতেই মুখবন্ধ হিসেবে ‘কিরীটী তত্ত্ব’ নিয়ে বেশ কিছু কথা বলেছেন প্রমথনাথ বিশী। সেখানে গোয়েন্দা কাহিনি রচনার কারণ হিসেবে তিনি কিছু যুক্তি দিতে চেয়েছেন। সেকালের রূপকথার গল্পের পাঠক একালে কিভাবে গোয়েন্দা বা রহস্য কাহিনির মধ্যে নিজেদের কল্পনা বিলাসকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তা নিজের মতো করে বলেছেন লেখক। তাঁর মতে, বাস্তব জগতের অধিবাসী কিশোরের কাছে রহস্য, রোমাঞ্চ, সংঘাত, বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অবকাশের প্রশ্নে বোধহয় পরেরটির মূল্য আগেরটির থেকে কিছু বেশি। প্রমথনাথ বিশীর কথায় –

“কিরীটী রায় রোমাঞ্চ-অন্বেষী কিশোর মনের চিরন্তন নায়ক। বয়ঃসন্ধির বালক নিজেকে দুঃসাহসের পথে, সংগ্রাম ও বীরত্বের পথের নায়ক বলে চিরকাল কল্পনা করতে ভালোবাসে। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী-জীবনে সে রহস্য, রোমাঞ্চ, সংঘাত, বীরত্ব ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অবকাশ কোথায় ? তাই কল্পনাই তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে।...সুতরাং ভাবালু কিশোর মনের ছায়া অনুসরণ করে গড়ে ওঠে একজাতীয় রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী। কিরীটী রায় তাঁদের মধ্যে প্রথম সারির অধিবাসী। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বাঙালী কিশোর পাঠকমনকে এই সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যতার আলোছায়া ঘেরা জগতে মোহমুগ্ধ করে রেখেছে রহস্যভেদী কিরীটী রায়।”[৪২]

কিরীটী-কাহিনি পাঠ এবং বিশ্লেষণে প্রমথনাথ বিশীর এই ভূমিকাটি গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য।

কে এই কিরীটী রায় ?

প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ চেহারা। মাথা ভরতি কোঁকড়ানো চুল, ব্যাকব্রাশ করা।

চোখে পুরু লেন্সের কালো সেলুলয়েডের চশমা।

দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো।

মুখে হাসি যেন লেগেই আছে, সদানন্দ, আমুদে। গানের গলাটিও ভারী চমৎকার, যেমন মিস্টি তেমন দরদভরা।

কলেজজীবনে শখের তাড়নায় যে নেশার শুরু, ক্রমে তাই তাঁর বৃত্তি বা পেশায় পরিণত হয়েছে।

কিরীটীর প্রথম জীবনের রহস্যভেদের কাহিনি আছে ‘রহস্যভেদী’ গল্পে। কিরীটী অম্নিবাসের প্রথম কাহিনি ‘কিরীটির আবির্ভাব’ হলেও, বস্তুত, ‘রহস্যভেদী’ই এই সিরিজের প্রথম গল্প, অন্তত কাহিনির ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে। ‘কিরীটির আবির্ভাব’-এ কিরীটী এই কাহিনিগুলির অন্যতম ভাতৃত্রয় রাজু, সনৎ ও সুব্রতর সঙ্গে

পরিচিত হন। ত্রিশের দশকে কালো ভ্রমর কাহিনির সূত্রপাত। বাংলা রহস্য কাহিনির নায়ক কিরীটীর সাথে সাথে দুর্বৃত্ত কালো ভ্রমরও বাঙালি পাঠকমনে স্মরণীয় স্থান পেয়েছে।

রহস্যভেদী দিয়েই শুরু করা যাক।

কিরীটী তখন পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। পূর্বপুরুষের পয়সার প্রাচুর্য থাকলেও বিলাসিতাকে কোনদিনই সে প্রশ্রয় দেয়নি। শিয়ালদহের অন্ধকার গলিতে অখ্যাতনামা এক ছাত্রাবাস 'বাণীভবন'। মাসিক সাত টাকা খাওয়া-থাকা দিয়ে তারই তেতলার একটা অন্ধকার খুপরির মধ্যে কিরীটী থাকত। চাকরের নাম নন্দু।

সলিল সরকার কিরীটীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই গল্পে সলিলের পিসিমা দলিল চুরি করে নিজের ছেলে শম্ভুকে দেওয়ার জন্য। শম্ভু জুয়াড়ি, নেশাখোর, মদ্যপ। বহু টাকা তার দেনা। মাত্র এক হাজার টাকার বিনিময়ে অন্যের হাতে দলিলটি পৌঁছে দেবে বলে সে মা'কে বাধ্য করে দলিলটি চুরি করতে। কিরীটী সবটাই বুঝে যায়। কিন্তু পিসিমা বা তার ছেলে কাউকেই সে অসম্মানিত তো করেই না বরং তাদের এক হাজার টাকা সাহায্য করে। আর বলে,

"শম্ভুকে দেবেন পিসিমা, আর তাকে বলবেন এবার সৎপথে চলতে। ওপথে কেবল দুঃখই বাড়ে, সুখ নেই।"[৪৩]

প্রসঙ্গত, *বত্রিশ সিংহাসন* গল্পে শ্রীনগরের রাজা ত্রিদিপনাথ রায়কে একটি চিঠিতে কিরীটী লিখেছিল –

"আপনি আপনার বিজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে যে রহস্যের অনুসন্ধান দিয়েছেন সেটা আমার রহস্যপ্রিয় মনকে একান্তভাবে আকর্ষণ করেছে। পারিশ্রমিকের কথা ছেড়ে দিন, অর্থের অভাব আমার নেই, তাই হয়তো লালসাও নেই। মনে করবেন না এটা আমার আত্মম্ভরিতা, এটা আমার সংস্কার বলতে পারেন, কারণ অনুসন্ধানের ব্যাপারটা আমি মনে করি সম্পূর্ণ অঙ্কশাস্ত্রের মতই একটা জটিল সমস্যা মাত্র। বুদ্ধি থাকলেই

যে-কোন কঠিন সমস্যার সমাধান করা যায়। অবিশ্যি সে সমস্যা যদি উদ্ভাবিত হয়ে থাকে আমাদের মত কোন এক মানুষের দ্বারা।”[৪৪]

কিরীটীর আবির্ভাব গল্পে এসে দেখা যাচ্ছে, কিরীটীর সুন্দর একখানা দোতলা বাড়ি হয়েছে। আধুনিক প্যাটার্নের নয়, পুরান স্টাইলে সবুজ রঙের। বাড়ির সামনে ছোট একটা ফুলফল তরিতরকারির বাগান। ওপরে ও নিচে সবসমেত বাড়িতে মাত্র চারখানা ঘর। ওপরের একটাতে কিরীটী থাকে। একটাতে তাঁর রিসার্চ ল্যাবরেটরি। নিচে একটায় লাইব্রেরি, অন্যটা বৈঠকখানা। তিনজন মাত্র লোক নিয়ে সংসার। কিরীটী নিজে। একটা নেপালী চাকর, নাম জংলী। এছাড়া পাঞ্জাবি শিখ ড্রাইভার হীরা সিং। পরবর্তীকালে কিরীটী বিয়ে করবে, স্ত্রীর নাম কৃষ্ণা।

ভৃত্য জংলীর একটা ইতিহাস আছে। তার যখন মাত্র ন’বছর বয়স, তখন একবার কারশিয়াং বেড়াতে গিয়ে কিরীটী তাকে নিয়ে আসে। সে আজ দীর্ঘ সাত বছর আগের কথা। এখন জংলীর বয়স ষোল বছর। সে এখন বলিষ্ঠ যুবক। কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই ছায়ার মত ঘোরে। অনেক সময় কিরীটীর সহকারীর কাজও করে। যেমন বিশ্বাসী, তেমন প্রভুভক্ত।

কিরীটী ঈশ্বরবিশ্বাসী। সে বলে –

“এ সংসারে পাপ-পুণ্য পাশাপাশি আছে। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের তিরস্কার – এইটাই নিয়ম। আজ পর্যন্ত পাপ করে কেউই রেহাই পায়নি। দৈহিক শাস্তি বা দশ বছর জেল হওয়া অথবা দ্বীপান্তরে যাওয়াটাই একজন পাপীর শাস্তিভোগের একমাত্র নিদর্শন নয়। ভগবানের মার এমন ভীষণ যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরও তার কাছে একান্তই তুচ্ছ। বিবেকের তাড়নায়, মানসিক যন্ত্রণায়, চোখের জলের ভিতর দিয়ে তিল তিল করে যে পরিতাপের আত্মগ্লানি ঝরে পড়ে, তার দুঃসহ জ্বালায় সমস্ত বুকখানাই যে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। স্থূলচোখে আমরা অনেক কিছুই দেখতে পাই না বটে, কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্বটাই একেবারে অস্বীকার করে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতাই বা আমাদের কোথায় ? গায়ের জোরে সবকিছুকে অস্বীকার করতে চাইলেই কি মন আমাদের সবসময় প্রবোধ মানে ?”[৪৫]

কিরীটীর বন্ধু ও সহকারী সুব্রত ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার লক্ষ্য করেছে, কিরীটীর অদ্ভূত শক্তি আছে বিশ্লেষণের। অন্ধকারের মধ্যে ভবিষ্যতের পদসঞ্চার শুনতে পায় সে। পঞ্চ অনুভূতির বাইরে তার যে একটা বিচিত্র ষষ্ঠ অনুভূতি, যার সাহায্যে অনেক সময় অসাধ্য সাধন করেছে সে, ভাবতে গেলে যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কিরীটী বলে ওটা নাকি তার common sense, স্বাভাবিক বুদ্ধির বিচারশক্তি। চরিত্রের দিক দিয়ে কিরীটীর একটা লৌহকঠিন নীতি আছে যা একপ্রকার দুর্ভেদ্যও বলা চলে। নীতির কোন বিকার নেই বটে তবে, মানসিক একটা অসাধারণ সত্যতা আছে, আছে একটা চারিত্রিক নিষ্ঠা।

এক এক সময় দেহে ও মনে কিরীটীর এমন একটা নিষ্ক্রিয়তা দেখা যেত, যে সে হয়ত দিনের পর দিন বাড়ি বেরুতই না। হয় নিজের ল্যাবরেটরি ঘরে, না-হয় বসবার ঘরে সমস্তদিন, এমনকি মাঝেমাঝে গভীর রাত পর্যন্তও কাটিয়ে দিত। কেউ এলে দেখা পর্যন্ত করত না। দেহ ও মনের ঐ নিষ্ক্রিয় ভাবটা কোন কোন সময় একনাগাড়ে একমাস দেড়মাস পর্যন্ত চলত। কিরীটি যেন সেই সময়টায় শামুকের মতই নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখত। *রক্তলোভী নিশাচর* (১৩৪৯) গল্পে জানা যায়, হাতে কোন কাজকর্ম নেই বলে কিরীটী তার বৈচিত্র্যপূর্ণ আত্মজীবনী লিখছিল। তার নিজের কথায়,

"আত্মচরিত সাধারণত যে-রকমটি হয়, এ সেরকম নয়। আত্মচরিতের 'আত্ম'টিকে বাদ দিয়ে কেবল জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে সাজিয়ে যাচ্ছি পরপর।"[৪৬]

কিন্তু সে যখন কোন একটা জটিল ব্যাপারে মীমাংসার কাছাকাছি আসে, তার চালচলন কথাবার্তা দ্রুত ও ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। তার ধীর-স্থির ভাব যেন সহসা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। রহস্য মীমাংসার শেষ ধাপে এসে পৌঁছে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে নিজেকে ধীর-স্থির রাখার জন্য। ভিতরে তার যে ঝড় চলেছে, তাকে চাপা দেওয়ার জন্য বাইরে শান্তভাবের মুখোশ চাপিয়ে রাখে। তবে যতক্ষণ কিরীটী কোন ব্যাপারে স্থিরসিদ্ধান্তে একেবারে না পৌঁছায়, কোন কথাই সে বলে না, কোন মতামত দেয় না, এটা তার চিরকালের স্বভাব। 'কালো হাত' (১৩৫৩) গল্পে সুব্রত লিখেছে,

"দীর্ঘকাল পাশাপাশি থেকে এবং একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পেয়েও জোর গলায় বলতে পারি না, কিরীটীর চিন্তাশক্তির হদিস সব সময় যথার্থভাবে পাই। তার ব্যবহারে কখনও মনে হয়েছে অত বড় নিরেট ও হাবাগোবা মানুষ বুঝি দ্বিতীয়টি নেই। কখনও আবার মনে হয়েছে ওরকম তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও আত্মসচেতন মানুষ বুঝি এ দুনিয়ায় সত্যিই বিরল। কোনটি যে ওর সত্যিকারের রূপ, আজও সত্যি কথা বলতে কি – তেমন করে বুঝে উঠতে পারিনি বা পারি না।"[৪৭]

বৌরাণীর বিল গল্পের মক্কেল সত্যজিৎকে কিরীটী বলে, সে আজকাল আর তথাকথিত হত্যারহস্যের মীমাংসার ব্যাপারে কোন আগ্রহই পায় না। প্রত্যেকটি হত্যার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত অর্থ, লালসা, প্রেম, প্রতহিংসা এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে, শেষ দৃশ্যে হয় হাতকড়া বা ফাঁসির দড়ি দিয়ে এমন একটা করুণ রসের সৃষ্টি হয়, যে তার নিজের ওপরেও ধিক্কার এসে যায়।

"এককালে একটা মোহ ও vanity বশেই এ line এ হাত দিয়েছিলাম। বুদ্ধির খেলায় একজনকে ধরাশায়ী করতে একটা অপূর্ব পুলক অনুভব করতাম। ক্রমে সেটা একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এখন নেশাটা এসেছে থিতিয়ে। ...তার কারণ, দেখতে পাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তথাকথিত ঐসব ভিলেনের দল অপরাধই করে বটে, তবে অপরাধের art টাকে জানে না। ...আর্ট বলতে অবশ্য এক্ষেত্রে আমি এখানে ভিলেনের চাতুরীটাকেই mean করছি।"[৪৮]

কিরীটীর মতে মানুষের চেহারা, তার আকৃতি, গঠন এবং তার মুখের গড়ন দেখে কাউকে চেনা যায় না। কারণ মানুষের মনটা এমন একটা বিচিত্র বস্তু যে, বিশেষ কোন একটা ফর্মুলার মধ্যে ফেলে তাকে বিচার করতে গেলে সঠিক বিচার হয় না বলেই তার ধারণা। কিন্তু তবুও অনেক সময় মানুষের বাইরের চেহারাটা দেখেই কিরীটী তার চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছে। কিরীটী বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে যত প্রকার অন্যায় ও পাপ দেখা যায়, সেগুলোর মূল অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, সবই প্রায় মানুষের কোন না কোন বিকৃত কল্পনার দ্বারা গড়ে ওঠে। মানুষের কল্পনা থেকেই যেমন জন্ম নেয় শ্রেষ্ঠ কাব্য, কবিতা ও সাহিত্য, তেমনই কল্পনা থেকেই আবার জন্ম নেয় যত প্রকার ভয়ঙ্কর পাপ ও অন্যায়। কেউ পাপ করে অর্থের লোভে, কেউ প্রতিহিংসায়, কেউ বা বার বিকৃত আনন্দ অনুভূতির জন্য।

শেষোক্ত ধরণকেই বলা যেতে পারে অস্বাভাবিক। তার মতে, পৃথিবীতে কোন কিছুই বিচিত্র নয়। এমনকি একজনের একজনকে হত্যা করাটার মধ্যেও বিচিত্র কিছু নেই। মানুষের বুকের মধ্যে ভালবাসা, প্রেম, ঘৃণা, আক্রোশ, দ্বেষ ও তুচ্ছতার মত হত্যালিপ্সাটাও একটা অনুরূপ প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। যে কোন মানুষের পক্ষেই জীবনের কোন না কোন সময়ে কাউকে হত্যা করার মধ্যে এমন কিছু একটা বৈচিত্র্য নেই। অতি শান্ত-শিষ্ঠ, ধীর-স্থির, সজ্জন প্রকৃতির লোকের মধ্যেও কোন না কোন সময় যদি হত্যালিপ্সা জাগেই, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কেবল যে গভীর কোন উদ্দেশ্য নিয়েই সবক্ষেত্রে হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়, তা নয়। তুচ্ছতম কারণেও মানুষ মানুষকে হত্যা করতে পারে এবং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ঘুম ভাঙার রাত গল্পে কিরীটির স্ত্রী কৃষ্ণা যখন অভিযোগ করে করে যে, কিরীটী শুধু মানুষকে বাঁকা ভাবেই দেখে, তখন তার উত্তরে কিরীটী বলে,

"স্বার্থটাই যে বাঁকা পথে চলে কৃষ্ণা, মানুষকে তাই তো বাঁকাভাবে সব দেখতে হয়। ...পৃথিবীতে মানুষকে যদি বাঁচতেই হয়, তবে সব জেনেশুনে বুঝে বাঁচাই তো ভাল। এই খুন, হত্যা, জখম, রাহাজানি, জাল জুয়াচুরি যে চলছে – কেন চলছে? অভাবে না স্বভাবে ? এত ধরপাকড় দেখেও তো কই মানুষ সাবধান হয় না, সৎ পথে চলে না ? ...এই কাদামাখা লোকগুলোর মধ্যেও মানুষ আছে। তারাও তোমাদের মত তথাকথিত সৎ ও সজ্জন। আর কাদা ঘাঁটার কথাই যদি বল, তাহলে বলব, অবস্থা বিশেষের কথা কেউ তো বলতে পারে না। কাল যে তুমিই কাদা ঘাঁটবে না, কে বলতে পারে? চোর, জুয়াচোর, জালিয়াত মাত্রই হয়তো সত্যিকার জন্ম-অপরাধী নয়। জন্ম পরিবেশ, জীবন পরিস্থিতি অনেক কিছুই হয়তো দায়ী এদের চোর-ডাকাত-হত্যাকারী প্রভৃতি পরিচয়ের মধ্যে। আমি তাই কাদা ঘাঁটি – যদি এইসব দেখেশুনে তাদের চোখ খোলে, তারা নিজেদের চিনতে পারে।"[৪৯]

তার মতে –

"মানুষ মাত্রেই criminal সামান্য দু'একজন ছাড়া এবং crime-য়েরও বিভিন্ন স্তর ও প্রকৃতি ভেদ আছে। আছে বিভিন্ন সংজ্ঞা। ...ডাকসাইটে ছাপমারা তথাকথিত একজন criminal-য়ের সঙ্গে যারা, ধরাছোঁয়ার বাইরে অথচ সাংঘাতিক সব crime করে বেড়ায় অবাধে, সকলের চোখের সামনে দিয়ে, সেই সব criminal-দের পরস্পরের মধ্যে মূলগত বা প্রকৃতিগত পার্থক্যটা সত্যিকারের কোথায় ? এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেদের যদি ক্রিমিন্যাল বলে ধরে নেওয়া যায় তবে, তাদেরও প্রথমোক্তদের সঙ্গে আত্ম ও পাপশুদ্ধির জন্য সরকারী যে সব শোধনখানা আছে, অর্থাৎ সভ্য জগতে যাকে jail বলা হয়েছে সেখানে পাঠান হবে না কেন ? এইসব ব্যাপারের investigation অর্থাৎ অনুসন্ধানের জন্যই রহস্যভেদের ব্যবসা শুরু করেছি। যে কোন একটা ক্রাইমের ভিতর থেকে তার সত্যটি খুঁজে বের করাই হচ্ছে আমার কাজ। এটা রামা, শ্যামা, যদু সাধারণের জন্য নয়। এতে প্রয়োজন তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি, দূরদৃষ্টি, স্থির চিন্তা ও ধৈর্য, সংযম, মানসিক ও শারীরিক ক্ষিপ্রতা, যত্ন ও সুকঠোর অধ্যবসায়। সবকিছু জড়িয়ে এক প্রকারের অসাধারণ শক্তিও বলা চলে ব্যাপারটাকে যা সাধারণের নাগালের বাইরে।"[৫০]

প্রজাপতি রঙ গল্পে কিরীটী প্রৌঢ় অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। পুলিশ অফিসার সুদর্শন মল্লিক, যিনি কিরীটীর পূর্বপরিচিত, তাঁর বর্ণনায়,

"বিকেলের দিকে একটা কালো রঙের ফিয়াট গাড়ি থানার সামনে এসে দাঁড়াল। পরনে পায়জামা ও গরমের পাঞ্জাবি ও তার উপরে দামী একটা শাল জড়ানো। চোখে মোটা কালো সেলুলয়েডের চশমা, মুখে চুরুট। প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নামল।"[৫১]

সুদর্শন মনে মনে কিরীটীকে গুরু মানে। বলে,

"মনে মনে একলব্যের মত সেই কিশোরকাল থেকেই গুরুপদে বরণ করেছিলাম আপনাকে। ...প্রথমে ছিলেন হিরো – হিরো ওয়ারশিপ, তারপর হলেন গুরু, পথ-প্রদর্শক।"[৫২]

প্রসঙ্গত, কিরীটী সিগারেট খায় না। খায় সিগার আর পাইপ। একটি সুদৃশ্য চন্দনকাঠের বাক্সে তার সিগার রাখা থাকে।

কিরীটী যখন সুশৃঙ্খল যুক্তিবিন্যাসের দ্বারা অপরাধীর কার্যপরম্পরা বিশ্লেষণ করে তখন আমাদের মনে হয়, এ তো নিতান্তই সহজ ও সরল। এবং কাহিনি শেষ করার সঙ্গে কাহিনির উপরে পাঠকমনে জেগে থাকে রহস্যকাহিনির রহস্যভেদী নায়ক কিরীটী রায়ের ব্যক্তিত্ব, তার তীব্রতীক্ষ্ণ যুক্তিবোধ, পরিমিতি বোধ, ক্ষুরধার বুদ্ধির মালিন্যমুক্ত ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। যা কিরীটী রায়কে সমসাময়িক ডিটেকটিভ কাহিনির নায়কদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছে।

শেষ করার আগে কিরীটীর স্রষ্টা নীহাররঞ্জন গুপ্তের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে

"কালো ভ্রমরের মত এক অসাধারণ criminal এর সঙ্গে মোকাবিলার জন্যই আমার প্রয়োজন হয়েছিল কিরীটীর মত এক সত্যসন্ধানীর। যার superiority humanity কালো ভ্রমরকে সুনিশ্চিত ভাবে পরাজিত করবে।

সে এমন একটা মানুষ, এমন একটা চরিত্র যার প্রথম প্রকাশই হবে বিশেষ একটি আবির্ভাব। একটা character।

চরিত্রও চিন্তা করে নিলাম, কিন্তু কি দেব তার নাম।

কোন নামে তার পরিচয় দেবো। ভাবি আর ভাবি – পছন্দই হয়না কোন নাম। কত নাম বসাই আর কাটি।

অবশেষে খুঁজে পেলাম ঐ নামটি কিরীটী। তুষার মুকুট মাথায় কাঞ্চনজঙ্ঘাই আমাকে পথ দেখিয়েছিল – কিন্তু সে কথা আজ আর আমার মনেও পড়েনা – কেবল মনে আছে আমি পেয়েছিলাম আমার কিরীটীকে।

অনেক কাহিনী রচনা করেছি এই কিরীটীকে কেন্দ্র করে – এবং সেসব ক্ষেত্রে আমায় প্রেরণা জুগিয়েছে ঐ কিরীটীই, আমার সৃষ্টি বহু চরিত্রের মধ্যেও সে – একক অনন্য।

আমি জানি কিরীটী শুধু একা আমার নয় – বহু বহু জনার প্রিয়। আবালবৃদ্ধবনিতার। আমার লেখক জীবনের সে এক বিশেষ প্রাপ্তি – স্বীকৃতি। জীবনের প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করতে বসে আজ তাই বার বার মনে হয় – ওকে না খুঁজে পেলে হয়ত আমার কিছুই পাওয়া হতো না।"[৫৩]

নীহাররঞ্জন প্রায় একশোটির কাছাকাছি কিরীটী-কাহিনি রচনা করেছেন। মিত্র ও ঘোষ থেকে মোট ১৫টি খণ্ডে সেই সব কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে।

তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিরীটী কাহিনিগুলি হল –

কিরীটীর আবির্ভাব, রহস্যভেদী, চক্রী, বৌরাণীর বিল, হাড়ের পাশা, হলুদ শয়তান, ডাইনীর বাঁশী, ড্রাগন, মোমের আলো, বসন্ত রজনী, কালো পাখি, বিষকুম্ভ (১৯৫৬), মৃত্যুবাণ (১৯৫১-৫২), রাত্রি যখন গভীর হয় (১৯৪৮), অলোকলতা (১৯৫২), অতল সৈকত, বনমরালী, সুভদ্রা হরণ, বিদ্যুৎ - বহ্নি, মারণ ভোমরা, মন পবন, অদৃশ্য শত্রু, প্রজাপতি রঙ, চারের অঙ্ক, আদিম রিপু, মৃগতৃষ্ণা, মিথুন লগ্ন, মণিকুণ্ডল, কৃষ্ণা কাবেরী, রতিবিলাপ, মদন ভস্ম, রিপু সংহার, নাগপাশ, সেতারের সুর, ওরা তিনজন, ছোরা, কালোহাত, ছায়া কুহেলী, মৃত্যুবিষ, পদ্মিনী, ঘুম নেই, কলঙ্ক কথা, হীরা চুনি পান্না, অহল্যা ঘুম, হীরকাঙ্গুরীয়, ঘুম ভাঙার রাত, নীল কুঠী, সর্পিল, রক্তলোভী নিশাচর, বত্রিশ সিংহাসন, নিরালা প্রহর, রত্ন মঞ্জিল, আলোকে আঁধারে, নগরনটী, রক্তের দাগ, ব্লু – প্রিন্ট, রেশমী ফাঁস, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, উর্বশী সন্ধ্যা, বসন্তের দিন শীতের রাত্রি, মারীচ সংহার, যুগলবন্দী, সামনে সমুদ্র নীল, মানসী তুমি, অবগুণ্ঠিতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

❖

হেমেন্দ্রকুমার – শরদিন্দু - নীহাররঞ্জনের গোয়েন্দা কাহিনি লেখার ধারায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই লেখক শশধর দত্ত এবং স্বপনকুমার। বিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে শশধর দত্তের *দস্যু মোহন সিরিজ* প্রকাশিত হতে থাকে। প্রায় দু'শোর কাছাকাছি বই লেখা হয়। আর স্বপনকুমারের উত্থান পঞ্চাশের দশকে, টানা তিন দশক একাদিক্রমে রাজত্ব করার পর আশির দশকের মাঝামাঝি এসে তিনি থামেন।

স্বপনকুমারের রহস্যময় জগৎ সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনার পরিসর আছে, কারণ স্বপনকুমারের টার্গেট পাঠকগোষ্ঠী হেমেন্দ্রকুমার – নীহাররঞ্জন – শরদিন্দুর চেয়ে আলাদা। জনপ্রিয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে – ক'টি সাধারণ মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্বপনকুমারের লেখার মধ্যে তার সব ক'টি উপাদানেরই সঠিক মিশেল ছিল।

দেব সাহিত্য কুটীর – এর *বিশ্বচক্র সিরিজে* তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। তখন তাঁর গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জি ছিল একা। বন্ধু ও সহকারী রতনলাল এসেছে আরও অনেক পরে। পঞ্চাশ – ষাটের দশকের দীপক চ্যাটার্জির গল্পের সঙ্গে সত্তর বা আশির দশকের দীপক চ্যাটার্জির কাহিনি - কাঠামো এমনকি উপস্থাপন ভঙ্গিরও পার্থক্য রয়েছে। স্বপনকুমার তাঁর লেখায় মূলধারার বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের অজস্র উপাদান বিচিত্র কৌশলে আত্মসাৎ করে নিজের মত করে পরিবেশন করেছেন, বিদেশি সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হননি। একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায় তাঁর কাহিনিগ্রন্থন, ডিটেকশন পদ্ধতি, ভিলেন চরিত্রের নেপথ্যে প্রভাব রয়েছে নীহাররঞ্জন গুপ্তর।

তা সত্ত্বেও, স্বপনকুমার তৈরি করতে পেরেছিলেন লেখালেখির নিজস্ব একটি ঘরানা, যা সেই সময়ের এক বিপুল সংখ্যক পাঠকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকত। স্বপনকুমারের ন্যারেটিভকে তাই মূলধারার বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র সম্প্রসারণ বলা যেতে পারে।

বটতলার তথাকথিত কুরুচিকর ক্রাইম কাহিনির থেকে সরে এসে প্রথম বাংলা গোয়েন্দা গল্পকে 'সিরিয়াস' করে তোলার কাজটা হেমেন্দ্রকুমারই শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাকে আরও কয়েকধাপ এগিয়ে দিয়েছিলেন শরদিন্দু - নীহাররঞ্জন। বাংলার উচ্চবর্গীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা এঁরা পেয়েছেন। কুলীন গোয়েন্দাদের তালিকায় স্থান পেয়েছে এঁদের চরিত্ররা।

অন্যদিকে, উচ্চকোটির গোয়েন্দা হিসেবে দীপক চ্যাটার্জি এবং তার সহকারী রতনলাল কোনদিনই স্বীকৃতি পাননি, যাতে করে তারা চিরস্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারেন। দারুণ প্লট – কাহিনির জটিলতা – যুক্তিক্রম – সূক্ষ্মতম বুদ্ধির প্রয়োগ – যে সমস্ত গুণাবলি একজন গোয়েন্দাকে পাঠকের চৈতন্যে স্থায়িত্ব দেয়, দীপক চ্যাটার্জির গল্পে তার কোনটাই নেই। সে অনেক বেশি অ্যাকশন – নির্ভর। কিন্তু, তারপরেও, মূলত তিনটি কারণে স্বপনকুমার প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে একটা বড় অংশের পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য থেকেছেন।

প্রথমত, কাহিনির নির্মাণ, ঘটনাক্রম সাজানোর পদ্ধতি, অপরাধ এবং অপরাধী নির্ণয়ের কৌশল, সর্বোপরি, গোয়েন্দা ও ভিলেন চরিত্রের উপস্থাপনা পুরোপুরি বাংলা ক্রাইম – কাহিনির প্রথম সারির লেখকদের তৈরি করা ছাঁচের অপেক্ষাকৃত লঘু চেহারা, যাতে অদীক্ষিত পাঠকও মান্য ক্রাইম কাহিনির স্বাদকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সমকালীন সমাজ ও তার একাধিক দেশি – বিদেশি বিনোদন মাধ্যম, বিশেষত হিন্দি – ইংরেজি থ্রিলার সিনেমার দৃশ্যরূপ নিজের লেখায় যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা।

এবং তৃতীয়ত, গোয়েন্দাগল্পের সনাতন রীতি মেনে তিনি যুক্তিবুদ্ধির কাঠামো ধরে না এগিয়ে বহু ক্ষেত্রেই কাহিনির গতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন অযুক্তি বা কুযুক্তির সাপেক্ষে। এই অযুক্তি এলিট পাঠকের কাছে যতটাই বিকর্ষণের কারণ, ঠিক ততটাই আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছিল সমকালীন সাধারণ পাঠকের কাছে, যাদের কাছে কার্যকারণ নয়, বরং ঘটনার ঘনঘটা এবং গল্প বলে যাওয়ার টানটান উত্তেজনাই অনেক বেশি আকর্ষক, ঠিক যেমন বাণিজ্য সফল হিন্দি অথবা বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই,

পঞ্চাশ – ষাট দশকের দেব সাহিত্য কুটিরের পেপারব্যাকের দিন পেরিয়ে ক্রমশই সস্তা নিউজপ্রিন্টে ছাপা চড়াদাগের রংচঙে প্রচ্ছদে ছাপা স্বপনকুমারের চটি বইগুলি মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল পাঠককে।

স্বপনকুমারের সিরিজগুলির মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল *বাজপাখি সিরিজ, ড্রাগন সিরিজ, ক্রাইম ওয়ার্ল্ড সিরিজ, কালনাগিনী সিরিজ এবং কালোনেকড়ে সিরিজ* । মূলত অ্যাকশন – নির্ভর এই কাহিনিগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতে থাকত একজন করে সুন্দরী নারী – দস্যু। তাদের পোশাক, চুলের ছাঁট সবেতেই সেই সময়ের বাজারচলতি জনপ্রিয় হিন্দি অ্যাকশন সিনেমার নায়িকাদের ছাপ।

স্বপনকুমারের একটি গল্পের নাম *দীপক চ্যাটার্জি নিহত* । যদিও সেই গল্পের শেষে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে দীপক। কিন্তু আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাঙালি পাঠকের চৈতন্য থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিতে থাকে স্বপনকুমার। কারণ ততদিনে বিশ্বায়নের দাপটে বাঙালির হাতে রোমাঞ্চিত হবার প্রচুর উপকরণ চলে এসেছে। ইতিমধ্যেই বাংলা সাহিত্যের এলিট গোয়েন্দারা পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হচ্ছেন বড়পর্দায় এবং টেলিভিশনে। তবে সময় পাল্টেছে, সময়ের দাবীতে প্রকাশক বা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ভাবনায় একুশ শতকে আবার নতুন করে ফিরে আসছে দীপক চ্যাটার্জি।

❖

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির দরবারে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (২৩শে মার্চ, ১৯১৬ — ২০শে জানুয়ারী, ১৯৮১) একটি আশ্চর্য নাম, তার কারণ তাঁর রচনাসম্ভারের এবং কর্মকান্ডের বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস রেঙ্গুনের পটভূমিকায় লেখা ইরাবতী ১৯৪৮ সালে *দেশ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। শিশুদের জন্য লেখা বইয়ের মধ্যে

বিখ্যাত হল, *ভয়ের মুখোশ* ও *পাথরের চোখ*। তাঁর রচিত সাহিত্য থেকে বাংলায় অভিসারিকা, অশান্ত ঘূর্ণি, জি টি রোড আর হিন্দিতে মুঠঠি ভর চাউল সিনেমাগুলি তৈরি হয়েছে। শিশুদের জন্য লিখেছেন বহু ছোটোগল্প, রহস্য কাহিনী, ভূতের গল্প, রম্যরচনা এবং উপন্যাস। হরিনারায়ণ বেতার নাটকে অভিনয় করতেন। কৌতুক অভিনেতা ভানু বন্দোপাধ্যায়ের অসংখ্য জনপ্রিয় রম্য নাটক তাঁর লেখা। ১৯৭২ সালে মতিলাল পুরস্কার এবং ১৯৭৬ সালে তারাশঙ্কর পুরস্কারে সম্মানিত হন হরিনারায়ণ। ১৯৪৯ সালের চলচ্চিত্র চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন -এ তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

শিশু-কিশোরদের জন্য বহু লেখালেখি করলেও তিনি যে গুটিকয়েক ডিটেকিটিভ কাহিনি লিখেছিলেন, তা মূলত পরিণত পাঠকদের জন্যেই। তাঁর গোয়েন্দা হলেন পারিজাত বক্সী, যিনি সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর ভাইপো। যদিও, শরদিন্দুবাবুর লেখায় কোথাও কখনও ব্যোমকেশের কোন আত্মীয়ের প্রসঙ্গ আসেনি, তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে পারিজাত বক্সীর জন্ম একেবারে হরিনারায়ণবাবুর মনের কল্পনাভূমিতে।

যাই হোক, পারিজাত কিন্তু একেবারেই তার কাকার মতো নন। তিনি হলেন, যাকে বলে একেবারে হার্ড বয়েলড ডিটেকটিভ। অস্ত্র-শস্ত্র তো তার কাছে আছেই, এছাড়াও প্রয়োজনে প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাতাহাতি, মারামারি করেও পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে তার জুড়ি মেলা ভার। নিজস্ব গাড়ি ও তার চালক সবই তার আছে, যদিও সে নিজেই বেশিরভাগ সময় ড্রাইভ করতে পছন্দ করে। যে কোন তালা খুলে ফেলা তার কাছে নস্যি। কুখ্যাত গুন্ডাদলের লোকজনকেও সে থোড়াই কেয়ার করে, কারণ এসব ক্ষেত্রে তার বিখ্যাত আড়ং ধোলাই বিশেষ কাজে আসে। পুলিশের ওপর মহলের অনেক বাঘা বাঘা কর্তার সাথে পারিজাতের ভালোই যোগাযোগ। নানান প্যাঁচালো কেসের ব্যাপারে তাঁরা প্রায়ই ছুটে আসে পারিজাতের দরজায়।

পারিজাত বক্সীর কাহিনিগুলির মধ্যে -

এক মুঠো হীরে, মৃত্যু - শলাকা, মৃত্যুর ঠিকানা, মৃত্যুদূত, পাথরের চোখ, 'লা', সীমানা ছাড়িয়ে, কাঠের পা, গোয়েন্দা ও প্রেতাত্মা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যের এমন এক শ্রেণীর পাঠক নিশ্চয় আছে, যারা রোমাঞ্চ ও উত্তেজনায় ভরপুর একধরনের কাহিনি পড়তে ভালোবাসেন, যেখানে মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থের সূক্ষ্ম কলাকৌশলের পরিবর্তে মারপিট বা অস্ত্রের ঝনঝনানির ভাগ অনেক বেশি থাকে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের গোয়েন্দাপ্রবর পারিজাত বক্সীর কাহিনিগুলি যেরকম। তবে আমার মনে হয়, বাংলায় এত উচ্চমানের ডিটেকটিভ গল্প লেখা হয়েছে, যেগুলি পাঠকসমাজে বহুকাল ধরে সমাদৃত হয়ে আসছে, তা তাদের ওই 'মগজাস্ত্র'-এর জোরেই।

❖

ব্যোমকেশ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে সফল ও পাঠক মহলে সমাদৃত গোয়েন্দা চরিত্র যে সত্যজিৎ রায়ের (২রা মে, ১৯২১ – ২৩শে এপ্রিল, ১৯৯২) ফেলুদা, এ বিষয়ে বোধহয় সব বাঙালি পাঠকই সহমত হবেন।

সন্দেশ পত্রিকার ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় বেরয় প্রথম ফেলুদা-কাহিনি *ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি* - র প্রথম কিস্তি। তিনটে কিস্তিতে শেষ হয় সেই গল্প। ১৯৬৬ সালের মে থেকে ৬৭-র মে পর্যন্ত একবছর ধরে দ্বিতীয় গল্প *বাদশাহী আংটি* । প্রথম গল্পের হালকা চাল এই কাহিনিতে এসে একেবারে সিরিয়াস। ১৯৬৭-তে *কৈলাশ চৌধুরীর পাথর* - এ

দেখা গেল, গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে ফেলুদা নিজেই একেবারে নিশ্চিত। মক্কেলদের দেবার জন্য নিজের নামে ভিজিটিং কার্ড ছাপালো সে –

'Pradosh C. Mitter, Private Investigator'

সারা পৃথিবী জুড়ে শার্লক হোমসকে নিয়ে যত আলোচনা, লেখালেখি বা গবেষণা-চর্চা হয়েছে, আর কোনো গোয়েন্দা চরিত্রকে নিয়ে সেরকমটা হয়েছে বলে মনে হয় না। ঠিক একইভাবে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ফেলুদাকে নিয়ে যতটা হয়েছে, আর কোনো বাঙালি গোয়েন্দাকে, এমনকি ব্যোমকেশকে নিয়েও ততটা হয়নি। হেমেন্দ্রকুমার রায় বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে যে ত্রিশূল ডিটেকটিভের সূচনা করেছিলেন, সত্যজিৎ রায় সেই আইডিয়াকে শীর্ষে নিয়ে গেলেন ফেলুদা-তোপসে-জটায়ু এই ত্রয়ীর মাধ্যমে।

তোপসে, ফেলুদার খুড়তুতো ভাই, পোশাকি নাম তপেশরঞ্জন মিত্র। যদিও ফেলুদা – কাহিনির শুরুর দিকে তোপসেকে ফেলুদার মাসতুতো ভাই হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে তা বদলানো হয়। তোপসে হলো ফেলুদার সর্বক্ষণের সঙ্গী, সহকারী এবং এই গল্পগুলির কথক। *সোনার কেল্লা* উপন্যাসের শুরুতেই ফেলুদা জ্যামিতি নিয়ে তোপসেকে কিঞ্চিৎ জ্ঞান দেওয়ার পরে তোপসে ফেলুদাকে জিগ্যেস করেছিল, ফেলুদা নিজে কিরকম জ্যামিতিক নকশার মধ্যে পড়ে ? ফেলুদার উত্তর ছিল, 'একটা মেনি পয়েন্টেড স্টার বা জ্যোতিষ্ক বলতে পারিস'। তোপসে নিজেকে এই জ্যোতিষ্কের উপগ্রহ বা তার ভাষায় 'স্যাটেলাইট' ভাবতেই ভালবাসে।

আর লালমোহনবাবু ওরফে জটায়ু হলেন বিখ্যাত রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক এবং এদের বন্ধু। জটায়ুর সঙ্গে ফেলুদা – তোপসের প্রথম সাক্ষাৎ *সোনার কেল্লা* – য়। তোপসের বর্ণনায় –

"...দেখতে অত্যন্ত নিরীহ, রীতিমতো রোগা, আর হাইটে নির্ঘাত আমার চেয়েও অন্তত দু ইঞ্চি কম। আমার তো তাও বয়স মাত্র পনেরো, তাই বাড়ার বয়স যায়নি। ইনি কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ, কাজেই যেমন আছেন তেমনই থাকবেন। ইনি যে বাঙালি সেটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, কারণ বুশ শার্ট আর প্যান্ট থেকে বোঝা খুব শক্ত।"[৫৪]

যদিও, নিজের সমস্ত অপ্রাপ্তি জটায়ু পুষিয়ে নিয়েছেন তাঁর রহস্য – রোমাঞ্চ সিরিজের নায়ক প্রখর রুদ্রের মধ্যে দিয়ে। প্রখর রুদ্রের বর্ণনা স্বয়ং জটায়ুর বয়ানেই শোনা যাক

"...আমার হিরোকেও আমি ছয় করিচি। প্রখর রুদ্র – জানেন তো ? রাশিয়ান নাম – প্রখর, কিন্তু বাঙালিকেও কী রকম মানিয়ে গেছে বলুন ! আসলে নিজে যা হতে পারলুম না, বুঝেছেন, হিরোদের মধ্যে দিয়ে সেই সব আশ মিটিয়ে নিচ্ছি। কম চেষ্টা করিচি মশাই হবার জন্যে ? সেই কলেজে থাকতে চার্লস অ্যাটলাসের বিজ্ঞাপন দেখতুম বিলিতি ম্যাগাজিনে। বুক চিতিয়ে মাস্‌ল ফুলিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী হাতের গুলি, কী বুকের ছাতি, কোমরখানা একেবারে সিংহের মতো। চর্বি নেই এক ফোঁটা সারা শরীরে। মাথা থেকে পা অবধি ঢেউ খেলে গেছে মাস্‌লের। বলছে – এক মাসের মধ্যে আমার মতো চেহারা হয়ে যাবে, আমার সিস্টেম ফলো করে। ওদের দেশে হতে পারে মশাই। বাংলাদেশে ইমপসিবল্। বাপের পয়সা ছিল, কিছু নষ্ট করলুম, লেসন আনালুম, ফলো করলুম – কিস্যু হল না। যেই কে সেই। মামা বললেন – পর্দার রড ধরে ঝুলবি রোজ, দেখবি একমাসের মধ্যে হাইট বেড়ে যাবে। কোথায় একমাস ! ঝুলতে ঝুলতে একদিন মশাই রড সুদ্ধু খসে মাটিতে পড়ে হাঁটুর হাড় ডিসলোকেট হয়ে গেল, অথচ আমি সেই পাঁচ সাড়ে তিন - সেই পাঁচ সাড়ে তিনই রয়ে গেলাম। বুঝলুম, টাগ অফ ওয়ারের দড়ির বদলে আমাকে ধরে টানলেও লম্বা আমি হব না। শেষটায় ভাবলুম – দুত্তোরি, গায়ের মাস্‌লের কথা আর ভাবব না, তার চেয়ে ব্রেনের মাস্‌লের দিকে অ্যাটেনশন দেওয়া যাক। আর মেন্টাল হাইট। শুরু করলাম রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখা। লালমোহন গাঙ্গুলী নাম তো আর চলে না, তাই নিলুম ছদ্মনাম – জটায়ু। ফাইটার। কী ফাইটটা দিয়েছিল রাবণকে বলুন তো !"[৫৫]

প্রসঙ্গত, *সোনার কেল্লা* প্রকাশিত হয় ১৯৭০ – এ। এই উপন্যাসেই জটায়ুর প্রথম আবির্ভাব। এর ঠিক আগের বছর প্রকাশিত হয় *গ্যাংটকে গণ্ডগোল* । সেখানে জটায়ু নেই ঠিকই, কিন্তু সেই উপন্যাসে ফেলুদা – তোপসের সঙ্গী হয়েছেন নিশিকান্ত সরকার বলে এক ব্যক্তি। এই নিশিকান্ত সরকারের সঙ্গে পরবর্তী সময়ের জটায়ু চরিত্রটির অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। *গ্যাংটকে গণ্ডগোল* পড়ে মনে হতেই পারে, জটায়ু চরিত্রের পরিকল্পনা

ওই নিশিকান্ত সরকারের মধ্যে দিয়েই শুরু করে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ। ফেলুদার রহস্যভেদের টানটান উত্তেজনার ফাঁক ফোকরে জটায়ুর নানান মজার কাণ্ডকারখানা এই চরিত্রটিকে পাঠকের কাছে তুমুল জনপ্রিয় করে তুলেছে।

ফেলুদায় ফেরা যাক। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের অঙ্ক আর সংস্কৃতের শিক্ষক জয়কৃষ্ণ মিত্রের পুত্র হল প্রদোষচন্দ্র মিত্র, আমাদের ফেলুদা। ফেলুদার বাবা ছিলেন প্রচন্ড ডানপিটে, দুঃসাহসী আর নামকরা খেলোয়াড়। জ্যাঠামশাই ছিলেন নামকরা ঠুংরী গায়ক। ফেলুদা বংশপরম্পরায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রুচি ও সংস্কৃতিমনস্কতার ধারাবাহিকতা বয়ে নিয়ে চলেছে।

ফেলুদা নিজেও খেলোয়াড়। সবচেয়ে প্রিয় ক্রিকেট। বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে নানান জায়গায় খেলতেও গেছে। খাদ্যরসিক হলেও স্বল্পাহারী। পছন্দ মূলত বাঙালি খাবার। ভাত, সোনামুগের ডাল, পাঁপড়, দই ইত্যাদি। বর্ষাকালে খিচুড়ি আর ডিমভাজা। শীতকালে নলেনগুড়ের সন্দেশ আর মিহিদানা। পছন্দের পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবি, বাইরে গেলে শার্ট আর ট্রাউজার। জলখাবারে চা, ডালমুট সাথে চানাচুর। চায়ের ব্যাপারে ফেলুদার খুঁতখুঁতুনি আছে। কোথাও গেলে সে সঙ্গে করে চায়ের পাতা নিয়ে যায়। নেশা বলতে ধূমপান, চারমিনার ব্র্যান্ডের সিগারেট। আর খাওয়ার পরে পান খাওয়ার অভ্যেস আছে।

একেবারে আটপৌরে মধ্যবিত্ত বাঙালি পারিবারিক প্রেক্ষাপটে ফেলুদাকে রাখা হলেও, যেখানে সে আর পাঁচটা সাধারণ বাঙালি যুবকের থেকে আলাদা হয়ে যায়, তা হল তার উচ্চতায় - ৬ফুট ২ইঞ্চি। চোখের প্রখর দৃষ্টিতে। পর্যবেক্ষণের শক্তিতে, সুগঠিত স্বাস্থ্যে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কারসাজিতে, অদম্য সাহসে আর নাছোড়বান্দা মনোভাবে। তার দু'টি অস্ত্র আছে, একটি আগ্নেয়াস্ত্র, কোল্ট পয়েন্ট থ্রি টু রিভলবার। আর অন্যটি আরও সাংঘাতিক, মগজাস্ত্র।

ছদ্মবেশের আড়ালে নিজের ভোল বদলাতে জুড়ি নেই ফেলুদার। *শেয়াল দেবতা রহস্যে* (প্রথম প্রকাশ 'সন্দেশ'; গ্রীষ্ম সংখ্যা; মে-জুন ১৯৭০) ফেলু বুড়োর ছদ্মবেশ নিয়ে এমনকি নিজের গলার স্বরটা পর্যন্ত পাল্টে ফেলেছিল। *কৈলাশে কেলেংকারি* - তে (প্রথম প্রকাশ 'শারদীয়া দেশ'; ১৯৭৩) বাতিক-বুড়ো বা হিপির ছদ্মবেশে ফেলুকে, জটায়ু কেন তোপসেও চিনতে পারেনি। এই *কৈলাশে কেলেংকারি* উপন্যাসেই জানা যায়, একটা আলাদা সুটকেসে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র সবসময় গুছিয়ে রাখে ফেলুদা। যেমন, ওষুধপত্র, ফার্স্ট এডের সরঞ্জাম, মেক-আপ বক্স, দূরবিন, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, ক্যামেরা, ইস্পাতের স্কেল, অল-পারপাস নাইফ, তালা কোলবার নানারকম সরু তার, রেল-প্লেন-বাসের টাইম টেবল, রোডম্যাপ, দড়ি, হান্টিং বুট ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফেলুদা মনে করে, গোয়েন্দাগিরি করার সুবাদে মানুষের মনের অন্ধকার দিকের সাথে তাকে বেশি মোকাবিলা করতে হয়, কিন্তু সে সবসময় মনের জানলা খুলে রাখে, যাতে বাইরের আলো এসে তাতে পড়ে মনকে তাজা, সজীব রাখতে পারে। ম্যাজিক বা ইনডোর গেমের প্রতি তার যেমন আগ্রহ, তেমনই ভাল বই পড়ার ইচ্ছা কিংবা নতুন দেশে বেড়াতে যাবার সাধ তার চিরকালীন। শখ বলতে দুষ্প্রাপ্য বই আর পুরানো পেন্টিং-এর প্রিন্ট সংগ্রহ। এককালে ডাকটিকিট জমাত।

যদিও ফেলু পেশাদার গোয়েন্দা, তবুও পারিশ্রমিক নিয়ে সে কখনও ভাবে না। নির্লোভ, সৎ এবং সহানুভূতিশীল একজন মানুষ হিসেবে সে যেমন *ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা* - তে (প্রথম প্রকাশ 'শারদীয়া সন্দেশ'; ১৯৭৫) অপরাধীর হাত থেকে উপহার নেবে না বলে এমিল গ্যাবোরিওর বইয়ের সেট অনায়াসে ফিরিয়ে দিয়েছিল, তেমনই আবার *বাক্স রহস্য* (প্রথম প্রকাশ 'শারদীয়া দেশ'; ১৯৭২)-এর মক্কেলের কাছ থেকে নিজে চেয়ে নিয়েছিল শম্ভুচরণের ভ্রমণকাহিনির দুষ্প্রাপ্য পান্ডুলিপি।

শার্লক হোমসকে গোয়েন্দাগিরির গুরু মানে ফেলুদা। একটি কেসের সুবাদে একবার লন্ডনে যেতে হয়েছিল তাকে। ২২১বি, বেকার স্ট্রিটের সামনে দাঁড়িয়ে ফেলুদাকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'গুরু তুমি ছিলে বলেই আমরা আছি'। এই কাহিনি ধরা আছে *লন্ডনে ফেলুদা* (প্রথম প্রকাশ 'শারদীয়া দেশ'; ১৯৮৯) গল্পে। শার্লকের প্রসঙ্গ যখন এল, তখন তার দাদা মাইক্রফট্ হোমসের কথাও না বললে নয়। এই গোয়েন্দাপ্রবরকে নিয়ে লেখা স্যার কোনান ডয়েলের গল্পগুলো পড়লে জানা যায়, এই মাইক্রফট্ শুধু বয়সেই শার্লকের থেকে বড় নয়, সার্বিক অর্থে সে শার্লকের 'দাদা'- ই। নানান সময়ে শার্লককে যেমন ছুটে যেতে হয়েছে মাইক্রফটের কাছে পরামর্শ নিতে বা আলোচনা করতে, ফেলুদারও এরকম একজন 'মাইক্রফট্' ছিলেন। সিধুজ্যাঠা। ফেলুদা - তোপসের গ্রাম-সম্পর্কের জ্যাঠামশাই। তাঁর সর্দার শঙ্কর রোডের বাড়ির বৈঠকখানায় একটা তক্তপোশ, দুটো চেয়ার আর বইয়ে ঠাসা তিনটে ইয়া বড় বড় আলমারি ছাড়া আর কিছু নেই। সেই বৈঠকখানায় বসে বসে তিনি সারাদিন ধরে দেশ-বিদেশের খবর পড়েন, এবং তার থেকে নির্বাচিত কিছু খবর সংগ্রহ করে রাখেন। একবার তিনি কিছু পড়লে আর ভোলেন না। সিধুজ্যাঠার আরেকটা বাতিক হল, একেকটা ইংরাজি শব্দকে বেঁকিয়ে বাংলা করে বলা। যেমন, প্যারাসাইকোলজি হল পাড়া-ছাই-চলো-যাই, একজিবিশন হল ইস্-কী-ভীষণ, ইম্পসিবল হল আম-পচে-বেল, ডিক্শনারি হল দ্যাখস-নাড়ী, গভর্নর হল গোবর-নাড়ু – এই রকম আর কী। কোনো পুরনো বা অদ্ভূত খবরের খোঁজে বা অজানা কোন বিষয়ে জানতে হলে ফেলুদা ছুটে যায় তার এই স্নেহশীল জ্যাঠার কাছে। তোপসের বর্ণনায় –

"সিধু জ্যাঠা থাকেন সর্দার শঙ্কর রোডে। আমাদের তারা রোড থেকে হেঁটে যেতে লাগে পাঁচ মিনিট। এখানে বলে রাখি, সিধু জ্যাঠা জীবনে নানারকম ব্যবসা করে অনেক টাকা রোজগারও করেছেন, আবার অনেক টাকা খুইয়েওছেন। আজকাল আর কাজকর্ম করেন না। বইয়ের ভীষণ শখ, তাই গুচ্ছের বই কেনেন, কিছুটা সময় সেগুলো পড়েন, বাকি সময়টা একা একা বই দেখে দাবা খেলেন, আর খাওয়া নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেন। এক্সপেরিমেন্টটা হচ্ছে এক খাবারের সঙ্গে আরেক খাবার মিশিয়ে খাওয়া। উনি বলেন দইয়ের সঙ্গে অমলেট মেখে খেতে নাকি অমৃতের মতো লাগে। আসলে সম্পর্কে আমাদের কিছুই হন না উনি। আমাদের যে পৈতৃক গ্রাম (আমি যাইনি কক্ষনও) উনি সে গ্রামেরই লোক, আর আমাদের বাড়ির পাশেই ওঁর বাড়ি ছিল। উনি তাই আমার বাবার দাদা আর আমার জ্যাঠামশাই।"[৫৬]

প্রসঙ্গত, ফেলুদার মধ্যে কোথাও তার স্রষ্টা যে মিশে রয়েছেন, সে কথা পাঠক হিসেবে আমাদের বারবারই মনে হয়েছে। যেমন ধরা যাক, *ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি* থেকে *বাদশাহী আংটি* পর্যন্ত সত্যজিতের আঁকা সমস্ত ইলাস্ট্রেশন খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, যে, তখনও ফেলুর মুখে বেশ একটা সারল্যের ছাপ, মাথার চুল এলোমেলো, পোশাক পরিচ্ছদও ততটা ধোপদুরস্ত নয়। কিন্তু *গ্যাংটকে গণ্ডগোল* থেকেই ফেলু অন্যরকম। কথাবার্তা চোস্ত, পোশাকেও যত্নের ছাপ। সম্ভবত, এই সময় থেকেই সত্যজিৎ নিজের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য মিশিয়ে দিতে থাকলেন ফেলুদার চরিত্রের মধ্যে। সৃষ্টির মধ্যে আবছা ফুটে উঠতে থাকে স্রষ্টার অনেক অভ্যেস, পছন্দ, অপছন্দ। *গ্যাংটকে গণ্ডগোল* উপন্যাসেই প্রথম ম্যাচিওর্ড ফেলুকে পাওয়া যায়। কারণ ওই উপন্যাসটিই প্রথম *সন্দেশ* পত্রিকার খুদে পাঠকের গণ্ডি ছাড়িয়ে *দেশ* পত্রিকার সব বয়সী সাধারণ পাঠকের দরবারে এসে পড়ে। এর পরবর্তী কাহিনিগুলিতে সত্যজিতের কিছু ব্যক্তিগত লক্ষণও ফেলুদার মধ্যে ফুটে উঠতে থাকে। প্রথমেই আসে উচ্চতা। সত্যজিৎ ছিলেন ছ' ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি, ফেলুদা ছ' ফুট দুই। ফেলুর দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর, চোখদুটো ঝকঝকে। সত্যজিতের দৃষ্টিও ছিল প্রখর, গভীর ব্যক্তিত্ব। সরাসরি ওঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলার মত মানুষ খুব কমই ছিল। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখটা বড় রাখতেন সত্যজিৎ, ফেলুদাও তাই।

ফেলুর সবচেয়ে পছন্দের পোশাক ট্রাউজার্স আর শার্ট। সত্যজিৎ-ও এই পোশাকের কম্বিনেশনটি অত্যন্ত পছন্দ করতেন। শীতকাল হলে তার ওপরেই চাপাতেন হালকা জ্যাকেট। বহু ইলাস্ট্রেশনে ফেলুদাকেও একই পোশাকে দেখা গেছে। এবং সেই জ্যাকেটের ধাঁচও অনেকটা রায় মশাইয়ের মতোই।

উৎসবে অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ ছিলেন খাঁটি বাঙালি। পরতেন ধুতি পাঞ্জাবি। *গোলাপী মুক্ত রহস্য* – এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল ফেলুদাকে। সেই অনুষ্ঠানে ধুতি – পাঞ্জাবি পরেছিল ফেলুদা। তোপসের কথায় তাকে না কি দিব্যি মানিয়েও গিয়েছিল।

সত্যজিৎ অত্যন্ত ঠান্ডা মেজাজের মানুষ ছিলেন, তাঁকে কোনদিন সেভাবে রেগে যেতে তাঁর বাড়ির লোকেরাও দেখেনি। পুত্র সন্দীপ রায়ের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়,

শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন শিল্পী নন্দলাল বসুর মানসিক স্থৈর্য সত্যজিতের ওপরে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ঠিক একইভাবে, বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ফেলুদার মাথাও অত্যন্ত ঠান্ডা। চট করে সে রাগে না। ভয়ানক বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও তার মগজাস্ত্রের ধার কমে না।

সত্যজিতের পড়াশোনার পরিধি নিয়ে আমরা বহু লেখা পড়েছি। তাঁর পড়াশোনার বিষয়ের বৈচিত্র্য যে ঠিক কতটা ছিল, সেটা তাঁর পড়ার ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায়। দেশি – বিদেশি পত্র পত্রিকা যেমন ছিল, তেমনই ছিল নানান বিষয়ের বই। ফেলুদার পড়ার পরিসরও নেহাৎ মন্দ নয়। ফেলুদাকে এমন অনেক পত্রিকার নাম উল্লেখ করতে দেখা যায়, যেগুলি আসলে থাকত সত্যজিতের পড়ার টেবিলে।

কোনও জায়গায় যাওয়ার আগে সেই জায়গাটা সম্বন্ধে পড়াশোনা করে নেওয়ার অভ্যেস আছে ফেলুর। এবং কোন জায়গা ভাল করে চিনতে চাইলে হেঁটে ঘুরতে ভালবাসে সে। আসলে সত্যজিতও ঠিক এটাই করতেন। ফেলুদা – কাহিনিকে সঙ্গী করে দিব্যি কোন জায়গা থেকে ঘুরে আসা খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার। দেশ বিদেশের যেসব জায়গা থেকে সত্যজিৎ সশরীরে ঘুরে এসেছেন, বেশিরভাগ সময়ে সেইসব জায়গাই হয়ে উঠেছে ফেলু – কাহিনির পটভূমি।

সন্দীপ রায়ের লেখা থেকে জানা যায়, টাকাপয়সার ব্যাপারে চিরকালই উদাসীন ছিলেন সত্যজিৎ। একজন শিল্পী হিসেবে যেটুকু মানসিক তৃপ্তি, সেটাই সব ছিল তাঁর কাছে। কাজের বিনিময়ে পয়সাকড়ি কী পাওয়া গেল, তা নিয়ে কোনদিনই মাথা ঘামাননি। ফেলুদাও টাকা – পয়সার ব্যাপারে নির্লোভ। শুধু নিজের কাজ নিয়েই পরিতৃপ্ত। প্রথম দিকের কেসগুলোতে তার দক্ষিণা হাস্যকর রকমের কম। *হত্যাপুরী* উপন্যাসে তোপসের মুখে তো আমরা শুনেছি, কেস জমাটি হলে রোজগার হল কি না হল সেটা ফেলুদা ভুলেই যায়।

ফেলুদা-কাহিনিগুলি লেখা হয়েছিল মূলত শিশু-কিশোর পত্রিকা সন্দেশ - এর পাঠকদের কথা মাথায় রেখে। এই গল্প-উপন্যাসগুলির কথকও একজন কিশোর, ফেলুর খুড়তুতো ভাই তোপসে। যাতে সহজেই এই পত্রিকার পাঠক-পাঠিকারা তার সাথে নিজেদের একাত্ম করতে পারে, এবং ফেলুদার মতো একজন আদর্শ মানুষকে সামনে রেখে নিজেদের জীবনটা গড়ে তুলতে পারে। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যে যে জরুরি বিষয়গুলির প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে সত্যজিৎ মনে করতেন, তা সবই রয়েছে ফেলুদা-কাহিনিগুলির পাতায় পাতায়। যেমন, বিভিন্ন বিষয়ে বই পড়ার অভ্যেস, সকালে উঠে যোগ-ব্যায়াম করা, কোথাও বেড়াতে যাওয়ার আগে সেই জায়গার খুঁটিনাটি সম্পর্কে ভালো করে পড়াশোনা করা এবং সেখানে গিয়ে পায়ে হেঁটে যায়গাটা দেখা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফেলুদার কাহিনিগুলি আরেকটি কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি, সত্যজিৎ নিজেও বেড়াতে ভালবাসতেন। চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজেও তাঁকে দেশ-বিদেশ বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। ফেলুদার গল্পগুলিকে তিনি এমন প্রেক্ষাপটে নিয়ে গিয়ে ফেলেছেন, যে প্রায় প্রত্যেকটি ফেলুদা-কাহিনিই গোয়েন্দা গল্পের পাশাপাশি লেখকের আশ্চর্য কলমে একেকটি সুখপাঠ্য ভ্রমণকাহিনিও হয়ে উঠেছে। দার্জিলিং, কাটমান্ডু, বেনারস, সিমলা, বম্বে, রাজস্থান, পুরী, লখনউ, গ্যাংটক, কাশ্মীর এমনকি লন্ডন বা হংকং-ও তাদের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ সমেত সেইসব কাহিনির একেকটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। সত্যজিতের গোয়েন্দা গল্পে এ এক পরম পাওয়া, যেরকমটা সম্ভবত বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নেই।

ফেলুদা – কাহিনিগুলির পত্রিকা প্রকাশের কালানুক্রমিক তালিকা –

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি (সন্দেশ, ১৯৬৫), বাদশাহী আংটি (সন্দেশ, ১৯৬৬), কৈলাশ চৌধুরীর পাথর (সন্দেশ, ১৯৬৭), শেয়াল – দেবতা রহস্য (সন্দেশ, ১৯৭০), গ্যাংটকে গণ্ডগোল (শারদীয়া দেশ, ১৯৭০), সোনার কেল্লা (শারদীয়া দেশ, ১৯৭১), বাক্স রহস্য

(শারদীয়া দেশ, ১৯৭২), কৈলাসে কেলেঙ্কারি (শারদীয়া দেশ, ১৯৭৩), সমাদ্দারের চাবি (শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৭৩), রয়েল বেঙ্গল রহস্য (শারদীয়া দেশ, ১৯৭৪), ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা (শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৭৫), জয় বাবা ফেলুনাথ (শারদীয়া দেশ, ১৯৭৫), বোম্বাইয়ের বোম্বেটে (শারদীয়া দেশ, ১৯৭৬), গোঁসাইপুর সরগরম (শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৭৬), গোরস্থানে সাবধান (শারদীয়া দেশ, ১৯৭৭), ছিন্নমস্তার অভিশাপ (শারদীয়া দেশ, ১৯৭৮), হত্যাপুরী (শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৭৯), গোলোকধাম রহস্য (শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৮০), যত কাণ্ড কাটমাণ্ডুতে (শারদীয়া দেশ, ১৯৮০), নেপোলিয়নের চিঠি (শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৮১), টিনটোরেটোর যীশু (শারদীয়া দেশ, ১৯৮২), অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য (আনন্দমেলা, ১৯৮৩), জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা (শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৮৩), এবার কাণ্ড কেদারনাথে (শারদীয়া দেশ, ১৯৮৪), বোসপুকুরে খুনখারাপি (শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৮৫), দার্জিলিং জমজমাট (শারদীয়া দেশ, ১৯৮৬), অপ্সরা থিয়েটারের মামলা (শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৮৭), ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর (শারদীয়া দেশ, ১৯৮৭), শকুন্তলার কণ্ঠহার (শারদীয়া দেশ, ১৯৮৮), লন্ডনে ফেলুদা (শারদীয়া দেশ, ১৯৮৯), গোলাপী মুক্তো রহস্য (শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৮৯), ডা. মুনসীর ডায়রি (শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৯০), নয়ন রহস্য (শারদীয়া দেশ, ১৯৯০), রবার্টসনের রুবি (শারদীয়া দেশ, ১৯৯২), ইন্দ্রজাল রহস্য (সন্দেশ, ডিসেম্বর' ৯৫ থেকে ফেব্রুয়ারি'৯৬), ফেলুদা (অসমাপ্ত; শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৯৫), তোতা রহস্য (অসমাপ্ত; শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৯৬), আদিত্য বর্ধনের আবিষ্কার (অসমাপ্ত; শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৯৭)।

❖

বিখ্যাত বাংলা ক্রাইম পত্রিকা *রোমাঞ্চ* - র পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল কামাক্ষীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৯১৭-১৯৭৫) গোয়েন্দা অনুকূল বর্মাকে নিয়ে লেখা গল্প *অকল্পনীয় অনুকূল বর্মা* । দে'জ প্রকাশিত *অনুকূল বর্মা, ডিটেকটিভ* (জানুয়ারি, ১৯৯৪) *জাল* নামক একটি উপন্যাসের সাথে সংকলিত হয় আরও চারটি বড় গল্প – *ঘটকি লাগালেন অনুকূল*

বর্মা, স্বামীজি আর অনুকূল বর্মা, সাপ ধরলেন অনুকূল বর্মা, অনুকূল বর্মার ঘটকালি আর কোকেন। এই গল্পগুলিও প্রথমে প্রকাশ পায় *রোমাঞ্চ* - তে।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ অনুকূল মধ্যবয়স্ক, বিয়ে থা করেননি, ছোটখাটো মানুষ, চেহারা একটু মোটার দিকে।

মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, তার মধ্যে দু-এক গাছি পাকা।

কটা চোখের চাহনি ধারালো, চলাফেরায় দ্রুতগতি।

নিজে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী বলে ধরে নেন না।

অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি। থট-রিডিং জানেন।

শুধু কলকাতাতেই নয়, সারা ভারতেই গোয়েন্দাগিরিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

কলকাতায় নিজস্ব বসতবাড়ি এবং অফিস। অফিসের রক্ষণাবেক্ষণ ও গোয়েন্দাগিরির কাজে সহযোগিতা করে থাকে অনুকূলের ভাইঝি, মাধুরী।

খবর দেওয়া নেওইয়ার কাজটা মূলত করে চাকর পঞ্চা। এছাড়াও, যেমন সমাজের ওপর মহলের অনেক হোমরাচোমরাদের সাথে অনুকূলের আলাপ, তেমনই অনেক চোর-ছ্যাঁচড়দের সাথে তাকে যোগাযোগ রেখে চলতে দেখা গেছে।

তবে মানবিক একখানি স্বভাব আছে তাঁর, বহু সময় অপরাধীদের জীবনের কাহিনি শুনে তাদের শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন তিনি।

যেমন ধরা যাক -

'ঘটকি লাগালেন অনুকূল বর্মা' গল্প শুরু হয় কুকুর চুরির ঘটনা দিয়ে। এক বড়োলোকের পোষা কুকুর চুরি হয়ে যায় বিকেলবেলা পার্কে বেড়াতে গিয়ে। পরে জানা যায়, একইরকম ভাবে অন্যান্য বেশ কয়েকজন বড়লোকের কুকুর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরে জানা যায় সেগুলি অপহরণের ঘটনা। কারণ, কুকুরদের যথাযথভাবে ফেরৎ পাওয়া

যাবে তখনই, যখন নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে, অন্যথায় পাওয়া যাবে সেই কুকুরের মৃতদেহ। ডিটেকটিভ অনুকূল বর্মা সেই রহস্যের সমাধান করেন। এবং সেই সাথে পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয় আরেকটা ছবি। তিন বোন। কমলা, চপলা আর উৎপলা। উৎপলা অসুস্থ। তার চিকিৎসার অর্থ জোগাড় করার উদ্দেশ্যে কমলা তাদের পোষা কুকুরকে দিয়ে বড়োলোকের বাড়ির আদরের কুকুরদের চুরি করায়। আর দাবি মতো টাকা দিয়ে দিলেই হারিয়ে যাওয়া কুকুর ফেরত পাওয়া যাবে বলে গলা নকল করে টেলিফোনে জানিয়ে দেয়। অনুকূল বর্মা যখন কমলাকে চিহ্নিত করে ফেলেন, তখন সে বলে –

"এইসব নিষ্কর্মা বড়োলোকদের বৌরা কুকুর পোষে আর আমাদের মতো মেয়েদের সঙ্গিনী হিশেবে চাকরি দেয়। বলে কম্প্যানিয়ন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে তা ঝিদেরও বেহদ্দ। কথায় কথায় দাঁত খিঁচোয়, গালাগালি দেয়। মনে হয়, তারা কুকুর পুষে যে-রকম আনন্দ পায়, আমাদের গালি-গালাজ ক'রে তার চেয়ে কম আনন্দ পায় না।"[৫৭]

এই ধরণের ধনী পরিবারের নিষ্কর্মা, দাম্ভিক, খামখেয়ালি, অপদার্থ নিষ্ঠুর বৌরা তাদের স্বামীর অসৎ পথে উপার্জিত অর্থ দু-হাতে খরচ করতে কখনও কার্পন্য করে না, অথচ নিম্নবিত্ত পরিবারের সাধারণ অথচ শিক্ষিত মেয়েরা পরিস্থিতির শিকার হয়ে সামান্য অর্থের বিনিময়ে এইসব বড়লোক বাড়িতে নানান কাজে যুক্ত হয়, যেখানে তারা ন্যুনতম সম্মানটুকুও পায় না। তাই এই গল্পের কমলা ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে মুক্তিপন আদায় করার কৌশলের মধ্যে কোন অপরাধ আছে বলে মনে করে না। কথাটা অনুকূল বর্মা শোনেন, আর তার কাছ থেকে শোনেন পাঠকসমাজ। আসলে ডিটেকটিভ অনুকূল বর্মার চোখ দিয়ে লেখক কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আমাদের চারপাশের সমাজটার দিকে আঙুল তোলেন। এই গল্পের অপরাধী কমলার প্রতি পাঠকের বিন্দুমাত্র রাগ হয় না, বরং সহানুভূতি জাগে। মনে মনে নিশ্চয়ই তারা বলে, কমলা তার কুকুরকে কাজে লাগিয়ে অসুস্থ বোনের চিকিৎসার জন্য টাকা জোগাড় করে ঠিকই করেছে। অন্যায় কিছু করেনি।

কামাক্ষীপ্রসাদ গোয়েন্দা অনুকূল বর্মাকে নিয়ে বেশ কিছু লেখালেখি করলেও, পাঠকসমাজে তা তেমন সমাদর পায়নি। বর্তমান প্রজন্মের ক'জন পাঠকই বা এই গোয়েন্দার খোঁজ রাখেন, বলা মুশকিল।

❖

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে সিবিআই-এর দপ্তর এনে হাজির করেছিলেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সিবিআই, অর্থাৎ চারুচন্দ্র ভাদুড়ি ইনভেস্টিগেশন। চারু ভাদুড়ি, যিনি ভাদুড়িমশাই নামে বেশি পরিচিত, বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বর্ষীয়ান গোয়েন্দা। সত্তরেও সতেরোর মতো তরতাজা। তাঁকে নিয়ে নীরেন্দ্রনাথের রহস্য কাহিনির সংখ্যাও সতেরো !

চল্লিশের দশকে ইনস্যুরেন্স কোম্পানির বড় চাকুরে চারু ভাদুড়ি পরবর্তীকালে গড়ে তুলেছেন তাঁর মস্ত বড় ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি – সি বি আই অর্থাৎ চারু ভাদুড়ি ইনভেস্টিগেশন। ব্যাঙ্গালোরে তার হেড অফিস আর সারা দেশ জুরে তার শাখা অফিস ছড়ানো। নিজের দক্ষতায় সরকারি – বেসরকারি সমস্ত প্রশাসনিক স্তরে সুনাম অর্জন করেছেন তিনি। ভাদুড়িমশাই-এর এই রহস্য - অভিযানের সঙ্গীসাথী বলতে ভাগ্নে কৌশিক, পরম বন্ধু সাংবাদিক কিরণ চাটুজ্জ্যে আর বছর বাহাত্তরের সদাহাস্যময় 'যুবক' সদানন্দবাবু।

স্মৃতিকণা চক্রবর্তী একটি প্রবন্ধে সঠিক অনুধাবন করেছেন –

“প্রখর বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি, বলশালী, পরিবেশের সঙ্গে মিশে যাওয়ার অসাধারণ গুণ, আকর্ষক ঋজু ব্যক্তিত্ব, অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা, সর্বোপরি বিস্তৃত জীবন-অভিজ্ঞতা – এই সবের অনন্য মিশেলে নীরেন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন তাঁর প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর চারুচন্দ্র ভাদুড়িকে। বাংলা রহস্যগল্পের জগৎ তখন অনেকটাই খালি। ’৬৮তে গত হয়েছেন নীহাররঞ্জন, ’৭০-এ শরদিন্দু। সেই ফাঁক ভরাতে প্রথমে ফেলুদা, তারপর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু (মূলত কিশোর সাহিত্য) এবং তারপরই চারু ভাদুড়ি বা ভাদুড়ি মশাই। নিছক বয়েস দিয়ে যে কর্মদক্ষতার পরিমাপ করা যায় না, ৯০-এর দশকে প্রৌঢ় ঔপন্যাসিক যেন সেটা প্রমাণ করতেই প্রথার বিপরীতে হাঁটলেন।

...চারু ভাদুড়ির আড়ালের আসল মানুষটিকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন লেখক। আর কিরণ চাটুজ্জের আড়ালে যে স্বয়ং তিনি – এ কথা আড়াল করার চেষ্টাও তিনি করেননি। সুতরাং বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কিছুটা কল্পনার মিশেলে গড়ে উঠেছিল ভাদুড়ি-কাহিনি। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, খেলাধূলা – কী নেই গল্পের ভাঁজে ভাঁজে। বিশ্বের তাবৎ বিষয়ে নীরেন্দ্রনাথের সাংবাদিক-সুলভ জিজ্ঞাসা বাসা বেধেছে কাহিনির অন্দরে। আর এ ভাবেই গল্পগুলোর মধ্যে মিশেছে নানা নীরেন্দ্রনাথের গভীর জ্ঞান, যা কাহিনির ভার না বাড়িয়ে ধার বাড়িয়েছে। দুঃখ একটাই, ব্যোমকেশ বা ফেলুদার মতো জনপ্রিয় চরিত্র হয়ে উঠতে পারলেন না ভাদুড়িমশাই।”[৫৮]

ভাদুড়িমশাইকে নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে –

মুকুন্দপুরের মনসা, চশমার আড়ালে, পাহাড়ি বিছে, বিগ্রহের চোখ, রাত তখন তিনটে, শ্যামনিবাস রহস্য, বিষাণগড়ের সোনা, লকারের চাবি, বরফ যখন গলে, ভুতুড়ে ফুটবল ইত্যাদি।

❖

অদ্রীশ বর্ধনের (১৯৩২ - ২০১৯) লেখা বহু গোয়েন্দা কাহিনির নায়ক ইন্দ্রনাথ রুদ্র। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা *আশ্চর্য* এবং *ফ্যানটাস্টিক* – এর পাতায় পাতায়, বাংলা সাহিত্যে

কল্পবিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করেছেন অদ্রীশ বর্ধন। এছাড়াও, শার্লক হোমসের কাহিনির প্রথম সঠিক এবং সিরিয়াস অনুবাদকও তিনি। ইন্দ্রনাথ রুদ্র ছাড়াও অদ্রীশ বর্ধন আরও কয়েকটি চরিত্রকে নিয়ে গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছেন। তারা হল – রাজা কঙ্ক, গোয়েন্দানি নারায়ণী, জিরো জিরো গজানন, ফাদার ঘনশ্যাম প্রমুখ। কিন্তু এই চরিত্রগুলি ইন্দ্রনাথের মত জনপ্রিয় হতে পারেনি। লেখকের নিজের পরমপ্রিয় চরিত্রও ইন্দ্রনাথ, কারণ, সে না কি তাঁরই মনের প্রতিচ্ছবি।

অবিবাহিত ইন্দ্রনাথ একাই থাকে তার বেলেঘাটার বাড়িতে। পেশায় ইন্দ্রনাথ প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তা সত্ত্বেও সে দিব্যি ফিটফাট, শৌখিন মানুষ। প্রিয় পোশাক ধুতি – পাঞ্জাবি বললে কম বলা হয়। আরও সূক্ষ্মভাবে বললে, পাঞ্জাবি হতে হবে দামি সিল্কের বা তসর বা মুগার, আর ধুতি হবে চুনোট করা ধাক্কা – পাড়ের, যার কোঁচা থাকবে পাঞ্জাবির পকেটে গোঁজা। প্রবল দৈহিক শক্তির অধিকারী ইন্দ্রনাথের অবয়ব যেন ইতালিয়ান মার্বেলে খোদাই করা গ্রিক ভাস্কর্য। দীর্ঘ উচ্চতা, ধারালো নাক – মুখ, সরু গোঁফ আর ফর্সা দেহবর্ণ নারীদের কাছে প্রবল আকর্ষণের ব্যাপার। বহু মার্কামারা সুন্দরী উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে ইন্দ্রনাথের সঙ্গ পাওয়ার আশায়। তদন্তের স্বার্থে সেই রমণীমোহন অবতারকে কাজে লাগালেও ইন্দ্রনাথের মন কিন্তু বরাবরই আবেগহীন।

এহেন ইন্দ্রনাথের নেশা বলতে সিগারেট এবং কখনও সখনও নস্যি ! আর সেই সঙ্গে নিয়মিত শরীরচর্চা। অবসর কাটে বই পড়ে। ইন্দ্রনাথের বহু কাণ্ড কারখানার কথক তার প্রিয় বন্ধু মৃগাঙ্ক। মৃগাঙ্ক রায়।

মৃগাঙ্ক সাহিত্যিক। ব্যোমকেশের বন্ধু অজিত এবং ফেলুদার বন্ধু লালমোহনবাবু ওরফে জটায়ুর পর এই একজন গোয়েন্দার সাহিত্যিক – সহকারী পাওয়া গেল। ইন্দ্রনাথ মৃগাঙ্ককে ডাকে 'মৃগ' বলে। মৃগাঙ্কের স্ত্রী কবিতা ইন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু, গুণগ্রাহী এবং অভিভাবক। এই দলটির আরেক বন্ধু পুলিশ অফিসার জয়ন্ত। গোয়েন্দা কাহিনির অমোঘ নিয়মে জয়ন্তকে প্রায়ই ইন্দ্রনাথের সাহায্য নিতে হয়, ফলশ্রুতিতে সুনাম বাড়ে ইন্দ্রনাথের।

অপরাধকে কখনই প্রশ্রয় দেয় না ইন্দ্রনাথ। কিন্তু অনেক সময়ই কার্য - কারণ – পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তদন্তের শেষে এসে অপরাধীর প্রতি সহমর্মিতা বোধ করে সে। আজ পর্যন্ত প্রায় কোন কেসেই ইন্দ্রনাথ ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু সাফল্য সবসময় তাকে সন্তুষ্টি দিতে পারেনি।

গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথকে নিয়ে অদ্রীশ বর্ধনের লেখা উল্লেখযোগ্য কাহিনিগুলি হল –

যখন কিডন্যাপার, চিনেমাটির ফুলদানি, সুমি ! সুমি !, বেদনা বিচার চায়, একটি গোয়েন্দা কাহিনী, খরগোশ খাঁচা রহস্য, নায়াগ্রা, স্যালমন সাহেবের সিন্দুক লুঠ, নেপথ্য কৌশল ইত্যাদি।

❖

রহস্য সমগ্র বইটির ভূমিকাতে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (জন্ম - ১৯৩৫) লিখেছেন -

"ব্যোমকেশ বা ফেলুদার কাহিনি দীর্ঘকাল বাঙালি পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে, তবে প্রাইভেট গোয়েন্দা ব্যাপারটা বাস্তবে প্রায় নেই বলা চলে। অন্তত তারা কোনও খুন বা অপরাধের তদন্ত করার অধিকারী নয়। তারা বন্দুক পিস্তলও যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে না। তাই আমি যখন আনন্দবাজার সংস্থার শারদীয় পত্রিকাতে লেখার জন্য আহূত হই তখন শবর দাশগুপ্ত নামক একটি গোয়েন্দাকে সৃষ্টি করি। শবর লালবাজারের গোয়েন্দা। খুব লম্বা-চওড়া নয়, কিন্তু প্রবল শক্তিমান এবং সম্পূর্ণ ভয়ডরহীন। আমি ইচ্ছে করেই শবরকে সবরকম মানুষী দুর্বলতা থেকে মুক্ত করেছি। সে মদ খায় না, ধূমপান করে না, কোনও প্রেম ভালবাসা বা পরিবারও নেই। কিন্তু সে মোটেই নিষ্ঠুর নয় এবং প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ককেও সে সম্মান করে, উপরন্তু অপরাধীর প্রতিও সে নির্মম নয়। তাকে নিয়ে লেখা প্রথম উপন্যাস *ঋণ*-এ যখন খুনি তার হাতে ধরা পড়ল তখন সে বলেছিল, 'তুমি তো পালাতে পারতে ! পালালে না

কেন ?' ...শবর গোয়েন্দা বটে, সেই সঙ্গে একজন সংবেদনশীল মানুষও। শবরের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক হয়তো পুলিশের মতো নয়। অপরাধীকে সে শুধু অপরাধের নিরিখেই বিচার করতে চায় না কখনও। তার পাথুরে চরিত্র, নির্বিকার হাবভাব এবং আবেগহীন আচরণ দেখে বোঝা যায় না যে, আসলে লোকটা কতখানি সংবেদনশীল। ...শবর যখন জেরা করে তখন সেটাকে জেরা বলে মনে হয় না। খুব বন্ধুর মতই কথা বলে সে, সহানুভূতির সঙ্গে, কিন্তু আলাপচারিতার ভিতর দিয়েই একটু একটু সত্যের প্রকাশ ঘটে। ...শবর অন্য সব গোয়েন্দাদের মতো নয়। বাইরের মোড়কে সে খানিকটা রোবট, খানিকটা পাথর, বাহ্যত তার কোনও ঘটনাতেই কোনও লক্ষ্যণীয় প্রতিক্রিয়া হয় না। ভয় নেই, চমকানো নেই, বিস্ময়ও নেই, সে যেন সর্বদাই সব ঘটনার জন্য প্রস্তুত।"[৫৯]

শবর-কাহিনিগুলি মূলত কথোপকথনের ঢঙে লিখেছেন শীর্ষেন্দু। ফলে খুব বেশি বর্ণনার অবকাশ লেখক সেখানে রাখেননি। শবর চরিত্র সম্পর্কেও ওই গল্পের মাঝে মাঝে ছোট ছোট কিছু তথ্য দিয়ে চলে গেছেন। যেমন, *সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে* (প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৯৭) গল্পে শীর্ষেন্দু বলছেন -

"শবরের কণ্ঠ ফোনে ভারী আকর্ষণীয় শোনায়। শবর দাশগুপ্ত খুব লম্বা চওড়া লোক নয়। তেমন সাজগোজও নেই। পুলিশের ইউনিফর্মের বদলে গায়ে সাদামাটা একটা হাওয়াই শার্ট আর কালো ট্রাউজার। চোখ দু'খানা ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ। লোকটাকে দেখলে একটু যেন অস্বস্তি হয়।"[৬০]

প্রজাপতির মৃত্যু ও পুনর্জন্ম (প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৯৮) গল্পে জানা যায়, মহিলাদের ব্যাপারে শবর একটু অনভিজ্ঞ। ফ্যামিলি লাইফকে সে একটু ভয়ই পায়। সহকর্মী ঘোষালকে কথায় কথায় সে জানায়, তার এরকম থাকতেই ভাল লাগে।

"সিঙ্গল, অ্যাকটিভ, ফ্রি।"[৬১]

প্রথম শবর-কাহিনি *ঋণ*-এ (প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, ১৯৯৫) শবর নিজের নাম নিয়ে মজা করে বলেছিল –

"যতদূর জানি শবর মানে ব্যাধ। একদিক দিয়ে আমার নামটা খুবই সার্থক। ব্যাধ মানে শিকারি তো ? আমিও একজন ভাল শিকারি। আমার শিকার অবশ্য ক্রিমিনালরা। আই ক্যান অলওয়েজ স্মেল এ রটন র‍্যাট।"[৬২]

শবরের চরিত্রে খুব স্পষ্ট দু'টো বিভাজন আছে। কিরকম, তা দু'টো উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। *সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে* গল্পে শবরের একজন সহকর্মী ঘোষাল। তিনি একজন সৎ, দক্ষ পুলিশ অফিসার হওয়া সত্ত্বেও অন্ধ পুত্রস্নেহে দুর্বল হয়ে একটা দুর্নীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। এবং তাকে জেরা করার ভার পড়ে শবরের উপর। ঘোষালের সাসপেনশন অবধারিত এটা বুঝতে পেরে শবরের মন খারাপ হয়। ঘোষালকে শবর বলে, আপনি যা করেছেন তাতে ভবিষ্যতে আপনার ছেলেও আপনাকে শ্রদ্ধা করবে না। কাওয়ার্ডরা শ্রদ্ধা পায় না ঘোষালবাবু। ঘোষালের আনস্টেবল অবস্থা দেখে শবর বেশ চিন্তিত হয়। ঘোষাল বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে শবর অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। তাকে মরাল সাপোর্ট দেয়। এবং শেষ পর্যন্ত তার চাকরি চলে যাওয়াটা আটকায়।

আবার *প্রজাপতির মৃত্যু ও পুনর্জন্ম* গল্পে, খুনী হাবুকে শবর বলে,

"কনফেস করলে তোমার সাজা হবে। যদি বাইচান্স তুমি ছাড়া পেয়ে যাও তা হলেও আমার হাত থেকে বাঁচবে না। আর কনফেস যদি না করো তা হলেও বাঁচবে না। আমি তোমাকে মারবই। ...যাই করো, আমার হাত থেকে রেহাই নেই। শুনে রাখো, আমার চেয়ে বড়ো গুন্ডা এখনও জন্মায়নি।"[৬৩]

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় *আনন্দবাজার পত্রিকা* - র শারদীয় সংখ্যায় পাতায় প্রথম শবর চরিত্রটির অবতারণা করেন। প্রথম শবর উপন্যাস ঋণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আনন্দ

পাবলিশার্স থেকে ১৯৯৫ সালে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সাময়িক পত্রের পাতায় শবর – কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে –

আলোয় ছায়ায় (১৯৯৭), সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে (১৯৯৭), প্রজাপতির মৃত্যু ও পুনর্জন্ম (১৯৯৮), পদক্ষেপ, রূপ, মারীচ, ঈগলের চোখ, আমাকে বিয়ে করবেন ?, তীরন্দাজ ইত্যাদি।

আনন্দ পাবলিশার্স *রহস্য সমগ্র* নাম দিয়ে পরে শবর দাশগুপ্তের সমস্ত কাহিনি একত্রে প্রকাশ করেছে।

******

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর ব্রহ্মকে নিয়ে কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন, কিন্তু এই চরিত্রটি জনপ্রিয়তার নিরিখে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেনি।

******

গোয়েন্দা-পুলিশ ইন্দ্রজিৎ রায়কে নিয়ে উপন্যাস লিখতেন দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ইন্দ্রজিৎকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে প্রশিক্ষণ নিতে পাঠানো হয়েছিল ডিটেকটিভ

ডিপার্টমেন্ট থেকে। ইন্দ্রজিতের চিরশত্রু ব্ল্যাক ডায়মন্ডের সাথে তার দ্বৈরথের কাহিনি পরবর্তীকালে নারায়ণ দেবনাথের তুলিতে কমিকস হয়েও প্রকাশিত হয়েছে।

❖

সরকারি পুলিশ বিভাগের তুখোড় কর্মচারীদের কর্মকান্ড দিয়ে শুরু হয়েছিল এই অধ্যায়। সে প্রায় উনিশ শতকের শেষভাগের কথা। শতাব্দীকাল পেরিয়ে সেই সরকারি গোয়েন্দা-পুলিশের প্রসঙ্গ দিয়েই শেষ হল সেই আলোচনা। মাঝের পরিসরটিতে বিস্তৃত হয়ে থাকল বাংলা সাহিত্যের বিখ্যত-অখ্যাত-বিস্মৃত-জনপ্রিয় নানান বয়সের, নানান স্বাদের গোয়েন্দাদের কথা। ধরা থাকল তাদের বৈচিত্র্যময় জীবন, যাপন, রহস্যের অলিগলিতে তাদের চলন-গমন। বাদ থেকে গেলেন আরও অনেকে, কারণ আমাদের বর্তমান গবেষণার সীমিত কালপর্ব।

তথ্যসূত্র

১. সেন সুকুমার; *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* ; আনন্দ পাবলিশার্স; তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২; কলকাতা; পৃ. ১৪৬।

২. *বাঁকাউল্লার দপ্তর* ; সম্পা. সৌম্যেন পাল ও প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত; চর্চাপদ; প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১৩; কলকাতা; ভূমিকা পৃ. ৯।

৩. সেন সুকুমার; *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* ; আনন্দ পাবলিশার্স; তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২; কলকাতা; পৃ. ১৪।

৪. *বাঁকাউল্লার দপ্তর* ; সম্পা. সৌম্যেন পাল ও প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত; চর্চাপদ; প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১৩; কলকাতা; (আত্মকথা)।

৫. *বাঁকাউল্লার দপ্তর* ; সম্পা. সৌম্যেন পাল ও প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত; চর্চাপদ; প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১৩; কলকাতা;পৃ. ১২-১৩।

৬. বসু গিরিশচন্দ্র; *সেকালের দারোগার কাহিনী* ; সম্পা. অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায়; পুস্তক বিপণি; দ্বিতীয় সংস্করণ; জানুয়ারি, ১৯৫৮; ভূমিকা পৃ. ২।

৭. বসু গিরিশচন্দ্র; *সেকালের দারোগার কাহিনী* ; সম্পা. অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায়; পুস্তক বিপণি; দ্বিতীয় সংস্করণ; জানুয়ারি, ১৯৫৮; পৃ. ৪।

৮. সেন সুকুমার; *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* ; আনন্দ পাবলিশার্স; তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২; কলকাতা; পৃ. ১৫১।

৯. মুখোপাধ্যায় শ্রী প্রিয়নাথ; *দারোগার দপ্তর (১ম খণ্ড)* ; সম্পা. অরুণ মুখোপাধ্যায়; পুনশ্চ; বইমেলা সংস্করণ, ২০১৪; কলকাতা; (ভূমিকা)।

১০. মুখোপাধ্যায় শ্রী প্রিয়নাথ; *দারোগার দপ্তর (১ম খণ্ড)* ; সম্পা. অরুণ মুখোপাধ্যায়; পুনশ্চ; বইমেলা সংস্করণ, ২০১৪; কলকাতা; (ভূমিকা)।

১১. মুখোপাধ্যায় শ্রী প্রিয়নাথ; *দারোগার দপ্তর (১ম খণ্ড)* ; সম্পা. অরুণ মুখোপাধ্যায়; পুনশ্চ; বইমেলা সংস্করণ, ২০১৪; কলকাতা; পৃ ১৫৬।

১২. মুখোপাধ্যায় শ্রী প্রিয়নাথ; *দারোগার দপ্তর (১ম খণ্ড)* ; সম্পা. অরুণ মুখোপাধ্যায়; পুনশ্চ; বইমেলা সংস্করণ, ২০১৪; কলকাতা; পৃ ১৭৩।

১৩. মুখোপাধ্যায় শ্রী প্রিয়নাথ; *দারোগার দপ্তর (১ম খণ্ড)* ; সম্পা. অরুণ মুখোপাধ্যায়; পুনশ্চ; বইমেলা সংস্করণ, ২০১৪; কলকাতা; পৃ ১৫১ ।

১৪. মুখোপাধ্যায় শ্রী প্রিয়নাথ; *দারোগার দপ্তর (১ম খণ্ড)* ; সম্পা. অরুণ মুখোপাধ্যায়; পুনশ্চ; বইমেলা সংস্করণ, ২০১৪; কলকাতা; পৃ ২৩৪-২৩৫ ।

১৫. সেন সুকুমার; *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* ; আনন্দ পাবলিশার্স; তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২; কলকাতা; পৃ. ১৬২-১৬৪।

১৬. গঙ্গোপাধ্যায় পার্থজিৎ; *হেমেন্দ্রকুমার রায় ছোটদের গোয়েন্দা সাহিত্যে অনন্যতায় উজ্জ্বল* ; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* ; বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা; সম্পা. তাপস ভৌমিক; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; কলকাতা; পৃ ৮২

১৭. রায় হেমেন্দ্রকুমার; *জয়ন্ত – মানিক সমগ্র (প্রথম খণ্ড)* ; সম্পা. সমুদ্র বসু; দেব সাহিত্য কুটীর, জানুয়ারি, ২০১৮; পৃ. ৭ ।

১৮. রায় হেমেন্দ্রকুমার; *জয়ন্ত – মানিক সমগ্র (প্রথম খণ্ড)* ; সম্পা. সমুদ্র বসু; দেব সাহিত্য কুটীর, জানুয়ারি, ২০১৮; পৃ. ২৩।

১৯. রায় হেমেন্দ্রকুমার; *জয়ন্ত – মানিক সমগ্র (প্রথম খণ্ড)* ; সম্পা. সমুদ্র বসু; দেব সাহিত্য কুটীর, জানুয়ারি, ২০১৮; পৃ. ১১৩ ।

২০. গঙ্গোপাধ্যায় পার্থজিৎ; *হেমেন্দ্রকুমার রায় ছোটদের গোয়েন্দা সাহিত্যে অনন্যতায় উজ্জ্বল* ; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* ; বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা; সম্পা. তাপস ভৌমিক; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; কলকাতা; ৮৯।

২১. বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু; *ব্যোমকেশ সমগ্র* ; আনন্দ পাবলিশার্স; দশম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০০৭; কলকাতা; পৃ. ৩ ।

২২. বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু; *ব্যোমকেশ সমগ্র* ; আনন্দ পাবলিশার্স; দশম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০০৭; কলকাতা; পৃ ১৫-১৬।

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু; *ব্যোমকেশ সমগ্র* ; আনন্দ পাবলিশার্স; দশম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০০৭; কলকাতা; পৃ ৯৬৩ ।

২৪. বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু; *ব্যোমকেশ সমগ্র* ; আনন্দ পাবলিশার্স; দশম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০০৭; কলকাতা; পৃ ৩৩ ।

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু; *ব্যোমকেশ সমগ্র* ; আনন্দ পাবলিশার্স; দশম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০০৭; কলকাতা; পৃ ৭২ ।

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু; *ব্যোমকেশ সমগ্র* ; আনন্দ পাবলিশার্স; দশম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০০৭; কলকাতা; পৃ ১৯১।

২৭. বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু; *ব্যোমকেশ সমগ্র* ; আনন্দ পাবলিশার্স; দশম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০০৭; কলকাতা; পৃ ৮ ।

২৮. বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু; *ব্যোমকেশ সমগ্র* ; আনন্দ পাবলিশার্স; দশম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০০৭; কলকাতা; পৃ ১৬৫।

২৯. ভট্টাচার্য মনোরঞ্জন; *হুকা - কাশি সমগ্র* ; ভাষা; জানুয়ারি, ২০২৩; কলকাতা; (ভূমিকা)।

৩০. রায় সত্যজিৎ; *যখন ছোট ছিলাম* ; আনন্দ পাবলিশার্স; অষ্টম মুদ্রণ চৈত্র ১৪১৫; কলকাতা; পৃ. ৩৫।

৩১. ভট্টাচার্য মনোরঞ্জন; *হুকা - কাশি সমগ্র* ; ভাষা; জানুয়ারি, ২০২৩; কলকাতা; (লেখক পরিচিতি)।

৩২. ভট্টাচার্য মনোরঞ্জন; *হুকা - কাশি সমগ্র* ; ভাষা; জানুয়ারি, ২০২৩; কলকাতা; (ভূমিকা)।

৩৩. ভট্টাচার্য মনোরঞ্জন; *হুকা - কাশি সমগ্র* ; ভাষা; জানুয়ারি, ২০২৩; কলকাতা; পৃ ২৭২।

৩৪. দাশগুপ্ত প্রসেনজিৎ; *জাপানি গোয়েন্দার বঙ্গে আগমন* ; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* ; বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা; সম্পা. তাপস ভৌমিক; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; কলকাতা; ১০৫।

৩৫. চক্রবর্তী শিবরাম; *কঙ্কেকাশির গোয়েন্দাগিরি* ; সপ্তর্ষি প্রকাশন; এপ্রিল, ২০১৯; কলকাতা; পৃ ৪০।

৩৬. দাশগুপ্ত প্রসেনজিৎ; *জাপানি গোয়েন্দার বঙ্গে আগমন* ; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* ; বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা; সম্পা. তাপস ভৌমিক; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; কলকাতা; ১০৭ ।

৩৭. সেনগুপ্ত পল্লব; *কঙ্কে – কাশি, মেয়ে ব্যোমকেশ এবং...* ; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* ; বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা; সম্পা. তাপস ভৌমিক; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; কলকাতা; ১১০ ।

৩৮. চক্রবর্তী শিবরাম; *কঙ্কেকাশির গোয়েন্দাগিরি* ; সপ্তর্ষি প্রকাশন; এপ্রিল, ২০১৯; কলকাতা; পৃ ৯০।

৩৯. দাশগুপ্ত সুরজিৎ; *নিরুদ্দেশ পরাশর* ; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* ; বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা; সম্পা. তাপস ভৌমিক; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; কলকাতা; ১২০-১২২ ।

৪০. দাশগুপ্ত সুরজিৎ; *নিরুদ্দেশ পরাশর* ; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* ; বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা; সম্পা. তাপস ভৌমিক; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; কলকাতা; ১২২

৪১. দাশগুপ্ত সুরজিৎ; *নিরুদ্দেশ পরাশর* ; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* ; বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা; সম্পা. তাপস ভৌমিক; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; কলকাতা; ১২০-১২১ ।

৪২. নীহাররঞ্জন গুপ্ত; *কিরীটী অম্নিবাস ১ম খন্ড* ; কিরীটী-তত্ত্ব (ভূমিকা); মিত্র ও ঘোষ; অষ্টম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৮০০; কোলকাতা।

৪৩. নীহাররঞ্জন গুপ্ত; *কিরীটী অম্নিবাস ১ম খন্ড* ; মিত্র ও ঘোষ; অষ্টম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৮০০; কলকাতা; পৃ. ৯৭।

৪৪. নীহাররঞ্জন গুপ্ত; *কিরীটী অম্নিবাস ১২শ খন্ড* ; অমর সাহিত্য প্রকাশন; দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৯১; কলকাতা; পৃ. ১৯৯-২০০।

৪৫. নীহাররঞ্জন গুপ্ত; *কিরীটী অম্নিবাস ১ম খন্ড* ; মিত্র ও ঘোষ; অষ্টম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৮০০; কলকাতা; পৃ. ১১৮।

৪৬. নীহাররঞ্জন গুপ্ত; *কিরীটী অম্নিবাস ১২শ খন্ড* ; অমর সাহিত্য প্রকাশন; দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৯১; কলকাতা; পৃ. ৯৮।

৪৭. নীহাররঞ্জন গুপ্ত; *কিরীটী অম্নিবাস ৯ম খন্ড* ; অমর সাহিত্য প্রকাশন; প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩০৩; কলকাতা; পৃ. ১০৫।

৪৮. নীহাররঞ্জন গুপ্ত; *কিরীটী অম্‌নিবাস ১ম খন্ড* ; মিত্র ও ঘোষ; অষ্টম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৮০০; কলকাতা; পৃ. ২৬৩-৬৪।

৪৯. নীহাররঞ্জন গুপ্ত; *কিরীটী অম্‌নিবাস ১১শ খন্ড* ; অমর সাহিত্য প্রকাশন; নভেম্বর, ১৯৬০; কলকাতা; পৃ. ১৯৭।

৫০. নীহাররঞ্জন গুপ্ত; *কিরীটীর গোয়েন্দা গল্প* ; কামিনী প্রকাশালয়; চতুর্থ প্রকাশ, আষাঢ় ১৮১৫; কলকাতা; পৃ. ১২৬।

৫১. নীহাররঞ্জন গুপ্ত; *কিরীটী অম্‌নিবাস ৫ম খন্ড* ; অমর সাহিত্য প্রকাশন; প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৯৫৪; কলকাতা; পৃ. ২৪৩।

৫২. নীহাররঞ্জন গুপ্ত; *কিরীটী অম্‌নিবাস ৫ম খন্ড* ; অমর সাহিত্য প্রকাশন; প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৯৫৪; কলকাতা; পৃ. ২৪৪।

৫৩. নীহাররঞ্জন গুপ্ত; *কিরীটীর গোয়েন্দা গল্প* ; অনুচ্চারিত (ভূমিকা); কামিনী প্রকাশালয়; চতুর্থ প্রকাশ, আষাঢ় ১৮১৫; কলকাতা।

৫৪. রায় সত্যজিৎ; *ফেলুদা সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; প্রথম প্রকাশ, ২০০৫; কলকাতা; ১৯৩।

৫৫. রায় সত্যজিৎ; *ফেলুদা সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; প্রথম প্রকাশ, ২০০৫; কলকাতা; ১৯৪।

৫৬. রায় সত্যজিৎ; *ফেলুদা সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; প্রথম প্রকাশ, ২০০৫; কলকাতা; ১৯২।

৫৭. রায় অনির্বাণ; *অনুকূল বর্মা, ডিটেকটিভ* ; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* ; বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা; সম্পা. তাপস ভৌমিক; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; কলকাতা; ১৩৩।

৫৮. চক্রবর্তী স্মৃতিকণা; *কবি নীরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সি. বি. আই – এর দপ্তর* ; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* ; বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা; সম্পা. তাপস ভৌমিক; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; কলকাতা; ২০০, ২১০।

৫৯. মুখোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু; *রহস্য সমগ্র* ; আনন্দ পাবলিশার্স; কলকাতা; প্রথম সংস্করণ এপ্রিল, ২০১৫; (নিবেদন অংশ)।

৬০. মুখোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু; *রহস্য সমগ্র* ; আনন্দ পাবলিশার্স; কলকাতা; প্রথম সংস্করণ এপ্রিল, ২০১৫; পৃ. ৩৭৯।

৬১. মুখোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু; *রহস্য সমগ্র* ; আনন্দ পাবলিশার্স; কলকাতা; প্রথম সংস্করণ এপ্রিল, ২০১৫; পৃ. ৪৫১।

৬২. মুখোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু; *রহস্য সমগ্র* ; আনন্দ পাবলিশার্স; কলকাতা; প্রথম সংস্করণ এপ্রিল, ২০১৫; পৃ. ২০৭।

৬৩. মুখোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু; *রহস্য সমগ্র* ; আনন্দ পাবলিশার্স; কলকাতা; প্রথম সংস্করণ এপ্রিল, ২০১৫; পৃ. ৪৬৮।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের ভিন্ন পেশার গোয়েন্দারা

বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র ধরণের গোয়েন্দার সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। তারা সবাই যে পেশাগতভাবে গোয়েন্দাগিরি করে, তা কিন্তু নয়। বিভিন্ন পেশার মানুষ ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছেন এই কাজের সঙ্গে। কেউ বা অন্য পেশায় যুক্ত থেকে শখে করেছেন গোয়েন্দাগিরি। কেউ বা পেশাগত কারণেই বাধ্য হয়েছেন সত্য অনুসন্ধানে। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলা সাহিত্যের সেই সব বিচিত্র পেশার গোয়েন্দাদের নিয়ে কথা বলব। আর থাকবে ক্ষুদে গোয়েন্দাদের কথা। বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদে গোয়েন্দার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তারা পড়াশোনা, খেলাধুলোর পাশাপাশি কখনো কখনো জড়িয়ে পড়েছে নানান রহস্যময় ঘটনার সাথে, মুখোমুখি হয়েছে সমস্যার। কিন্তু নিজেদের তাৎক্ষণিক বুদ্ধি আর অসীম সাহসের জোরে তারা পেরিয়ে এসেছে সেসব। জানব তাদের কথাও।

❖

নারায়ণ সান্যালের (২৬ এপ্রিল ১৯২৪ - ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫) চরিত্র ব্যারিষ্টার পি.কে বাসু অর্থাৎ প্রসন্নকুমার বাসু, বার-অ্যাট-ল'র চরিত্রটি আদতে আর্ল স্ট্যানলি গার্ডনার (১৮৮৯-১৯৭০) সৃষ্ট চরিত্র, পশ্চিমি অপরাধ সাহিত্যের আইনজীবী গোয়েন্দাদের মধ্যে অন্যতম পেরি ম্যাসনের ছায়া অবলম্বনে রচিত। শুধু চরিত্রের ছায়াই নয়, বাসুসাহেবের বেশ কিছু কাহিনিও লেখা হয়েছিল পেরি ম্যাসনের কয়েকটি কাহিনির প্রায় সম্পূর্ণ অনুসরণে। যদিও বাসুসাহেব প্রৌঢ় এবং পেরি ম্যাসনের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার জীবনযাত্রার বিশাল ফারাক। তবুও নারায়ণ সান্যাল বহু জায়গায় স্বীকার করে নিয়েছেন যে পি.কে.বাসুর সৃষ্টি পেরি ম্যাসনের অনুসরণে। এমনকি, তাঁকে কেন্দ্র করে একাধিক

কাহিনি, যা *কাঁটা সিরিজ* নামে পরিচিত, সেগুলি রচিত হয়েছে পেরি ম্যাসনের বিভিন্ন গল্পের অনুকরণে। শুধু তাই নয়, আগাথা ক্রিস্টি এবং স্যার আর্থার কোনান ডয়েলও অনুসৃত হয়েছেন সান্যাল মশাইয়ের কলমে। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, প্রায় প্রতিটি কাহিনির মুখবন্ধেই তিনি মূল কাহিনির নাম উল্লেখ করে দিয়েছেন। 'কাঁটা' গুচ্ছ জন্ম নেবার আগে, *নাগচম্পা* উপন্যাসে (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮) এই পি কে বাসুকে আমরা প্রথমবার দেখতে পাই। তারপর ১৯৭৪ – এর অক্টোবরে এল কাঁটা সিরিজের প্রথম গল্প, *সোনার কাঁটা*, যেটি উৎসর্গ করা হয় ব্যোমকেশ বক্সী - কে।

পি কে বাসু ওরফে প্রসন্নকুমার বসু, কলকাতা উচ্চ আদালতের খ্যাতনামা ক্রিমিনাল সাইড ব্যারিস্টার। তিনি, এ কে রে বা অতুলকৃষ্ণ রায়ের জুনিয়র ছিলেন। ফৌজদারি মামলায় তিনি অপ্রতিরোধ্য ও তুখোড় বুদ্ধিসম্পন্ন আইনজীবীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি আদর্শগত ভাবে অপরাধীর কেস হাতে নেননা এবং নিরপরাধ ব্যক্তিকে মিথ্যা মামলার জাল থেকে খালাস করেন। নির্দোষ অথচ ফাঁসির আসামীকে বাঁচিয়ে দেন প্রখর বুদ্ধিতে। কোর্টরুম ট্রায়াল ও নিজস্ব তদন্তের মাধ্যমে পিকে বসু রহস্য উদ্‌ঘাটন করে থাকেন। পিকে বাসুর বাড়িতে তার পঙ্গু স্ত্রী এবং ভাড়াটে দম্পতি হিসেবে কৌশিক ও সুজাতা থাকে। এই তরুণ দম্পতি তাদের অনাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও কাছের মানুষ। তাদের তৈরি গোয়েন্দা সংস্থা সুকৌশলী মাঝে মাঝে বাসুর নিজস্ব তদন্তেও সহায়তা করে থাকে।

সান্যাল মশাইয়ের লেখা কাঁটা-সিরিজের মধ্যে *ঘড়ির কাঁটা* - র একটি বিশেষ অংশ লেখা হয়েছিল আর্ল স্ট্যানলি গার্ডনারের *দ্য কেস অব দ্য হন্টেড হাজব্যান্ড* -এর কাহিনি অনুসরণে। গার্ডনারেরই উপন্যাস *দ্য কেস অব দ্য কিউরিয়াস ব্রাইড* সান্যাল মশাইয়ের লেখায় হয়েছিল *কৌতুহলী কনের কাঁটা* এবং *দ্য কেস অব দ্য সাইলেন্ট পার্টনার* হয়েছিল *যাদু এ তো বড় রঙ্গ - র কাঁটা*। *উলের কাঁটা* গল্পের উৎস পেরি ম্যাসনের কাহিনি *দ্য কেস অব দ্য পারজিওর্ড প্যারট*। *অ-আ-ক-খ খুনের কাঁটা* এবং *সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা* লেখা হয়েছিল আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাস যথাক্রমে *দ্য এ বি সি মার্ডার* এবং *ডাম্ব উইটনেস* অবলম্বনে। *দর্পণে প্রতিবিম্বিত কাঁটা* প্রভাবিত হয়েছিল আগাথা ক্রিস্টির গল্প *দ্য ডেড*

ম্যানস মিরর থেকে। *সকল কাঁটা ধন্য করে* - র কাহিনিসূত্র হল আগাথা ক্রিস্টির *মার্ডার ইন দ্য মিউজ* এবং ক্রিস্টিরই *দ্য প্লাইমাউথ এক্সপ্রেস* থেকে নেওয়া হয়েছে *চাঁপারঙের মুর্শিদাবাদী শাড়ির কাঁটা* - এর কাহিনিসূত্র। কাঁটা সিরিজের উপন্যাস *ন্যায়নিষ্ঠ ন্যাসন্যাশীর কাঁটা* নেওয়া হয়েছিল গার্ডনারের *দ্য কেস অব দ্য ট্রাবলড ট্রাস্টি* থেকে এবং *দ্বি-বৈবাহিক কাঁটা নেওয়া* হয়েছিল গার্ডনারের *দ্য কেস অব দ্য বাইগেমাস স্পাউস* উপন্যাস থেকে। *বিশের কাঁটা* নেওয়া হয়েছিল গার্ডনারের *দ্য কেস অব দ্য লাকি লেগস* অবলম্বনে। এই সিরিজের অন্যান্য উপন্যাসগুলিও কোনো না কোনো বিদেশি গোয়েন্দা কাহিনির ছায়া অনুসরণ করে লেখা হয়েছিল। যেমন আগাথা ক্রিস্টির দু'টি উপন্যাস *থ্রি অ্যাক্ট ট্র্যাজেডি* এবং *দ্য ক্রিটান বুল* অবলম্বনে যথাক্রমে লেখা হয়েছিল *ড্রেস রিহার্সালের কাঁটা* এবং *মোনালিজার কাঁটা*। *ইস্কাপন বিবির কাঁটা* লেখা হয় *দ্য কিং অব ক্লাবস* গল্প অনুসরণে আর *হরিপদ কেরানির কাঁটা, ট্রায়াঙ্গেল অ্যাট রোডস* গল্পের ছায়ায়। কাঁটা সিরিজের শেষ দু'টি গল্প সম্ভবত একই বছরে লেখা হয়েছিল এবং সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় লেখকের মৃত্যুর পরে। এগুলিতে কোনো প্রাক্‌কথন বা মুখবন্ধ সংযোজিত হয়নি। কিন্তু গল্পগুলি খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায় *সর্বশুভ্র সংঘের কাঁটা* এবং *ষড়ানন রবীন্দ্রমূর্তির কাঁটা* যথাক্রমে লেখা হয়েছিল শার্লক-কাহিনি *দ্য রেড হেডেড লিগ* এবং *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সিক্স নেপোলিয়নস* - এর ছায়া অবলম্বনে।

কাঁটায় কাঁটায় সিরিজের উল্লেখযোগ্য কাহিনিগুলি হল -

সোনার কাঁটা (অক্টোবর, ১৯৭৪), ঘড়ির কাঁটা (জানুয়ারি, ১৯৭৭), মাছের কাঁটা (মার্চ, ১৯৭৫), পথের কাঁটা (জানুয়ারি, ১৯৭৬), উলের কাঁটা, অ-আ-ক-খ খুনের কাঁটা, সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা, কৌতূহলী কনের কাঁটা (জুলাই, ১৯৯৩), যাদু এ তো বড় রঙ্গ-র কাঁটা (অক্টোবর, ১৯৯৩), রিস্তেদারের কাঁটা (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১), 'অভিপূর্বক নী-ধাতু অ' – এর কাঁটা (বইমেলা, ১৯৯৫), ন্যায়নিষ্ঠ ন্যাসনাশীর কাঁটা (বইমেলা, ১৯৯৪), দ্বি – বৈবাহিক কাঁটা (বইমেলা, ১৯৯৫), যম দুয়ারে পড়ল কাঁটা (বইমেলা, ১৯৯৫), দর্পণে প্রতিবিম্বিত কাঁটা, সকল কাঁটা ধন্য করে, চাঁপারঙের মুর্শিদাবাদী শাড়ির কাঁটা, বিশের কাঁটা, ড্রেস

রিহার্সালের কাঁটা, মোনালিজার কাঁটা, ইস্কাপন বিবির কাঁটা, হরিপদ কেরানির কাঁটা, সর্বশুভ্র সংঘের কাঁটা, ষড়ানন রবীন্দ্রমূর্তির কাঁটা ইত্যাদি।

❖

বাংলার কিশোরদের জন্য প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিমল কর (১৯২১-২০০৩), কিঙ্করকিশোর রায় ওরফে কিকিরাকে নিয়ে বেশ কয়েকটি রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনি রচনা করেছেন। চরিত্রটির প্রথম আত্মপ্রকাশ আনন্দমেলা পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩৮২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত *কিকিরা সমগ্র ৩* - এর ভূমিকায় বিমল কর লিখেছেন –

"গোয়েন্দা গল্প বলতে ঠিক যা বোঝায়, কিকিরার গল্প তা নয়। অপরাধমূলক কাহিনী বলা যায়। খুনোখুনি বন্দুক পিস্তল রক্তপাত - এইসব ভয়ংকর ব্যাপার কিকিরার গল্পে নেই; যেটুকু আছে তা আড়ালে, এবং অতি সামান্য। এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিকিরাসারকে যাদের ভালো লাগে, এই লেখাগুলি তাদের তৃপ্ত করলে খুশি হব।"[১]

কিকিরা আসলে একজন অনুসন্ধিৎসু মানুষ যিনি অন্যের কাছে নিজেকে গোয়েন্দা নয় বরং ম্যাজিশিয়ান হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। 'কিকিরা দ্য গ্রেট'। তিনি জাদুকর হ্যারি হুডিনির ভক্ত তাই নিজের পকেটে সবসময় কিছু না কিছু ম্যাজিক দেখানোর সরঞ্জাম নিয়ে ঘোরেন। কিকিরা বলেন, তার গুরুর গুরু নাকি গণপতিবাবু। সম্ভবত তিনি বাংলার আধুনিক জাদুচর্চার পথিকৃৎ গণপতি চক্রবর্তীর(১৮৫৯-১৯৩৯) কথাই বলতে চেয়েছেন। আগে ম্যাজিক দেখাতেন কিকিরা দ্য গ্রেট। কিন্তু বাঁ হাতে সমস্যা দেখা দেওয়ায় ম্যাজিক দেখানো ছাড়তে হয় তাঁকে। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আছে তাঁর-সেটুকুই সম্বল। এখন কিকিরা

ম্যাজিকের বই লিখবেন ভাবেন, ছোকরা ম্যাজিশিয়ানদের টিপস দেন, তাদের ম্যাজিকের যন্ত্রের নকশা করে দেন, সঙ্গে করে নিয়ে যান চেনা মিস্ত্রির দোকানে। রহস্য সমাধান করেও হাতে কিছু আসে। শহরের সস্তা পাড়ায় ঘুপচি ফ্ল্যাটে সহায়ক বগলাকে নিয়ে তাঁর বাস।

ওয়েলিংটনের মোড় থেকে কিছুটা সামনে এগিয়ে কিকিরার পুরনো আমলের বাড়ি। দোতলায় কিকিরা থাকেন, নিচে দর্জির দোকান। কাঠের সিঁড়ি মস্ত উঁচু ছাদ, কড়ি – বরগার দিকে তাকালে ভয় করে। কিকিরার দোতলার ঘরটি বেশ বড়। ঘরের গা – লাগোয়া প্যাসেজ। তারই একদিকে রান্না – বান্নার ব্যবস্থা। কাজ চলার মত বাথরুম। এক – চিলতে পার্টিশান করা ঘরে থাকে বগলা, কিকিরার ডান হাত তথা 'কাজের লোক'। নানা আজব আর উদ্ভট জিনিসের সংগ্রহ কিকিরার ঘরে।

"মানুষটির সঙ্গে এই ঘরটির অদ্ভুত মিল। বিচিত্র ছাঁটের, আর বেয়াড়া রং-চং-অলা এক আলখাল্লা-পরা কিকিরাকে বাড়িতে যেমনটি দেখায় এই ঘরটিও সেইরকম অদ্ভুত দর্শন। এ-ঘরে কী নেই? কিকিরার সিংহাসন-মার্কা চেয়ার ছাড়াও যত্রতত্র বিচিত্র সব জিনিস ছড়ানো। পুরনো দেওয়ালঘড়ি, চিনে মাটির জার, বড়-বড় পুতুল, কালো ভুতুড়ে আলখাল্লা, চোঙাঅলা সেকেলে গ্রামোফোন, ম্যাজিকওয়ালার আই বল, ফিতে জড়ানো ধনুক, পাদরিসাহেবের টুপি, ম্যাজিক ছাতা আর তলোয়ার, পায়রা-ওড়ানো বাক্স, টিনের চোঙ - কোনটা নয়! তার সঙ্গে এক-দু'মাস অন্তর জমানো ম্যাজিক-মশাল, গাঁজার কলকে, বাহারি মোমদান - এ-সব তো জমেই যাচ্ছে দিনের পর দিন।"[২]

ম্যাজিকের সূত্রেই তার ঝুলিতে আছে নানান উদ্ভট ঘটনার ও মানুষের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা। তিনি যেসব রহস্যের সাথে জড়িয়ে পড়েন সেগুলোও আপাতভাবে অলৌকিক। লম্বা মানুষ কিকিরার বর্ণনা দিয়েছেন তার স্রষ্টা, 'টিয়াপাখির মতন নাক, তোবড়ানো গাল, গর্তে বসা চোখ। চেহারাটি রোগাসোগা, গায়ে সেই আদ্যিকালের অলেস্টার, মাথায় কাশ্মীরি টুপি ডান হাতে একটা সুটকেস ঝুলছে, বাঁ হাতে খয়েরি বালাপোশ। ভদ্রলোক এতই রোগা যে গায়ে অলেস্টার চাপিয়েও তাঁকে মোটা দেখাচ্ছে না। গলায় মোটা মাফলার

জড়ানো।'। নানা রঙের কাপড়ের তাপ্পিমারা একটি বিচিত্র আলখাল্লা মাঝে মাঝে গায়ে চাপিয়ে ঘুরে বেড়ান কিকিরা। বিশ্রী গন্ধওয়ালা চুরুট খান তিনি। কিকিরা রামপ্রসাদ ও নিধুবাবুর গান গাইতে পারেন, মাথা থেকে বার করে নানারকম রান্না করেন। কিসমিসের পকৌড়া, আফগানি খিচুড়ি, গুজরাতি দইবড়া, বার্মিজ ওমলেট, মুলতানি আলুর দম এইরকম অদ্ভুত সব খাবার।

কিকিরা অন্যের ইংরেজি বলা নিয়ে হাসেন না কারণ উনি যে জগতে চলাফেরা করেন সেখানে কেউ ইংরেজি বলে না, আর কিকিরার নিজের ইংরেজিও তথৈবচ। তিনি চন্দনকে স্যান্ডেলউড বলে ডাকেন, নাক ডাকার ইংরেজি করেন নোজ কলিং, তাঁকে যে হ্যান্ড বার্নিং করে খেতে হয় সেইজন্য আফসোস করেন। কিকিরার ইংরেজি নিয়ে তারাপদ চন্দন, এমনকী কিকিরা নিজেও হাসেন। সে হাসিতে কোনও পক্ষের তাচ্ছিল্য বা কুণ্ঠা জড়িয়ে নেই। কিকিরার কথায় –

"আমি হাসিঠাট্টা করতে ভালোবাসি। আমার আপন পর নেই। ভেরি ফ্রাংক। আমার মুখ থেকে হরদম ইংলিশ বেরোয়, নো গ্রামার। আমার বাবাকে একজন অ্যাংলো ঘুষি মেরে নাক ভেঙে দিয়েছিল, তখন থেকেই আমার ওই ভাষাটার ওপর রাগ। অ্যাংলোরা হাফ ইংলিশ বলে, তাতেই আমার বাবার নাক চলে গেল, ফুল ইংলিশ যারা বলে তাদের ঘুষি খেলে তো আমার বাবার ফেসই পাল্টে যেত। আমি তখন থেকে রিভেন্‌জ্‌ নিতে শুরু করেছি ভাষাটার ওপর। যা মুখে আসে বলব – তুই আমার কাঁচকলা করবি। তোর ভাষা কি আমার মা-র না বাবার ভাষা।"[৩]

কিকিরা কুকুর ভয় পান, এর পিছনে তাঁর অকাট্য যুক্তি, "গোয়েন্দারা সাহসী হয়, আমি ম্যাজিশিয়ান।" কিকিরা কিন্তু মোটেই টাকাপয়সার ব্যাপারে উদাসীন নয়। বরং কখনও কখনও তাকে টাকাপয়সার খাতিরেই গোয়েন্দাগিরি করতে দেখা যায়।

কিকিরার দুই শাগরেদ ও পুরনো বন্ধু, চন্দন আর তারাপদ থাকে গঙ্গাচরণ মিত্রের মেসবাড়িতে। তারা কিকিরাকে ডাকে 'কিকিরা স্যার'। চন্দন পেশায় ডাক্তার, তবে পাশ করেছে খুব বেশিদিন আগে নয়। তারাপদ প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করে। 'কাপালিকরা এখনও আছে' উপন্যাসে ঘটনাচক্রে ট্রেনের কামরায় কিকিরার সঙ্গে আলাপ হয় তারাপদ আর চন্দন ওরফে চাঁদুর। তারপর তাঁরা একত্রিত হয়ে একের পর এক রহস্যের সমাধান করতে থাকেন।

কিকিরাকে নিয়ে বিমলবাবু সম্ভবত ২০টি কাহিনী লিখেছেন, সেগুলি হল -

কাপালিকরা এখনও আছে, রাজবাড়ির ছোরা, ঘোড়া সাহেবের কুঠি, সেই অদৃশ্য লোকটি, শুদ্ধানন্দ প্রেতসিদ্ধ ও কিকিরা, ময়ূরগঞ্জের নৃসিংহ সদন, জাদুকরের রহস্যময় মৃত্যু, সার্কাস থেকে পালিয়ে, হলুদ পালক বাঁধা তীর, তুরুপের শেষ তাস, সোনার ঘড়ির খোঁজে, একটি ফোটো চুরির রহস্য, কৃষ্ণধাম কথা (ডিসেম্বর, ১৯৯৭), ঝিলের ধারে একদিন (জানুয়ারি, ১৯৯৮), একটি অভিশপ্ত পুঁথি ও অষ্টধাতু, বাঘের থাবা, সোনালি সাপের ছোবল (জানুয়ারি, ১৯৯৯), হায়দার লেনের তেরো নম্বর বাড়ির কফিন বাক্স (জানুয়ারি, ২০০০), নীল বানরের হাড় (জানুয়ারি, ২০০১), ভুলের ফাঁদে নবকুমার (আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী, ১৪০৮) ইত্যাদি।

❖

বুদ্ধদেব গুহর (১৯৩৬-২০২১) লেখা কিশোরপাঠ্য শিকার-কাহিনি এবং জঙ্গল-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির নায়ক ঋজু বোস। তার বসবাস কলকাতায়, বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে। দীর্ঘকায়, সুপুরুষ, শিক্ষিত, মার্জিত এবং সমাজের উচ্চ মহলে বিচরণকারী ঋজুর বাসস্থানের কারণেই মনে হতে পারে এই চরিত্রটি সৃষ্টি করার সময় হয়তো বুদ্ধদেব গুহ-

র মাথায় বিখ্যাত বাঙালি চিত্রপরিচালক ও সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়ের ছায়াটি প্রচ্ছন্ন ছিল। ঋজুদাকে প্রথম পাওয়া যায় ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত *ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে* উপন্যাসে।

ঋজু বোস শিকারী এবং সেই সঙ্গে অরণ্য, বন্যপ্রাণ ও অরণ্যের মানুষজনের জীবন ও যাপন সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। জীবনের প্রথম পর্যায়ে ঋজু বহু বন্যপ্রাণী শিকার করলেও, যখন থেকে বন্যপ্রাণী হত্যা বা শিকার করা আইনত নিষিদ্ধ হয়ে যায়, তখন থেকেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বন্যপ্রাণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজে। তবে কোথাও কোনও বাঘ 'মানুষখেকো' হয়ে গেলে বা কোনও হাতি যদি লোকালয়ে এসে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি করে তাহলে সেখানে ঋজুর ডাক পড়ে তাদের মারার জন্য। এছাড়াও চোরাশিকারীদের সন্ধানে বা কোনো রহস্য-রোমাঞ্চ অভিযানে ঋজুকে প্রায়-ই আফ্রিকা বা অন্যান্য অরণ্যভূমিতে পাড়ি জমাতে হয়।

লেখক বুদ্ধদেব গুহ জঙ্গলকে যেমন ভালবাসেন তেমনি বন্যপ্রাণীদেরও ভালবাসেন, সেটা ঋজুদা সিরিজের কাহিনীগুলি থেকে সহজেই বোঝা যায়। ঋজুদার গল্পগুলিতে দেশবিদেশের বিভিন্ন অরণ্যের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। কাহিনী এগিয়ে চলে কখনো মানুষখেকো বাঘ শিকারকে কেন্দ্র করে, আবার কখনো জঙ্গলের ত্রাস পাগলা হাতির নিধনে। বনের কাছে বাস করা নিম্ন আয়ের মানুষদের সাদাসিধে জীবন, সেই সাথে ছায়া ঢাকা ডাকবাংলোর বিবরণ একই সাথে ভ্রমণ কাহিনী আর সেই সাথে শিকার কাহিনীর আনন্দ দেয়। এই সিরিজের আরও এক মজাদার বিষয় খাবারের বর্ণনা। সাধারণত রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের বইয়ে খাবার-দাবারের বিবরণ বেশিরভাগ লেখকই এড়িয়ে যান। কিন্তু ভোজন-রসিক লেখকের চমৎকার লেখনীর ছোঁয়ায় বইয়ের পাতা জুড়ে যেন খাবারের গন্ধ ভেসে বেড়ায়। মোগলাই খাবারের বিবরণ থেকে গাছ-পাঁঠার রান্নার রহস্য, শিকারের কাহিনীর থেকে কম রোমাঞ্চকর মনে হয় না।

যদিও ঋজুদা সিরিজ মূলত অ্যাডভেঞ্চার ধরনের, কিন্তু সেখানে একেবারেই যে রহস্য নেই তা কিন্তু নয়। কখনো খুনে ডাকু ধরবার জন্যে আবার কখনো চোরা শিকারি দমনে ডাক পরে ঋজুদার। সম্ভ্রান্ত পরিবারের লুকানো রহস্য সমাধান করতেও দেখা যায় ঋজুদাকে। রহস্যের খোঁজে কেবল যে ভারতবর্ষের বনেই চষে বেরিয়েছে ঋজুদা তেমনটা নয়, আফ্রিকার গহীন অরণ্য আর সুন্দরবনের বাদাবনের মত জায়গাতেও অভিযান করেছেন ঋজুদা আর তার দলবল।

ঋজুদা সিরিজের নাম থেকেই প্রধান চরিত্রের আঁচ পাওয়া যায়। পুরো নাম ঋজু বোস, কলকাতায় নিজের ফ্ল্যাটে একাই থাকেন। বহুদিনের সঙ্গী পুরনো ভৃত্য ছাড়া আর কেউ নেই। তার পরিবার সম্পর্কে খুব বেশি বিবরণ পাওয়া যায় না, শৈশব থেকে অরণ্য প্রীতি আর যুবক বয়সের শিকারের কথা কিছু কাহিনীতে উল্লেখ রয়েছে। শিকারের নেশায় এক বন থেকে অন্য বনে ঘুরে বেড়াতেন কখনো বন্ধুদের সাথে কখনো বা অনুচরদের নিয়ে। মধ্যবয়স্ক ঋজুদার বিবরণে শক্ত ধাতের একজন মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে তাকে। রুচিশীল এবং প্রায় ধনী-ই বলা চলে এই অবসরপ্রাপ্ত শিকারিকে। এক সময় কাঠের ব্যবসা করতেন আর অনেকগুলো কুকুর পুষতেন বলে প্রথমদিকের বইয়ে উল্লেখ থাকলেও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় না। শিকারে যেমন অসাধারণ হাত, তেমনি বুদ্ধির খেলাতেও ঋজুদা নিজের প্রমাণ রাখেন সুস্পষ্ট ভাবে। লেখকের নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ এই চরিত্রের মাঝে দেখা যায়। পুরাতন সঙ্গীতের প্রতি দুর্বলতা আর সুগন্ধি তামাকের পাইপ খাওয়া এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। একেবারে প্রথম অভিযান থেকে ঋজুদার সঙ্গী রুদ্র রায়চৌধুরী। দূরসম্পর্কের আত্মীয়, সংসারের প্রতি উদাসীন ঋজুদার সাথে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক তার। প্রথমদিকে স্কুলে পড়ত সে, পরে কলেজে পৌঁছেছে। আশির দশকের গোড়ার দিকে যখন মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকে গাদা গাদা নম্বর পাওয়া যেত না, তখন প্রচুর নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছিল মেধাবী ছাত্র রুদ্র। পুরস্কার স্বরূপ একটি স্প্যানিশ 'লামা' রিভলভার সে উপহার পায় ঋজুদার কাছ থেকে। ঋজুদার রহস্য ঘেরা আর উত্তেজনাপূর্ণ সব অভিযানের কাহিনী এই রুদ্রই পাঠকদের সামনে নিয়ে আসে। তার সম্বোধন অনুযায়ী-ই পাঠকের কাছে ঋজু বোসের পরিচয় ঋজুদা হিসেবে। বয়সের তুলনায় শিকারে বেশ অভিজ্ঞ সে, এ ছাড়া লেখাপড়াতেও বেশ ভালো বলেই জানা যায়।

বিপজ্জনক মুহূর্তে ঠাণ্ডা মাথায় শিকার করবার অথবা সাংঘাতিক কোনো অবস্থা থেকে সবাইকে উদ্ধার করবার মত গুণ রয়েছে এই চরিত্রের।

ঋজুদার পেশা যে ঠিক কী সে বিষয়ে কখনোই গল্পের কথক রুদ্র, আমাদের পাঠকদের খুব স্পষ্টভাবে কিছু বলে না, তবে ঋজু যে প্রচুর বিত্তবান তার ইঙ্গিত বেশ কিছু জায়গাতেই লেখক আমাদের দিয়েছেন। ঋজুর জেঠুমণি ছিলেন বিস্তর সম্পত্তির মালিক। শহরে নানান বিষয়আশয় ছাড়াও কলকাতার বাইরে একটু শহরতলির দিকে একটা বিরাট খামার বাড়ি ছিল তাঁর। গোয়েন্দা-কাহিনির তাত্ত্বিক ও সমালোচক প্রসেনজিৎ দাশগুপ্তের মতে, ঋজুদার স্রষ্টা বুদ্ধদেব গুহ না কী এই জেঠুমণির চরিত্রটি তৈরি করেছিলেন তাঁর বাবা শ্রদ্ধেয় এস.এন.গুহেরই আদলে। তিনি আরও মনে করেন বুদ্ধদেব গুহর আত্মজীবনী *ঋভু* যদি কেউ পড়েন তাহলে তিনি ঋজুদা-কাহিনিগুলির অনেক চরিত্রের সাথে লেখকের নিজের জীবনে দেখা অনেক মানুষের সাথে সাযুজ্য খুঁজে পাবেন। তখন হয়তো মনে হতে পারে ঋজুদা যেন লেখক নিজেই আর রুদ্র তাঁর কৈশোরের প্রতিচ্ছায়া।*

ঋজুদা ধূমপান করতে বেশ ভালোবাসে। তানজানিয়ার তৈরি মিরশ্যাম পাইপ ছাড়াও তার সংগ্রহে আছে আরও নানান ধরণের পাইপ। তার পছন্দের তামাক 'অ্যামফোরা'। আর আছে তার আগ্নেয়াস্ত্রের সংগ্রহ। ঋজুদার শাকরেদ রুদ্রর কাছেও আছে বেশ কিছু বন্দুক। সে-ও ঋজুদার মতো বিভিন্ন ধরণের অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ।

কাহিনীর প্রয়োজনে ঋজুদার পুরনো বন্ধু অথবা স্থানীয় পরিচিতজনদের কথা উল্লেখ থাকলেও ঋজুদা এবং রুদ্রের বাইরে সিরিজের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রয়েছে। তাদের একজনের নাম তিতির, ঋজুদা সিরিজের একমাত্র নারী চরিত্র। সে রুদ্রের সহপাঠী এবং ঋজুদার ভক্ত। *রুআহা* শীর্ষক কাহিনীতে তিতিরের প্রথম দেখা মেলে। রাইফেল শ্যুটিং চ্যাম্পিয়ন। ছোটবেলা থেকেই শিকারের অসাধারণ হাত আর সূক্ষ্ম লক্ষ্যভেদের

---

* শ্রী প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত এই মতামতটি রেখেছেন আত্মজা থেকে প্রকাশিত তাঁর "রহস্যগল্পের নায়কেরা" শীর্ষক বইয়ের 'ব্যোমকেশ - পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দারা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬২।

ক্ষমতার সাথে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ায় এরপর ঋজুদার অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীগুলোয় তিতির চমৎকার মানিয়ে যায়।

অপর চরিত্র ভটকাই রুদ্রের মাসতুতো ভাই, সহপাঠী এবং কাছের বন্ধুও। অদ্ভুত এই নামের মত তার চরিত্রটিও অদ্ভুত আর মজাদার। ভটকাই হলো সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ এলাকার 'রক-পালিশ-করা-ছেলে'। খাওয়াদাওয়ায় তার জুড়ি মেলা ভার। *সাম্বাপানি* গল্পে প্রথম আবির্ভাব এই চরিত্রটির। কাহিনীর গম্ভীর আর বিষাদময় মুহূর্তগুলিকে হালকা করতে এবং সেই সাথে একটু হাস্যরসের মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ভটকাইয়ের তুলনা নেই।

ঋজু অবিবাহিত তবে রুদ্রর এক মাসি নয়নার সাথে তার একসময় একটি রোমান্টিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু অন্য কারোর সাথে নয়নার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সেই সম্পর্ক আর বেশিদূর এগোতে পারেনি। উল্লেখ্য, বুদ্ধদেব গুহর বিখ্যাত রোমান্টিক উপন্যাস *হলুদ বসন্ত* - র নায়িকার নাম নয়না, নায়কের নাম ঋজু।

ঋজু যেহেতু শুধু একজন শিকারী বা রহস্যভেদী নয়, তার পাশাপাশি একজন পরিবেশপ্রেমী এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষকও বটে, তাই তাকে নিয়ে লেখা কাহিনিগুলিতে রহস্য-রোমাঞ্চের সাথে উপরি পাওনা হল অপূর্ব নৈসর্গিক বিবরণ, আরণ্যক আবহ এবং প্রচুর অজানা অথচ কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য। প্রকৃতি-পরিবেশের সামূহিক অবক্ষয়ের ব্যাপারে ঋজুকে অনেক কথা বলতে এবং বেশ চিন্তিত থাকতে দেখা যায় শেষ দিকের গল্পগুলিতে। ঋজুদা-কাহিনিগুলি শেষ পর্যন্ত তাই পাঠকের কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেয়, যেমন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক উদাসীনতা, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে এবং অরণ্য ও বন্যপ্রাণের সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণ না হলে সমগ্র মানবজাতির বিনাশ আটকানো সম্ভব নয়।

ঋজুদা – কাহিনির মধ্যে উল্লেখযোগ্য -

গুগুনোগুম্বারের দেশে (জুলাই, ১৯৮১), অ্যাল্‌বিনো (জানুয়ারি, ১৯৮৩), রুআহা (১লা বৈশাখ, ১৩৯২), নিনিকুমারীর বাঘ (বইমেলা, ১৯৮৯), ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে (এপ্রিল, ১৯৭৩), মউলির রাত (১লা বৈশাখ, ১৩৮৫), বনবিবির বনে (অগাস্ট, ১৯৭৯), টাঁড়বারোয়া (নভেম্বর, ১৯৮১), ল্যাংড়া পাহান (জানুয়ারি, ১৯৯৮), ঋজুদার সঙ্গে বক্সার জঙ্গলে (জানুয়ারি, ১৯৯৭), কাঙ্গপোকপি (অক্টোবর, ১৯৯৩), ঋজুদার সঙ্গে স্যেশেলসে (ডিসেম্বর, ১৯৯৮), ঋজুদার সঙ্গে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে (শারদীয়া আজকাল, ১৯৯৯), ঋজুদার সঙ্গে পুরুণাকোটে (শারদীয়া তথ্যকেন্দ্র, ১৯৯৯), ঝিঙ্গারিয়ার মানুষখেকো (শারদীয়া বর্তমান, ২০০০), ঋজুদা এবং ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে (শারদীয়া কিশোর ভারতী, ১৯৯৯), ডেভিলস আইল্যান্ড (শারদীয়া বর্তমান, ২০০১), জুজুমারার বাঘ (শারদীয়া তথ্যকেন্দ্র, ১৯৯৯), হুলুক পাহাড়ের ভালুক (শারদীয়া কিশোর ভারতী, ২০০১), ঋজুদার সঙ্গে রাজডেরোয়ায় (শারদীয়া আজকাল, ২০০০), মোটকা গোগোই (শারদীয়া আজকাল, ২০০১), অরাটাকিরির বাঘ (শারদীয়া তথ্যকেন্দ্র, ২০০১), ঋজুদার সঙ্গে আন্ধারী তাড়োবাতে, ফাগুয়ারা ভিলা, ছোটিডোঙ্গরির চিতা, কেশকাল – এর বাঘিনী, লিলি সিম্পসনের বাঘ ইত্যাদি।

❖

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ - ২৩ অক্টোবর, ২০১২) চরিত্র রাজা রায়চৌধুরী, যিনি পাঠকের কাছে কাকাবাবু নামেই বেশি পরচিত, তিনি আসলে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন ভূতপূর্ব অধিকর্তা। বয়স তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন। ডাকনাম খোকা। তাঁর জ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্র হল প্রত্নতত্ত্ব। এ বিষয়ে কাকাবাবুর আগ্রহ যেমন অসীম, পান্ডিত্যও তেমনই অগাধ। প্রত্নতত্ত্বের সাথে জড়িত আছে প্রাচীন ইতিহাস। তাই

ইতিহাসের প্রতি কাকাবাবুর সবিশেষ আগ্রহ। ম্যাপ, ভূ-বিদ্যা, ভৌগলিক জ্ঞান, সার্ভে বা জরিপ, বিভিন্ন ভাষায় লেখা প্রাচীন পুথি ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর বিশেষজ্ঞতা আছে। তিনি প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপি বা হিয়েরোগ্লিফিকস্ পড়তে পারেন। প্রত্নতত্ত্বের ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা দেশের বাইরেও স্বীকৃত। বিদেশী জার্নালে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। দেশ-বিদেশের ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।

কর্মজীবনে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ছিলেন তিনি। কর্মসূত্রেই সে সময়ে তাঁকে নানান দুঃসাহসিক কাজ করতে হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাজই হল অধিকাংশ ক্ষেত্রে অজানার সন্ধান করা। স্বাভাবিকভাবেই, কিছুটা অনুমান, কিছুটা প্রমাণ, অর্জিত বিদ্যার সঠিক প্রয়োগ এবং উদ্দিষ্টের খোঁজে নানাভাবে অনুসন্ধান চালানো ছিল তাঁর কাজের অঙ্গ। এই কাজে তিনি এতটাই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন যে সরকারের বিভিন্ন স্তরে সকলেই তাঁকে চিনতেন এবং সম্মান করতেন। তাই একবার আফগানিস্তানের কাবুলে একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে জখম হওয়া তাঁর একটি পা বাদ যাওয়ার কারণে তিনি স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়ার পরেও বিশেষ বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য দিল্লির সরকারী মহল থেকে তাঁর কাছে অনুরোধ আসতো। কাকাবাবুর চরিত্রটিকে বেশ যত্ন করে গড়ে তুলেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সাধারণ গোয়েন্দাদের মতো গতানুগতিক চুরি-ডাকাতির সমাধান তিনি করতেন না।

কাকাবাবুকে তথাকথিত ডিটেক্‌টিভ বা গোয়েন্দা বলতে অনেকের আপত্তি। অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী একটি প্রবন্ধে বলেছেন –

"ডিটেক্‌টিভ' শব্দটির বাংলা নেই। 'গোয়েন্দা' শব্দটি আমরা ব্যবহার করে থাকি। শব্দটি ফারসি। এটি ডিটেকটিভ শব্দের যথাযথ প্রতিশব্দ। হিন্দি ভাষায় গোয়েন্দা অর্থে প্রচলিত আছে 'জাসুস্' শব্দটি। আরবি শব্দ, যার অর্থ গুপ্তচর বা গোয়েন্দা। সুকুমার সেন মশাই তাঁর 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি' গ্রন্থটিতে 'হুনুর' বলে একটি শব্দের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন – ইন্দো-ইরানীয় মূল থেকে প্রাচীন সংস্কৃত, আবেস্তা এবং প্রাচীন পারসিক ভাষায় 'সূনর' বলে একটি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, যার অর্থ – 'তীক্ষ্ণ বুদ্ধি,

জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দক্ষ ব্যক্তি' (ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ১৩)। বাংলায় কিন্তু 'হুনুর' শব্দটির প্রয়োগ শোনা যায় না। যদি শব্দটি প্রচলিত থাকতো তাহলে কাকাবাবু সম্পর্কে শব্দটি প্রযুক্ত হতে বাধা ছিল না। তিনি অবশ্যই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, জ্ঞানী, বিচক্ষণ এবং দক্ষ ব্যক্তি। যদিও তাঁর 'বিচক্ষণতা' ঠিক বাস্তববুদ্ধি নয়। মাঝে মাঝেই তিনি আকস্মিকভাবে এমন সব দুঃসাহসিক কাজ করতে এগিয়ে যান যাকে ঠিক বিচক্ষণতা বলা যায় না। দক্ষতা শব্দটিরও প্রয়োগের পরিসর নির্দিষ্ট নয়। কোনও মানুষই সব বিষয়ে দক্ষ হতে পারেন না। নিজস্ব ক্ষেত্রে কাকাবাবু খুবই দক্ষ। তাঁর ইতিহাস-জ্ঞান এবং প্রত্নতত্ত্বের জ্ঞান অত্যন্ত গভীর। শারীরিক ক্ষমতা সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি। যদিও তাঁর একটি পা নেই, কিন্তু তাঁর হাত দুটিতে প্রচন্ড শক্তি। কিন্তু কাকাবাবু জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান ছাড়াও আরও অনেক কিছু। কাজেই তাঁকে 'ডিটেক্‌টিভ' বলা যাবে কি না তা আমরা এখনই স্থির করতে পারব না।"[৪]

কাকাবাবু ডিটেকটিভ কিনা তা নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও, অ্যাডভেঞ্চারের সংজ্ঞা যদি হয় – "An undertaking involving danger and unknown risks.", তাহলে তিনি যে একজন অ্যাডভেঞ্চারার, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর দুঃসাহসিক অভিযান এবং সেই অভিযানের সূত্রে প্রায়শই কোনো অপরাধের কিনারা হয়ে যাওয়ার কাহিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসের পর উপন্যাসের পর বিবৃত করেছেন। কিশোরদের জন্য লেখা বলেই আখ্যানগুলিতে থাকে এক কিশোর – যার ডাকনাম সন্তু, ভালো নাম সুনন্দ রায়চৌধুরী। সবসুদ্ধ উপন্যাস আছে উনিশটি। প্রথম উপন্যাস *ভয়ংকর সুন্দর* – প্রকাশ ১৯৭২। এই উপন্যাসে সন্তু অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। শেষ উপন্যাসটিতে সে কলেজে ঢুকেছে। এই সন্তু হল রাজা রায়চৌধুরীর ভাইপো এবং কাকাবাবুর সমস্ত অভিযানের সঙ্গী। কিশোর পাঠকেরা সন্তুর সঙ্গে একাত্মবোধ করে। এই সন্তুই কাকাবাবুর কাহিনিগুলির কথকও বটে। সেজন্যই উপন্যাসগুলির কেন্দ্রীয় চরিত্রকে উল্লেখ করা হয় 'কাকাবাবু' বলে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা কাকাবাবু – কাহিনিগুলি প্রকাশকাল অনুসারে –

ভয়ংকর সুন্দর (ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২), সবুজ দ্বীপের রাজা (মে, ১৯৭৮), পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক (মার্চ, ১৯৮১), খালি জাহাজের রহস্য (ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪), মিশর – রহস্য (এপ্রিল, ১৯৮৫), কলকাতার জঙ্গলে (বইমেলা, ১৯৮৬), ভূপাল রহস্য (১লা বৈশাখ, ১৩৯০),

জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল (জানুয়ারি, ১৯৮৭), জঙ্গলগড়ের চাবি (১লা বৈশাখ, ১৩৯৪), রাজবাড়ির রহস্য (বৈশাখ, ১৩৯৫), বিজয়নগরের হীরে (জানুয়ারি, ১৯৮৯), কাকাবাবু ও বজ্রলামা (জানুয়ারি, ১৯৯০), নীলমূর্তি রহস্য (বইমেলা, ১৯৯২), ইচ্ছাশক্তি (বইমেলা, ১৯৯২), উল্কা – রহস্য (নভেম্বর, ১৯৯০), একটি লাল লঙ্কা (মে, ১৯৮৮), কাকাবাবু হেরে গেলেন ? (জানুয়ারি, ১৯৯২), সন্তু ও এক টুকরো চাঁদ (জানুয়ারি, ১৯৯৩), আগুন পাখির রহস্য (জানুয়ারি, ১৯৯৪), কাকাবাবু বনাম চোরাশিকারি (জানুয়ারি, ১৯৯৫), সন্তু কোথায়, কাকাবাবু কোথায় (জুন, ১৯৯৬), কাকাবাবুর প্রথম অভিযান (আগস্ট, ১৯৯৭), জোজো অদৃশ্য (জানুয়ারি, ১৯৯৮), কাকাবাবু ও চন্দনদস্যু (জানুয়ারি, ১৯৯৯), কাকাবাবু ও এক ছদ্মবেশী (জানুয়ারি, ২০০০), কাকাবাবু ও শিশুচোরের দল (জানুয়ারি, ২০০১), কাকাবাবু ও মরণফাঁদ (জানুয়ারি, ২০০২), কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার (জানুয়ারি, ২০০৩), কাকাবাবু ও আশ্চর্য দ্বীপ (জানুয়ারি, ২০০৪), কাকাবাবু ও সিন্দুক রহস্য (জানুয়ারি, ২০০৫), কাকাবাবু ও একটি সাদা ঘোড়া (জানুয়ারি, ২০০৬), এবার কাকাবাবুর প্রতিশোধ (ফেব্রুয়ারি, ২০০৭), কাকাবাবুর চোখে জল (জানুয়ারি, ২০০৮), কাকাবাবু আর বাঘের গল্প (জানুয়ারি, ২০০৯), আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে (জানুয়ারি, ২০১০), কাকাবাবু ও জলদস্যু (আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী, ১৪১৮)।

❖

গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল এবং শিপ্রানদী তীরবর্তী প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরের প্রেক্ষাপটে নবরত্ন সভার অন্যতম, বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কালিদাসকে গোয়েন্দা হিসেবে হাজির করেছেন অধ্যাপক সুকুমার সেন (১৬ জানুয়ারি, ১৯০১ - ৩ মার্চ, ১৯৯২)। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধির কারসাজিতে বেশ কিছু রহস্য সমাধান করেছেন। এমনকি এও দেখা গেছে, কোনো অপরাধ সংগঠিত করার আগে কালিদাসকে তুলে নিয়ে গিয়ে অন্য

জায়গায় আটকেও রাখা হয়েছে। সুকুমার সেনের গোয়েন্দাপ্রীতির কথা বহুল আলোচিত। তাঁর সুযোগ্য পৌত্র সুনন্দন কুমার সেন একটি প্রবন্ধে আমাদের জানিয়েছেন –

"পেশাগত দিক থেকে সুকুমার সেন তাঁর বিদ্যাচর্চার গণ্ডী আবদ্ধ রেখেছিলেন সাহিত্য এবং ভাষার মধ্যে, কিন্তু নেশাগত বিদ্যাচর্চার গণ্ডী ছিল আরো বিস্তৃত। যার মধ্যে পড়ে পুরাণ, মিথ, ইতিহাস, ভূত, গোয়েন্দা কাহিনী প্রভৃতি। ভৌতিক এবং গোয়েন্দা কাহিনী তাঁর একান্ত ভালোবাসার বিষয়।"[৫]

বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনি রচনার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে সুকুমার সেনের *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* বইটির কথা অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষায় এমনকি পাশ্চাত্যেও এই ধরণের বইয়ের উদাহরণ খুব বেশি পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের বা বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দাদের সম্পর্কেই যে এখানে আলোচনা করা হয়েছে তা নয়, তার পাশাপাশি আছে গোয়েন্দাকাহিনির সূক্ষ্ম বিচার, বিশ্লেষণ ও আঙ্গিকগত আলোচনা। অধ্যাপক সেন দীর্ঘ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতই গোয়েন্দা সাহিত্যেরও দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তার কারণ হয়তো সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে অপরাধপ্রবণতা। সেই কারণেই ভারতীয় সাহিত্যের আদিপর্ব থেকে শুরু করে একেবারে হাল আমলেও গোয়েন্দা কাহিনি, রহস্যকাহিনি বা অপরাধ কাহিনি লেখার ধারা কিন্তু অব্যাহত আছে। আর অধ্যাপক সেনের এই গবেষণামূলক বইতে পাশ্চাত্য গোয়েন্দাকাহিনির ধারাবাহিক ইতিহাস বিশেষ করে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সাহিত্য, যাকে গোয়েন্দা সাহিত্যের আঁতুড়ঘর বলে মান্যতা দেওয়া হয়, সেখানকার ইতিহাস বিশেষ করে চারের দশক পর্যন্ত একটি পাশ্চাত্য গোয়েন্দা ও রহস্য কাহিনির ধারাবাহিক ইতিহাস তিনি খুব যত্ন করে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই বইটির পাশাপাশি অধ্যাপক সেনের গোয়েন্দাপ্রীতির আরেকটি উদাহরণ হল তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'হোমসিয়ানা' ক্লাব। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবের উদ্দেশ্যই ছিল যারা গোয়েন্দা গল্প লেখেন বা পড়েন, তাঁদের চিন্তা, চর্চা বা আড্ডা দেওয়ার একটা পরিসর তৈরি করে দেওয়া। এই ক্লাবের নিয়মিত সদস্য ছিলেন ঐতিহাসিক প্রতুলচন্দ্র

গুপ্ত, সমরেশ বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দিলীপকুমার বিশ্বাস, রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ ঘোষ, বাদল বসু প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক-সাহিত্যপ্রেমীরা। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ এই সাত বছর বেশ রমরম করেই চলেছিল এই ক্লাব। তারপর ক্রমশই অনিয়মিত হয়ে পড়ে এর অধিবেশন।

অধ্যাপক সেনের গোয়েন্দা গল্প লেখার সময়কাল তাঁর দীর্ঘ জীবনের মাত্র দশটি বছর। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রায় পঞ্চাশটি গোয়েন্দা গল্প লিখেছেন, যেগুলি ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে পাঁচটি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছিল। *কালিদাস তার কালে, যিনি সকল কাজের কাজি, সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ, যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো* এবং *আছে তো হাতখানি*। বর্তমানে এই গল্পগুলি *গল্প সংগ্রহ* নাম দিয়ে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পগুলির প্রেক্ষাপট প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী, যেখানে গোয়েন্দাগিরির কাজে আবির্ভূত হয়েছেন স্বয়ং মহাকবি কালিদাস। কেন তাঁর গল্পে একজন প্রসিদ্ধ কবিকে গোয়েন্দা হিসেবে দেখানো হলো ? এর ব্যাখ্যা অধ্যাপক সেন নিজেই দিয়েছেন। তাঁর গোয়েন্দা কাহিনির সংকলনের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন –

"সাধারণ লোককথায় এমনকী মেয়েলি ছড়াতেও কালিদাসের বুদ্ধি চাতুর্যের অনেক কাহিনি ও কাহিনির টুকরো পাওয়া যায়। আগে যদি ডিটেকটিভ গল্পের চলন থাকত তবে আমাদের দেশে ভাল ডিটেকটিভ কাহিনি সে কাল থেকেই পাওয়া যেত। আমি কালিদাসকে ডিটেকটিভ কল্পনা করে কয়েকটি গল্প খাড়া করেছি।"[৬]

'কবি' শব্দটির প্রাচীনতম অর্থ হলো পরম বিচক্ষণ ব্যক্তি। গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে বিচক্ষণতা থাকা যে একান্ত প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং যিনি শুধু কবি নন, মহাকবি, তাঁর মধ্যে ভালো গোয়েন্দা হয়ে ওঠার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে। এর পাশাপাশি কবিদের থাকে পরম জ্ঞান। সুতরাং, এই দুই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিশেলে একজন দক্ষ গোয়েন্দা হিসেবে কালিদাসকে উপস্থিত করাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

কালিদাসের পাশাপাশি অধ্যাপক সেনের কাহিনিতে রাজকুমারী ইন্দুমতীও উপস্থিত। তিনি কালিদাসের স্ত্রী। কোনো কোনো গল্পে ইন্দুমতীরও চাতুর্যের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও শুভাকাঙ্ক্ষী মহামন্ত্রী শারদানন্দ। এছাড়াও বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার বেতালভট্ট ও ধন্বন্তরী, কালিদাসের বিশেষ বন্ধু। রাজকর্মচারী অগ্নিশর্মা সবসময় কালিদাসকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। খোঁজখবর নেওয়া, দৌড়োদৌড়ি করা এসব কাজে সে চৌখস।

শব্দবিদ্যার অনুসন্ধান সুকুমার সেনকে অনুপ্রাণিত করেছিল গোয়েন্দা গল্প রচনায়। যেহেতু প্রাচীনকালে কালিদাসকে মনে করা হত সব থেকে বুদ্ধিমান, সেই কারণেই তিনি কালিদাসকে গোয়েন্দা বেছেছিলেন। এই ব্যাপারে অধ্যাপক সেন প্রভাবিত হয়েছিলেন ওলন্দাজ লেখক রিচার্ড ভ্যান গুলিক এবং মার্কিন লেখক লিলিয়ান ডি লা টারের ভাবনা থেকে। কারণ এঁদের দুজনেরই গোয়েন্দা চরিত্র বাস্তব মানুষ, কাল্পনিক নয়। ভ্যান গুলিক লিখতেন চীনা বিচারক ডি-এর কাহিনি। আর ডি লা টারের গল্পের গোয়েন্দা ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিবিদ ও লেখক স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-১৭৮৪) এবং তার সহকারীর ভূমিকায় স্যামুয়েলের জীবনীকার ও শিষ্য জেমস বসওয়েল (১৭৪০-১৭৯৫)। এছাড়াও হয়তো ইউরোপীয় লেখক বিলিয়ান বেলাটফের দ্বারাও কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যিনি সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত নাটককার বেন জনসনকে চরিত্র বানিয়ে গপ্পো লিখেছিলেন।

❖

টাক মাথা, লম্বা সাদা দারি, নীল চোখ। মুখে চুরুট, মাথায় ছাইরঙা টুপি। সৈয়দ মুজতবা সিরাজের (১৪ অক্টোবর, ১৯৩০ - ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২) চরিত্র কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের জনপ্রিয় চরিত্র। যদিও তিনি পেশাদার গোয়েন্দা নন।

অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি কর্ণেল। প্রকৃতিপ্রেমিক ও পতঙ্গ-বিশারদ। 'ডিটেকটিভ' শব্দটি তাঁর খুব অপছন্দের। তাঁর নেমকার্ডে লেখা থাকে রিটায়ার্ড মিলিটারি কর্ণেল ও নেচারিস্ট। মনে হতেই পারে, এই পরিচয়ের সাথে গোয়েন্দাগিরির কোনো যোগ আছে কী ? সাধারণ মানুষের কাছে পুলিশ আর মিলিটারি দুটি ভূমিকাই অনেকটা কাছাকাছি। রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। অনেকেই কর্ণেলের সামরিক পরিচয় শুনে ঘাবড়ে যায়। সন্দেহ করে যে তিনি সিবিআই বা ওই জাতীয় কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রতিনিধি। কর্ণেলের অতীত সামরিক জীবন তাঁকে মাঝ-সত্তরেও যথেষ্ট দাপুটে রেখেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার বার্মার জঙ্গলে গেরিলা ফ্রন্টের নায়ক ছিলেন। চীন-ভারত যুদ্ধেও গেরিলা বাহিনীকে ট্রেনিং দিয়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী জীবনেও কাজে লেগেছে। দুর্গম পাহাড়, জঙ্গলে অভিযানেও তিনি সমানভাবে সহজ। শারীরিক কসরতেও তিনি অত্যন্ত সাবলীল। ঘুসি মেরে কিংবা ঝাঁপিয়ে পড়ে অপরাধীদের কাবু করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হন না। কর্ণেলকে কখনও কখনও টারজান, সুপারম্যান বা অরণ্যদেবের সমতুল্য মনে হয়। সেইসঙ্গে শানিত বুদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক দুই দিক দিয়েই তিনি সাধারণ মানুষের থেকে অনেক ওপরে। অসামান্যতা আরও বেশি প্রকট করে দেখানোর জন্যই বোধ হয় তাঁকে একজন বৃদ্ধ হিসেবে দেখানো হয়েছে। কর্ণেল-কাহিনিতে আরও বেশ কিছু সামরিক অনুষঙ্গ রয়েছে। যেমন, কর্ণেল নৌবাহিনীর সেনাদের সাথে সামরিক কোড মারফত যোগাযোগ করেন। নৌবাহিনীর লোকেরা কোনো অভিযানে সাফল্যের পর তাঁকে সামরিক সাংকেতিক কায়দাতেই অভিবাদন জানায়। একটি গল্পে অপরাধ তাঁকে টেনে নিয়ে যায় প্রাক্তন বিপ্লবীদের দিকে, যারা '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। কর্ণেল সে সময় লড়েছিলেন বার্মা ফ্রন্টে, বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে, কিন্তু তবুও কর্ণেলের মনে হয়, অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্রে তিনি বিপ্লবীদের জীবন ও যাপনের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন।

কর্ণেলের আরেকটি পরিচয়ের কথা না বললেই নয়। তিনি বিরল প্রজাতির ক্যাকটাস, অর্কিড, পাখি, প্রজাপতি খুঁজে বেড়ান। এ-ও এক ধরণের অনুসন্ধান। নিজের ছাদে তিনি গড়ে তুলেছেন এক আশ্চর্য বাগান। তাঁর সমস্ত অভিযানের সঙ্গী ও *দৈনিক সত্যসেবক* পত্রিকার সাংবাদিক জয়ন্ত, যাকে কর্ণেল ভালবেসে 'ডার্লিং' বলে ডাকেন, সেই জয়ন্ত এই

ছাদবাগানের নাম দিয়েছে 'শূন্যোদ্যান'। কর্ণেল তাঁর এই প্রকৃতিপাঠ বা নেচারস্টাডি বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকা *নেচার* - এ ছাপিয়ে বেশ মোটা টাকা উপার্জন করেন। জয়ন্ত যাকে মজা করে বলে, রথ দেখা আর কলা বেচা। গোয়েন্দাগিরি করে তিনি এক পয়সাও পারিশ্রমিক নেন না বরং নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করেন। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের কাজে তাঁর সহায়ক একটি দূরবীন ও একটি প্রজাপতি ধরার জাল। যদিও গোয়েন্দাগিরির কাজেও তিনি এ-দু'টিকে ভালোই ব্যবহার করে থাকেন।

মানবরহস্য আর প্রকৃতির রহস্য কর্ণেল-কাহিনিতে যেন এক সূত্রে বাঁধা। কোথাও তিনি বিরল অর্কিডের খোঁজ করতে গিয়ে অপরাধের সূত্র খুঁজে পান। আবার কোথাও প্রকৃতি সংক্রান্ত কোনও কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়ে হত্যা রহস্যের সমাধান করেন। প্রকৃতিদর্শনের অজুহাতে অকুস্থলে যাওয়া অথবা প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় তথ্যচিত্র বানাবেন এমন অজুহাত তিনি অক্লেশে ব্যবহার করেছেন অপরাধীর কাছ পর্যন্ত পৌঁছোনোর জন্য। কখনও 'কয়েন টস্' করে স্থির করা, প্রকৃতিতে মন দেবেন না কী রহস্যের পেছনে ছুটবেন। একবার তিনি এক ক্যাকটাস দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে না চেয়ে একজন পরিচিতের সাহায্যের আবেদনে সাড়া দেননি, পরে খুব আফসোস করেছিলেন। সব মিলিয়ে প্রকৃতি আর রহস্য যেন কর্ণেলের দুই হাত। জীবনের দুই ধারা। কর্ণেলের কথায় –

"...একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন। নেচারের মধ্যেও মাফিয়া লিডার আছে। টেবিলে যে ছবিগুলো দেখছেন, সেগুলো তাদেরই। নিরীহ ভদ্র প্রজাপতিরা রংবেরঙের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, আর এরা তাদের মেরে সেই মধু আত্মসাৎ করে। ...প্রকৃতি রহস্য থেকে অপরাধ রহস্যে ছোটাছুটি...অবশ্য দুটোর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। আমরা মানুষেরা যা ক্রাইম মনে করি, প্রকৃতিতে তা স্বাভাবিক ঘটনা। এই যা পার্থক্য।"[৭]

অর্কিড, ক্যাকটাস, প্রজাপতি ও অন্যান্য পোকামাকড় সম্বন্ধে কর্ণেলের জ্ঞান বিস্ময়কর। তিনি কখনও এই বিষয়ে প্রথাগত পড়াশোনা করেছেন কী না সে ব্যাপারে কোথাও জানা যায় না। তবে প্রকৃতি যে তাঁকে রহস্যভেদে সহায়তা করেছে বহুবার, সে নিদর্শন নানান

কর্ণেল-কাহিনিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন ধরা যাক, *স্টোনম্যান* গল্পে, একদল ছেলেমেয়ে বেড়াতে বেড়াতে একটি আদিবাসী দেবতার পাথরের মূর্তির কাছাকাছি এসে পড়ে। সেই দলের এক নৃতত্ত্বের ছাত্রী কৌতূহলবশত সেই মূর্তিটি নিয়ে টানাটানি করতেই তার মাথাটি খসে পড়ে সেই দলেরই তার এক সঙ্গী মারা যায়। নিছকই দুর্ঘটনা, কিন্তু মেয়েটির আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। কর্ণেল তাঁকে বাঁচানোর জন্য পুলিশের কাছে সম্বর হরিণের গল্প ফাঁদবার সিদ্ধান্ত নেন, যে হরিণেরা অনেক সময় শিং ধারালো করার জন্য পাথরের সঙ্গে শিং ঘষে। তার ফলেই এই কান্ড !! অর্থাৎ, একটি অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনার দায় থেকে একজনকে বাঁচাবার জন্য কর্ণেল প্রকৃতিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করলেন।

কর্ণেলের যেমন অগাধ পান্ডিত্য, তেমনই দৈহিক শক্তি। কেবল প্রাণীবিদ্যাই নয়, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস সবকিছুই তাঁর আয়ত্তে। *খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত, পাতাল গুহায় বুদ্ধমূর্তি* এইসব কাহিনিতে জানা যায়, কর্ণেল বেশকিছু প্রাচীন লিপির সাথেও পরিচিত। মধ্যযুগের ভারত পর্যটক আল বিরুণি সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল। আল বিরুণি যে স্বর্গীয় ঘোড়ার ছবি এঁকেছিলেন, তা এক অমূল্য সম্পদ। অর্থ দিয়ে তার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। *কালো পাথর* গল্পে তাঁর ভূ-বিদ্যা সম্পর্কে পান্ডিত্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

বহু আলোচক বিখ্যাত গোয়েন্দা গল্প লেখক আগাথা ক্রিস্টির চরিত্র এরকুল পোয়ারোর সাথে কর্ণেলের সাদৃশ্য খুঁজে পেলেও সিরাজ কখনও একথা মানতে চাননি। এমনকি, কর্ণেল যে জয়ন্তকে 'ডার্লিং' বলে ডাকেন, তাও নাকি এরকুল পোয়ারোর ফ্রেঞ্চ সম্বোধন 'মন আমি' বলার নকল, এ নিয়েও সিরাজ মজা করেছেন *ম্যালিকিন-রহস্য* - এ।

অবশ্য অন্যত্র সিরাজ কর্নেল ও পোয়ারোর তুলনা করেছেন। দু'জনেই চিরকুমার, আর দু'জনেই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। এছাড়া দুজনের মধ্যে আর কোনো মিল প্রায় নেই। কর্ণেলের সামরিক অতীত, এই বয়সেও টারজান-সুলভ দৈহিক সক্ষমতা এরকুল

পোয়ারোর ক্ষেত্রে অকল্পনীয়। যদি তাঁর সাধের স্যুট নষ্ট হয়ে যায় বা টুপিটা সামান্য হেলে পড়ে। পোয়ারো এসব বিষয়ে অসম্ভব খুঁতখুঁতে। বিভিন্ন রেস্তোরা ওঁর অবসর কাটানোর প্রিয় জায়গা। তিনি শখে সবজি বাগান করলেও কর্ণেলের মতো প্রকৃতিপ্রেমিক নন। প্রকৃতি সম্বন্ধে পন্ডিত তো ননই। সিরাজ জানিয়েছেন, তিনি কর্ণেলের আইডিয়া পেয়েছেন এক রক্তমাংসের মানুষের থেকে –

"মুখে সান্টা ক্লসের মতো সাদা গোঁফদাড়ি। টকটকে ফর্সা রঙ। পরণে প্যান্টশার্ট। পিঠে আঁটা একটা কিটব্যাগ। বাইনোকুলারে দূরের কিছু দেখছিলেন। মুখ তুলতে গিয়ে টুপি খসে পড়ল আর মাথায় চকচক করে উঠল চওড়া টাক। টুপিটা কুড়িয়ে টাক ঢেকে এগিয়ে গেলেন একটা ধ্বংস স্তূপের কাছে। সেখানে ফুলে ভরা ঝোপ। গুঁড়ি মেরে হাঁটু ভাঁজ করে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্যাপারটা রহস্যজনক।

তবে ভেবেছিলাম সাহেব ট্যুরিস্ট। কারণ ঘটনাস্থলে লালবাগের (মুর্শিদাবাদ) প্রখ্যাত নবাবি প্রাসাদ হাজারদুয়ারি। ১৯৩৬ সালের শীতকাল। আনাচে-কানাচে 'গাইড'-রা ওত পেতে বসে থাকে। মোকা বুঝে একজন গাইড তাঁকে ভুলভাল ইংরেজিতে ধ্বংসস্তূপটার ইতিহাস শোনাতে গেল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি মুচকি হেসে সাদামাটা বাংলায় বলে উঠলেন, এই প্রজাপতিগুলো বড্ড সেয়ানা।"[৮]

এইটুকু বাস্তবের চারপাশে কল্পনা ডালপালা মেলেছে। কর্ণেলকে অনেকেই বিদেশি ট্যুরিস্ট বলে ভুল করে। একবার তিনি তো *মাফিয়া রহস্য* - এ বিদেশি সাংবাদিকের পরিচয়ে রহস্যভেদ করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য, তাঁর প্রথম গল্পের নামের সূত্রেই প্রকৃতিরহস্য ও অপরাধ মিলেমিশে যায় – 'পরগাছা', যা কি না কর্ণেলের প্রিয় দার্শনিক বিষয়।

কর্ণেলকে সামরিক পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে সিরাজের উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট। বর্মার জঙ্গলে যুদ্ধ করে তিনি পাহাড় জঙ্গলকে চিনেছিলেন। এলিয়ট রোডের সানি লজে নিজের বাড়ির তেতলার ছাদে তিনি একটি 'মিনি' জঙ্গলই বানিয়েছেন। যুদ্ধে ট্রেঞ্চ ফায়ারের ব্যবহার জানার দরুণ *ত্রিশূল রক্ত* গল্পের রহস্যও তিনি ভেদ করেছেন। এই কাহিনিতে তিনি একাধারে সমরবিদ ও প্রকৃতিবিদ।

কর্ণেল রহস্যভেদী। অপরাধীকে ধরার দ্বায়িত্ব পুলিশের। সবসময় পুলিশের প্রতি তিনি যে আনুগত্য দেখান, তাও নয়। *নিশুতি রাতের ডাক* গল্পে তরুণ প্রতিভাবান ফুটবলার স্বপনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এসেছে। কর্ণেল তদন্ত করে বুঝেছেন, অভিযোগ মিথ্যা। কর্ণেল আইন বাঁচিয়ে স্বপনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। কারণ তিনি মনে করেন, মানুষের জন্যই আইন। আইনের জন্য মানুষের নয়। *প্লাবন* - এ পুলিশ যখন জলমগ্ন মানুষদের উদ্ধার করছে, তখন বিপ্লবী ঘনশ্যামের ধরা পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। কর্ণেল পরোক্ষে তাকে পালাতে সাহায্য করলেন। এই কাহিনিটিকে কী কর্ণেলের রাজনৈতিক সহমর্মিতা বলা যাবে না ? না কি সেটা নিছকই মানবিকতা ? অবশ্য কর্ণেলের কোনও রাজনৈতিক মতামত নেই। অন্য এক গল্পে মঙ্গল সিং একজন কুখ্যাত ডাকাত। তবে যে অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে ব্যাপারে সে নির্দোষ। পুলিশ তাকে আধমরা করে ভুয়ো সংঘর্ষের নামে জলে ভাসিয়ে দেয়। কর্ণেল মঙ্গল সিংকে দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হওয়া থেকে রক্ষা করেন। কিছু অর্থ-সাহায্য করে তাকে উৎসাহ দেন নতুন জীবন শুরু করতে। এইসব কাহিনি থেকে শুধু প্রকৃতি বা পতঙ্গ-প্রেম নয়, কর্ণেলের মানবপ্রেমী সত্তারও প্রকাশ ঘটে যায়।

অনেক ডিটেকটিভ কাহিনিতে গোয়েন্দার একজন সহকারী থাকে, যাকে সাধারণত গোয়েন্দাপ্রবরের চেয়ে বুদ্ধিতে এবং সাহসিকতায় খাটো করে দেখানো হয়, যাতে তার সঙ্গে তুলনায় ডিটেকটিভের প্রতিভা আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। কৌতুক কাহিনিকার লিকক এই সহকারী বা সঙ্গী ধরণের ব্যক্তির নাম দিয়েছেন Poor Nut অর্থাৎ আনাড়ি বা অনভিজ্ঞ, অল্প বুদ্ধি। তবে কর্ণেলের সঙ্গী জয়ন্ত সেই অর্থে Poor Nut নয়। সে এক শক্তিমান, বুদ্ধিমান, সাহসী, ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবক, এক নামী পত্রিকার সাংবাদিক। কর্ণেলের সাথে তার অসমবয়সী বন্ধুত্ব হলেও দু'জনের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল। জয়ন্ত অবশ্য প্রকৃতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। প্রজাপতি ও অর্কিডের পেছনে ছোটা তার কাছে বিরক্তিকর। সে বরং সেই সময়ে খবরের পেছনে ছুটবে। জয়ন্ত অবশ্য অন্যান্য বিষয়ে কর্ণেলের যোগ্য সহকারী। সে জুডো, বক্সিং, রাইফেল বা রিভলবার চালানো সবেতেই দক্ষ। সে একবার কর্ণেলের সাহায্য ছাড়াই একটা চোরাচালান চক্রকে ধরিয়ে দিয়েছিল। পুরস্কার স্বরূপ সরকার বাহাদুর তাকে ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি

দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে সে একজন ঝকঝকে যুবক, কর্ণেলের 'ডার্লিং'। জয়ন্ত ক্রাইম রিপোর্টার, তার সঙ্গে কর্ণেল অনেক অপরাধের সংঘটনস্থলে প্রবেশাধিকার পান। অন্যদিকে কর্ণেলের সঙ্গী হওয়ায় জয়ন্তও তার কাগজের জন্য বেশ কিছু 'এক্সক্লুসিভ স্টোরি' পায়। ফলে সাফল্য ও পদোন্নতি। কর্ণেল আর জয়ন্তর জুড়ি যেন রাজযোটক।

সাহিত্যে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের পাশে থাকে পুলিশ অফিসার। হোমসের সাথে যেমন ইন্সপেক্টর লেসট্রেড বা পোয়ারোর সাথে ইন্সপেক্টর জ্যাপের যোগাযোগ আছে, তেমনি কর্ণেলের সাথে অন্তরঙ্গতা আছে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ লাহিড়ীর, যাকে কর্ণেলের পরিচারক ষষ্ঠীচরণ বলে, 'লালবাজারের লাহিড়ীসাহেব'। অরিজিৎ-ও জয়ন্তর মতোই ঝকঝকে, বুদ্ধিদীপ্ত। সাধারণ গড়পড়তা পুলিশের থেকে সে খানিকটা বেশি - ই শিক্ষিত। পুনের ফিল্ম ইন্সটিটিউট থেকে পড়াশোনা করার শেষ করার পর আই.পি.এস পরীক্ষা দিয়ে সে পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছিল। মন অবশ্য পড়ে থাকে সেই চিত্র জগতে। এখনও সে সময় পেলে গ্যোদারের চিত্রনাট্য পড়ে। অনেক সময় অবশ্য পুলিশ, কর্ণেলের সব ব্যাপারে এই অতিরিক্ত 'নাক গলানো' - কে পছন্দ করে না। কিন্তু, সাধারণভাবে, পুলিশ প্রশাসন কর্ণেলের কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সাহায্যপ্রার্থী।

কর্ণেলের আর এক সহচর বন্ধু, কখনও কখনও সহকারীও বটে, কৃতান্তকুমার হালদার ওরফে কে কে হালদার। কর্ণেলের পাঠকের কাছে যিনি হালদারমশাই নামেই পরিচিত। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার। রিটায়ার্ড পুলিশ যে 'ফুলিশ' নয়, তা প্রমাণ করার জন্য তিনি একটি প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছেন। তিনি বাঙাল ভাষায় কথা বলেন এবং গোয়েন্দাগিরির খাতিরে ছদ্মবেশ ধরতে গিয়ে বিপাকে পড়েন। কর্ণেল-কাহিনির গম্ভীর আবহে তাঁর উপস্থিতি খানিকটা হালকা পরিবেশ তৈরি করে।

উল্লেখযোগ্য কর্নেল – কাহিনিগুলি হল -

কোকোদ্বীপের বিভীষিকা, ঘড়ি রহস্য, প্যান্থার রহস্য, মানুষখেকোর ফাঁদ, অরুনাচলের ইয়েতি, ডমরুডিহির ভূত, কালো ছাতার উৎপাত, অকালকুষ্মাণ্ড, প্রতাপগড়ের মানুষখেকো, গুর্গিন খাঁর দেয়াল, টুপির কারচুপি, টোরাদ্বীপের ভয়ংকর, হাড়িমরহস্য, কালোকুকুর, ঘটোৎকচের জাগরণ, দুঃস্বপ্নের দ্বীপ, চিরামবুরুর গুপ্তধন, কিংবদন্তির শঙ্খচূড়, তিব্বতী গুপ্তবিদ্যা, লোহাগড়ার দুর্বাসামুনি, তুরুপের তাস, ভূত্রাক্ষস, যেখানে কর্নেল, সবুজ বনের ভয়ংকর, কালো বাক্সের রহস্য, কোদণ্ডের টঙ্কার, ওজরাকের পাঞ্জা, পাতাল – খন্দক, সুন্দর বিভীষিকা, ম্যাকবেথের ডাইনীরা, স্বর্গের বাহন, বিগ্রহ রহস্য, দানিয়েলকুঠির হত্যারহস্য, কাকচরিত্র, আলেকজান্ডারের বাঁটুল, লাফাং চু দ্রিদিম্বা রহস্য, বলে গেছেন রাম শন্না, কোদণ্ড পাহাড়ের বা – রহস্য, ভীমগড়ের কালো দৈত্য, পদ্মার চরে ভয়ঙ্কর, ভুতুড়ে এক কাকতাড়ুয়া, রাজবাড়ির চিত্ররহস্য, প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য, সিংহগড়ের কিচনি – রহস্য, রাজা সলোমনের আংটি, বত্রিশের ধাঁধা, ব্যাকরণ রহস্য, আজব বলের রহস্য, পোড়ো খনির প্রেতিনী, নীলপুরের নীলারহস্য, হায়েনার গুহা, হিটাইট ফলক রহস্য, ঠাকুরদার সিন্দুক রহস্য, রায়বাড়ির প্রতিমা রহস্য, কালিকাপুরের ভূত রহস্য, ইভনিং ভিলা, এগারোর অঙ্ক, হনিমুন লজ, পরগাছা, ফাঁদ, জিরো জিরো জিরো, সোনার ডমরু, প্রেম, হত্যা এবং কর্নেল, খোকন গেছে মাছ ধরতে, জানালার নীচে একটা লোক, দুই নারী, হাঙর, কালো পাথর, ত্রিশূলে রক্তের দাগ, টয় পিস্তল ইত্যাদি।

❖

বিজ্ঞানী জগবন্ধু মুখার্জী ওরফে জগুমামা ও তার ভাগ্নে টুকলুকে নিয়ে কিশোর সাহিত্যের আসরে এলেন ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় (জন্ম - ৩০ অক্টোবর, ১৯৫৮)। জগুমামা ঠিক পেশাদার গোয়েন্দা নন, কিন্তু তিনি প্রায়ই বিজ্ঞান-সংক্রান্ত নানান রহস্যময় ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েন। সাথে থাকে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ও ভাগ্নে, টুকলু। এই টুকলু-জগুমামার

কাহিনি লেখার সূত্রপাত কীভাবে হল, *জগুমামা-র উৎস-সন্ধানে* নামক একটি লেখায় লেখক স্বয়ং সে কথা আমাদের জানিয়েছেন –

"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিজ্ঞানে এম.এস.সি করে আশির দশকের শুরুতে আমি পারিবারিক কারণে অধ্যাপনা বা গবেষণার কাজ ছেড়ে যুক্ত হয়েছি *কিশোর ভারতী* পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে। .....আমার ভাগ্নে টুকলু তখন সদ্য-কিশোর। গল্পের পোকা। বিশেষত রহস্য-রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চারের। তাকে নিয়মিত বইয়ের জোগান দিয়েও থামাতে পারছি না। ..... টুকলুর জন্যে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন মাথায় অদ্ভুত একটা প্লট এসে হাজির হল। এর কিছুকাল আগেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্ব শেষ হয়েছে। আমার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল 'সাইটোজেনেটিক্স'। এর মধ্যে কোষ, টিস্যু, জেনেটিক্স বা জিনতত্ত্ব – সব অন্তর্গত। তখন বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে কিছুদিন হল 'টিস্যু কালচার' শুরু হয়েছে। কৃত্রিম পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন করে নতুন টিস্যু তৈরির প্রচেষ্টা চলেছে। আমরা রুদ্ধ বিস্ময়ে দেখছি। এই বিষয়টাই এসে গেল কাহিনির মোড়কে। যদি এইভাবে টিস্যু কালচার করে 'কৃত্রিম অঙ্গ' তৈরি করা যায়, ধরা যাক একটা কনুই থেকে 'কাটা হাত', তবে কেমন হয় ? সেই জীবন্ত 'হাত'কে যদি রিমোট সেন্সিং-এর মাধ্যমে চালনা করা যায় ? 'কাটা হাত'-এর গল্পটা শুরু করে দিলাম। বিজ্ঞানী রহস্যভেদী 'জগুমামা ও টুকলু' যাচ্ছে অভিযানে।

...এই হল 'জগুমামা ও টুকলু'-র উৎস। সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠিয়ে দিলাম 'আকাশবাণী'-তে। গল্প পাঠ তো করলামই, তার সঙ্গে 'হাত'-এর নাট্যরূপও দেওয়া হল। রেডিও-র নাটক। এরপর উপন্যাস আকারে শারদীয়া *কিশোর ভারতী* ১৯৮৫-তে প্রকাশিত হল 'হাত'। ...সুতরাং 'জগুমামা' থামলেন না। একের পর এক অদ্ভুত সব বিজ্ঞানধর্মী রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। সঙ্গে মামা-অন্ত প্রাণ টুকলু।"[৯]

জগুমামা মানুষটি কেমন ? তাঁর স্রষ্টা আমাদের জানাচ্ছেন –

"বিজ্ঞানীরা সাধারণত যেমন হন, তেমন। কনফার্মড ব্যাচেলর। সাংসারিক বিষয়ে বিশেষ আকর্ষণ নেই। অগোছালো, আত্মভোলা। গবেষণায় মগ্ন থাকেন বছরের অধিকাংশ সময়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় বিজ্ঞান-অধ্যাপকের মর্যাদায় ভূষিত। ...আপাত-স্বভাবে বিজ্ঞানী হলেও জগুমামার রহস্য অনুসন্ধানের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। বিজ্ঞান ছাড়াও সাহিত্য এবং ইতিহাস, সমাজ-অর্থনীতি বিষয়ে ব্যাপক চর্চা। গোয়েন্দাদের মতোই তিনি ক্ষিপ্র, গভীর যুক্তিবাদী এবং অন্তর্ভেদী দৃষ্টি

সম্পন্ন মানুষ। একইসঙ্গে তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীলও। সরকারি অনুমতি নিয়ে লাইসেন্সড্ রিভলবার থাকে তাঁর সঙ্গে।

একমাত্র টান কলকাতায় দিদির বাড়ি। তাঁরাই জগুমামার আত্মীয়, প্রিয় আপনজন। গবেষণার ফাঁকে অবসর কাটাতে বছরে দু-তিনবার আসেন। কখনও-বা বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনাও থাকে। সেটা কখনওই একা যাওয়া নয়। ভাগ্নে টুকলু থাকবেই। বেশিরভাগ সময়ে খ্যাপাটে অনন্ত সরখেলও জুটে যান। সে কোনও রহস্য সমাধান হোক, কিংবা নির্ভেজাল ভ্রমণই হোক। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে, নির্ভেজাল অবসর কাটানোর সময়েও অদ্ভুত-অদ্ভুত রহস্য এসে পথ আটকে দাঁড়ায়।”[১০]

অনন্ত সরখেল, যিনি পরবর্তীকালে প্রায় সব কাহিনিতেই জগুমামার আরেক সহচরের ভূমিকা পালন করবেন, তাঁরও আবির্ভাব ঘটেছিল প্রথম গল্পেই, রাঁচিগামী ট্রেনে। টুকলু-জগুমামার সহযাত্রী হিসেবে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট চরিত্র ফেলুদার অন্যতম সহচর বিখ্যাত রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুর কথা, যাঁর সাথে ফেলু - তোপসের প্রথম আলাপ এমনই এক ট্রেনে, ‘সোনার কেল্লা’ গল্পে। সরখেল মশাই হলেন খ্যাপাটে, ভোজনরসিক, ভিতু এক চরিত্র, যিনি বেশিরভাগ সময়েই ভুলভাল ইংরাজি বলেন, অকারণে ভয় পান এবং অতিরিক্ত কৌতূহল দেখাতে গিয়ে বিপদে পড়েন। আর অবশ্যই, খাদ্য দেখলে তিনি নিজেকে সামলাতে পারেন না, ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এছাড়া আছে টুকলু, জগুমামার ছায়াসঙ্গী। বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে, কিশোর-বয়স থেকেই সে মামার ভক্ত। বর্তমানে সে ঝকঝকে তরুণ। পেশায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। সে নিয়মিত শরীরচর্চা করে। বেশ কিছুদিন সে ক্যারাটেও শিখেছিল। টুকলু-জগুমামা কাহিনির লেখক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় নিজেই আমাদের জানিয়েছেন যে, তিনি এই ধরণের লেখালেখির ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায় এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে গভীরভাবে ঋণী। অনন্ত সরখেলের ক্ষেত্রে যেমন জটায়ুর প্রভাব, তেমনই টুকলুর ক্ষেত্রেও সুনীলের কাকাবাবু-কাহিনির সন্তুর প্রভাব সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল টুকলু- জগুমামার রোমাঞ্চকর অভিযানের। ১৯৮৫-র শারদীয়া কিশোর ভারতী-তে প্রথমবার আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের। পৃথিবীর দুই গোলার্ধে ছড়িয়ে থাকা দু'টি রহস্য *অন্ধকার ভালো নয়* এবং *ভয়ের আড়ালে ভয়,* লক্ষ্ণৌ শহরের প্রেক্ষাপটে ছড়িয়ে থাকা *আরবি পুঁথি রহস্য,* তোর্সা নদীর পারে *জঙ্গলে ভয় ছিল* অথবা রাশিয়ায় গিয়ে *জ্যান্ত পাথর* - এর রহস্য উদঘাটনের কাহিনির হালকা মেজাজের রচনাশৈলীর সঙ্গে মিশে গেছে ভ্রমণের আনন্দও।

❖

ইংরেজ লেখক জেমস হ্যাডলি চেজের (১৯০৬-৮৫) সৃষ্ট সাংবাদিক চরিত্র স্ল্যাডেন কিংবা একেবারে সমসাময়িক স্কটিশ লেখক ভ্যাল ম্যাকডরমিডের চরিত্র সাংবাদিক লিন্ডসে গর্ডনের মতো বাংলা সাহিত্যেও এমন সাংবাদিককে দেখা যায়, যিনি পেশাগত কারণেই জড়িয়ে পড়েন নানান অপরাধের সঙ্গে। বিখ্যাত বাঙালি ক্রীড়াসাংবাদিক ও সাহিত্যিক রূপক সাহার (জন্ম ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮) সৃষ্ট চরিত্র কালকেতু নন্দীও স্রষ্টার মতনই বিখ্যাত এক সংবাদপত্রের ক্রীড়াসাংবাদিক। কালকেতুকে নিয়ে রূপক সাহা বেশ কয়েকটি ক্রাইমকাহিনি লিখেছেন। কালকেতু পেশাদার সাংবাদিক হলেও নানান সময়ে ফুটবল জগতের ডোপিং কিংবা ক্রিকেটের ম্যাচ ফিক্সিং জাতীয় ক্রীড়াজগতের নানান অপরাধের সমাধানে নেমে পড়ে।

******

রহস্য সমাধানে আরেক সাংবাদিক চরিত্র তুবড়িমামা ও তার সহকারী ভাগ্না-ভাগ্নিদের সাহিত্যের আসরে হাজির করেছেন আরেক বাঙালি সাহিত্যিক সব্যসাচী সরকার। যদিও

এই সাংবাদিকের একটা পোশাকি নাম আছে, কিন্তু রহস্যগল্পের পাঠকদের কাছে তিনি তুবড়িমামা নামেই বেশি পরিচিত।

❖

আমাদের কাজের পরিসর যদিও পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যের গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তবুও, বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষিতে মিসির আলির প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেই নয়। মিসির আলি, বাংলাদেশের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ (১৩ই নভেম্বর, ১৯৪৮ – ১৯শে জুলাই, ২০১২) সৃষ্ট একটি জনপ্রিয় রহস্যময় চরিত্র। মিসির আলির কাহিনিগুলোও তাঁর মতোই রহস্যময়। সেগুলোকে ঠিক গোয়েন্দা কাহিনি বলা যাবে না। কিংবা সেগুলো ‘ক্রাইম ফিকশন’ বা ‘থ্রিলার’-এর মতো খুনি-পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা-ধাওয়া নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক, বিজ্ঞাননির্ভর এবং যুক্তিনির্ভর কাহিনির বুনটে বাঁধা। বরং অনেক ক্ষেত্রে একে রহস্যগল্প বলা চলে। চারিত্রিক দিক দিয়ে মিসির আলি চরিত্রটি হুমায়ূন আহমেদের আরেক অনবদ্য সৃষ্টি হিমু-র পুরোপুরি বিপরীত। তরুণ হিমু চলে প্রতি-যুক্তির (anti-logic) তাড়নায়, অপরপক্ষে প্রৌঢ় মিসির আলি অনুসরণ করেন বিশুদ্ধ যুক্তি (pure-logic)। এই যুক্তিই মিসির আলিকে রহস্যময় জগতের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনে সাহায্য করে। সেসব কাহিনির প্রতিফলন ঘটেছে মিসির আলি সম্পর্কিত প্রতিটি উপন্যাসে।

মিসির আলি অবশ্য গোয়েন্দা নন, পেশায় মনোবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব শিক্ষক। কোনো এক কারণে তাঁর চাকরি চলে যায়। কোনো রহস্যের কিনারা করতে অর্থের বিনিময়ে কাজ করেন না মধ্যবয়সী এই মানুষটি, তিনি কাজ করেন নিতান্তই শখের বশে। সব সময় যে রহস্যের মীমাংসা হয় তা–ও নয়। কখনো তাঁকে মনে

হয় কট্টর যুক্তিবাদী, যিনি কিনা বিজ্ঞানের সত্যের বাইরে কিছুই বিশ্বাস করেন না। আবার কখনো এই লোকটিই প্রকৃতির বিপুল রহস্য বিষয়ে নিশ্চুপ।

"প্রকৃতি মানুষকে truth স্পর্শ করার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু absolute truth-কে স্পর্শ করার অনুমতি দেয় নি। ঐটি প্রকৃতির রাজত্ব। মানুষের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।"[১১]

কখনো বা জীবনানন্দ দাশের বই পড়ে মনের অস্থিরতা কমাতে চান তিনি; কোথাও আবার বলেন, কবিতা হলো এমন একটি বিষয় যা নিয়ে পড়াশোনা করার তার আগ্রহ নেই। 'নিশীথিনী' গল্পে জানা যায়, কবিতার বই তিনি কখনো সজ্ঞানে কেনেননি, তাঁর বেশিরভাগ কবিতার বই-ই নীলু নামের এক ছাত্রীর দেওয়া উপহার।

মিসির আলির বয়স ৪০-৫০-এর মধ্যে। তার মুখ লম্বাটে। সেই লম্বাটে মুখে এলোমেলো দাড়ি, লম্বা উসকো-খুসকো কাঁচা-পাকা চুল। প্রথম দেখায় তাকে ভবঘুরে বলে মনে হতে পারে; কিছুটা আত্মভোলা। তার হাসি খুব সুন্দর, শিশুসুলভ। মিসির আলির স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো।

তিনি মানুষের মন, আচরণ, স্বপ্ন এবং নানাবিধ রহস্যময় ঘটনা নিয়ে অসীম আগ্রহ রাখেন। হুমায়ূন আহমেদের নিজের ভাষ্যে -

"মিসির আলি এমন একজন মানুষ, যিনি দেখার চেষ্টা করেন চোখ বন্ধ করে। যে পৃথিবীতে চোখ খুলেই কেউ দেখে না, সেখানে চোখ বন্ধ করে দেখার এক আশ্চর্য ফলবতী চেষ্টা।"[১২]

চরিত্রটির পরিচিতি দিতে গিয়ে হুমায়ূন আহমেদ বলছেন –

"মিসির আলি একজন মানুষ, যাঁর কাছে প্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলা বড় কথা, রহস্যময়তার অস্পষ্ট জগৎ যিনি স্বীকার করেন না।"[১৩]

মিসির আলি চরিত্রে হুমায়ূন আহমেদ, পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটি বৈশিষ্ট্য 'যুক্তি' এবং 'আবেগ'-কে স্থান দিয়েছেন।

মিসির আলি একজন ধূমপায়ী। যদিও তাঁর নির্দিষ্ট কোনো সিগারেটের ব্র্যান্ড নেই। নানান সময় নানান ব্র্যান্ডের সিগারেট খান। তবে তিনি প্রায়ই সিগারেট ছেড়ে দেবার চেষ্টা করেন। তার শরীর বেশ রোগাটে আর রোগাক্রান্ত। নানারকম রোগে তার শরীর জর্জরিত: লিভার বা যকৃৎ প্রায় পুরোটাই অকেজো, অগ্ন্যাশয়ের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে, রক্তের উপাদানে গড়বড়, হৃৎপিণ্ড ড্রপ বিট দেয়। এজন্য কঠিন এসব রোগের পাশাপাশি সাধারণ যেকোনো রোগই তাকে বেশ কাহিল করে ফেলে। ফলে প্রায়ই অসম্ভব রোগাক্রান্ত হয়ে তাকে হাসপাতালে থাকতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন।

যুগে যুগে অতি শক্তিধর অতি সাহসীরাই জনপ্রিয় হিরো বা নায়ক হয়। সুপারম্যান, ব্যাটম্যান, জেমস বন্ড কি আমাদের ফেলু মিত্তির বা ব্যোমকেশ—সবাই-ই নানা বিপদ-আপদ ঝড়ঝাপটার মধ্যে অবিচল ও শেষ পর্যন্ত জয়ী। কিন্তু ছাপোষা এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রোগা ও বেঁটে, ভগ্নস্বাস্থ্য, বারবার অসুস্থ হয়ে যে কিনা হাসপাতালে ভর্তি হয়, এমন চাকচিক্যহীন কোনো চরিত্রও যে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠতে পারে, নন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের মিসির আলি তার উদাহরণ।

মিসির আলিরও বহু বছর আগে বহুল জনপ্রিয় ফিকশন চরিত্র ছিলেন শার্লক হোমস। প্রবল যুক্তিবাদী, প্রচণ্ড বুদ্ধিমান, তুখোড় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে একটা উপসংহার বা শেষ সমাধানে পৌঁছাবার প্রবণতা—এসব চারিত্রিক গুণাবলির কারণে অতি দ্রুত শার্লক হোমস হয়ে উঠেছিল উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত ও জনপ্রিয়

ফিকশন চরিত্র। কী আছে শার্লক হোমস বা মিসির আলির চরিত্রে, যা আধুনিক মানুষকে এত টানে?

উত্তরটা হলো লজিক। যুক্তি। অ্যারিস্টটলের হাতে যে সিলোজিসমের জন্ম, যুক্তি আর তর্কের ওপর ভর করে সমাধানে পৌঁছার পদ্ধতি—উনবিংশ শতাব্দীতে এসে তা যেন পূর্ণতা পেল। এটা সেই সময় যখন আধুনিক মানুষ নিজে না দেখে বা না জেনেবুঝে কোনো কিছুই আর বিশ্বাস করতে চাইছে না, যে কোনো থিওরির পক্ষে চাইছে অকাট্য প্রমাণ বা যুক্তি। প্রচলিত বিশ্বাস বা পৌরাণিক কাহিনির ওপর আস্থা হারাচ্ছে তারা। আর এই শতাব্দীতে বিজ্ঞান প্রতিদিনই অজানা সব রহস্য আর প্রশ্নের সমাধান খুঁজে দিচ্ছে। মন, স্বপ্ন বা চিন্তার গতিধারা নিয়েও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড। যৌক্তিক ধারণার বাইরে থাকছে না আর কিছুই। এই ধীমান চরিত্রগুলোর যুক্তি–পরম্পরাবোধ তথা 'ডিডাকটিভ রিজনিং'–এ অসামান্য পারদর্শিতা আধুনিক মানুষকে দ্রুতই মুগ্ধ করে ফেলে। এভাবেই গ্ল্যামারহীন চরিত্রগুলোও মেধা আর বুদ্ধির জোরে হয়ে উঠতে থাকে 'নায়ক'।

মিসির আলি যুক্তিনির্ভর একজন মানুষ বলেই অনেক সাহসী। ভূতাশ্রিত স্থানেও রাত কাটাতে তিনি পিছপা হোন না, বরং এজন্য থাকেন যে, তাতে তিনি রহস্যময়তার ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারবেন। মিসির আলির অনেকগুলো পারঙ্গমতার মধ্যে অন্যতম হলো তিনি যে কাউকে, বিশেষ করে ঠিকানাওয়ালা মানুষকে, খুব সহজে অজানা স্থানেও খুঁজে বের করতে পারেন। এজন্য তিনি টেলিফোন ডিরেক্টরি, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর, টিভি-বেতার-এর লাইসেন্স নম্বর, পুলিশ কেস রিপোর্ট, হাসপাতালের মর্গের পোস্টমোর্টেম ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। মিসির আলি প্রকৃতির বিস্ময়ে বিস্মিত হলেও প্রচণ্ড যুক্তির বলে বিশ্বাস করেন প্রকৃতিতে রহস্য বলে কিছু নেই। মিসির আলি ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে একজন নাস্তিক। মিসির আলি সিরিজের প্রথম উপন্যাস *দেবী* - র ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি নিজেকে নাস্তিক বলে অভিহিত করেছেন। তবে কিছু জায়গায় তাকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী অর্থাৎ একজন আস্তিক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

মিসির আলি মূলত নিঃসঙ্গ একজন মানুষ, মোটামুটি সব উপন্যাসে তাকে এভাবেই রূপায়িত করা হয়। 'আমার কেবলমাত্র আছে একাকিত্ব। এই একাকিত্ব আমাকে রক্ষা করে !' কিন্তু *অন্যভুবন* উপন্যাসে মিসির আলি বিয়ে করে ফেলেন বলে উল্লেখ আছে। তিনি বিয়ে করেন নীলুফারকে, যার প্রথম আবির্ভাব ঘটে দেবী উপন্যাসে। পরবর্তীতে *নিশীথিনী* উপন্যাসে লেখক মিসির আলির প্রতি নীলুফারের আবেগ দেখিয়েছেন। পরের অনেক উপন্যাসে এই সাময়িক আবেগ দেখা গেলেও মিসির আলি সব আবেগ, ভালোবাসার ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করেছেন। তাই পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে আবার তাকে নিঃসঙ্গ একজন মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এপ্রসঙ্গে লেখক নিজেই স্বীকার করেন যে, 'এটি বড় ধরনের ভুল' ছিলো। মিসির আলির মতো চরিত্র বিবাহিত পুরুষ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আর সেই ভুল শুধরে পরবর্তী উপন্যাসগুলোতে আবার মিসির আলিকে নিঃসঙ্গ হিসেবে উপস্থাপন করেন লেখক। ফলে মিসির আলি চরিত্রটি যা দাঁড়ায়,

মিসির আলি ভালোবাসার গভীর সমুদ্র হৃদয়ে লালন করেন, কিন্তু সেই ভালোবাসাকে ছড়িয়ে দেবার মতো কাউকেই কখনও কাছে পান না। ভালোবাসার একাকিত্বে জর্জরিত মিসির আলির নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে বিভিন্ন সময় কিশোরবয়সী কাজের লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, *আমি এবং আমরা* উপন্যাসে বদু নামের একটি ১৫-১৬ বছরের কাজের ছেলের উল্লেখ রয়েছে। *দেবী* ও *নিশীথিনী* গল্পে হানিফা নামে একটা কাজের মেয়ে ছিল। এরকম কাজের লোককে মিসির আলি লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করেন। আবার *অন্যভুবন* উপন্যাসে রেবা অথবা *আমিই মিসির আলি* উপন্যাসে ইয়াসিন নামের একটি গৃহ পরিচারক/পরিচারিকার উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদেরকে গৃহকর্তা তথা মিসির আলির ওপরে নানান ব্যাপারে ছড়ি ঘোরাতে দেখা যায়।

মিসির আলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত সারমর্ম করতে হুমায়ূন আহমেদই লিখেন : মিসির আলি নিঃসঙ্গ, হৃদয়বান, তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী। কাহিনী অনুসারে তিনি অকৃতদার। চরিত্রটি লেখকেরও, প্রিয় চরিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম।

মিসির আলি চরিত্রের কিছু দিক কমবেশি সবারই জানা। যেমন—এক. একবার কোনো কিছু নিয়ে উদ্দীপ্ত হলে শেষ না দেখা পর্যন্ত তিনি ছাড়বেন না; দুই. তাঁর নৈতিকতা জোরালো, মমত্ববোধও প্রবল; তিন. তিনি অসম্ভব বুদ্ধিমান এবং জানেন যে কোন বিষয়গুলো মনে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ; চার. তাঁর পর্যবেক্ষণক্ষমতা তুখোড়, খুঁটিনাটিও চোখ এড়ায় না; পাঁচ. ধূমপানের নেশা তাঁর প্রবল; ছয়. ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারে শীতল ও দূরত্ব বজায় রাখতে ভালোবাসেন, প্রেমের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা প্রযোজ্য।

এই গুণগুলো সাহিত্যের অন্যান্য সত্যসন্ধানী চরিত্রগুলোর মধ্যেও কমবেশি আছে। কেবল তফাৎ হলো এই যে মিসির আলি অন্যদের মতো উদ্ধত ও দুর্বিনীত নয়, বরং বিনয়ী ও সদাচারী। ফকফকা জ্যোৎস্নারাত বা দুপুরের ঝুম বৃষ্টি তাঁকে আচ্ছন্ন করার ক্ষমতা রাখে। একটি হারিয়ে যাওয়া শিশুকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টার অন্ত থাকে না তাঁর। 'ডিডাকটিভ রিজনিং' এই চরিত্রের ভালোই আছে, কিন্তু তা বলে তিনি অতটা 'ক্যালকুলেটিভ' বা হিসাবি নন। অপ্রয়োজনীয় অনেক কাজই মিসির আলি করে থাকেন।

মিসির আলি চরিত্রটি এতটাই পাঠকের দরবারে জনপ্রিয়তা পেয়েছে যে, অনেকেই তাকে রক্তমাংসের মানুষ ভাবতে শুরু করেছেন। হুমায়ূন আহমেদ প্রায়ই জিজ্ঞাসিত হন যে, মিসির আলি কোনো বাস্তব চরিত্রকে দেখে লেখা কিনা। এর নেতিবাচক উত্তর পেয়ে অনেকেই আবার মিসির আলি চরিত্রটির মধ্যে লেখকেরই ছায়া খুঁজে পান। এপ্রসঙ্গে স্বয়ং হুমায়ূন আহমেদই উত্তর করেন -

"না, মিসির আলিকে আমি দেখিনি। অনেকে মনে করেন লেখক নিজেই হয়তো মিসির আলি। তাঁদেরকে বিনীতভাবে জানাচ্ছি- আমি মিসির আলি নই। আমি যুক্তির প্রাসাদ তৈরি করতে পারি না এবং আমি কখনও মিসির আলির মতো মনে করিনা প্রকৃতিতে কোনো রহস্য নেই। আমার কাছে সব সময় প্রকৃতিকে অসীম রহস্যময় বলে মনে হয়।"[১৪]

কিন্তু এই অভয়বাণী সত্ত্বেও *নলিনী বাবু B.Sc.* উপন্যাসে লেখককেই মিসির আলির ভূমিকায় দেখা যায়, এবং তিনি যে মিসির আলি থেকে আলাদা সেট স্পষ্ট উল্লেখ করেন,

"আমি (লেখক) এই ভেবে আনন্দ পেলাম যে, সালেহ চৌধুরী (লেখকের সফরসঙ্গী) মিসির আলিকে উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে দেখছেন না। অতি বুদ্ধিমান মানুষও মাঝে মাঝে বাস্তব-অবাস্তব সীমারেখা মনে রাখতে পারেন না।"[১৫]

দ্বন্দময় এই মিসির আলি চরিত্রটকে হুমায়ূন আহমেদ কেন সৃষ্টি করলেন? মিসির আলির মধ্যে তাঁর নিজের ছায়াই বা কতটুকু আছে?

নিশীথিনী উপন্যাসে দেখতে পাচ্ছি, প্রথমবারের মতো মিসির আলির বয়স ও রোমান্টিকতা নিয়ে মুখ খুলছেন লেখক -

"নীলু উঠে দাঁড়াল। এত সুন্দর মেয়েটি। শ্যামলা গায়ের রঙ। চোখে-মুখে তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। কিন্তু তবু এমন মায়া জাগিয়ে তুলছে কেন ? মিসির আলি লজ্জিত বোধ করলেন। তাঁর বয়স একচল্লিশ। এই বয়সের একজন মানুষের মনে এ জাতীয় তরল ভাব থাকা উচিত নয়।"[১৬]

একচল্লিশ ! মিসির আলিকে অনেকেই বৃদ্ধ অধ্যাপক ভাবেন, আসলে তা নয়। আর তিনি একেবারে কাঠখোট্টা লোকও নন তাহলে ! নীলুর প্রতি তাঁর ভালো লাগা ও আকর্ষণ অনেকবারই প্রকাশ পেয়েছে। *নিষাদ* উপন্যাসে নিজের সম্পর্কে মিসির আলির ভাবনা –

"অদ্ভুত মানবজীবন। মানুষকে আমৃত্যু দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে বাস করতে হয়। তিনি নিজেও তাঁর জীবন দ্বিধার মধ্যে পার করে দিচ্ছেন। সমাজ সংসার থেকে আলাদা হয়ে বাস করতে তাঁর ভালো লাগে, আবার লাগে না। ... একজন মমতাময়ী স্ত্রী কয়েকটি হাসি-খুশি শিশুর মাঝখানে নিজেকে কল্পনা করতে ভালো লাগে। আবার পর মুহূর্তেই মনে হয় - এই তো বেশ আছি।"[১৭]

এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব, এই অস্থিরতা, এই টানাপোড়েন কি কেবলই একজন প্যারাসাইকোলজির উৎসাহী গবেষকের, নাকি একজন লেখকেরও? মিসির আলির মধ্যে কি আসলে হুমায়ুন নিজেই নিজেকে খোঁজেন? মজার ব্যাপার, *বৃহন্নলা* উপন্যাসে লেখক হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে একবার দেখা হয়ে যায় মিসির আলির। হুমায়ূন সম্পর্কে একটা খাতায় মিসির আলি আট পৃষ্ঠা লেখেনও সেখানে!

"নাম : হুমায়ূন আহমেদ। বিবাহিত, তিন কন্যার জনক। পেশা অধ্যাপনা। বদমেজাজি। অহংকারী। অধ্যাপকদের যেটা বড় ত্রুটি - অন্যদের বুদ্ধিমত্তা খাটো করে দেখা, ভদ্রলোকের তা আছে।"[১৮]

বর্ণনা শুনে মনে হয়, নিজের সৃষ্ট মিসির আলিই লেখক হুমায়ূন আহমেদের আয়না, সেই আয়নায় তিনি নিজেকে দেখতে চাইছেন। কেননা *অনীশ* – এ বুড়ি আবার মিসির আলি সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের কথা লিখছে তার ডায়েরিতে –

"গত পরশু মিসির আলি নামের একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। ...মানুষটি বুদ্ধিমান, নিশ্চয় এটা চমৎকার একটা গুণ। কিন্তু তাঁর দোষ হচ্ছে তিনি একই সঙ্গে অহংকারী। অহংকার বুদ্ধির কারণে, যেটা আমার ভালো লাগে নি। বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে তিনি আমাকে অভিভূত করতে চেয়েছেন।"[১৯]

শোনা যায়, হুমায়ূন আহমেদও ব্যক্তিগত জীবনে প্রায়ই অন্যকে ভড়কে দিতে, চমকে দিতে এবং অভিভূত করতে ভালোবাসতেন। এই লেখকের মতো তাঁর সাহিত্যের চরিত্ররাও পুরোপুরি যুক্তির অধীন নয়, খানিকটা আবেগের বশেই চলে। তারা যতটা না বাস্তববাদী, তার চেয়ে বেশি 'ইমপালসিভ'। মানে হঠাৎ কোনো আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে ফেলাটা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। হুমায়ূন নিজেও কি কিছুটা সে রকমই ছিলেন না ? মিসির আলিকেও পুরোপুরি বোঝা কঠিন। যেমন, *বৃহন্নলা* - তে তিনি বলছেন, 'রহস্যময় ব্যাপারগুলোর প্রতি আমার একটি আগ্রহ আছে। আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাই।' কিংবা *অনীশ* উপন্যাসের একটি চরিত্র বুড়ি মিসির আলিকে বলে, 'আপনি কি বুকে হাত

দিয়ে বলতে পারবেন লজিকই হচ্ছে পৃথিবীর শেষ কথা ! লজিকের বাইরে কিছু নেই ? পৃথিবীর সমস্ত রহস্যের সমাধান আছে লজিকে, পারবেন বলতে?' এই কথার জবাবে মিসির আলি বলেন, 'পারব'। । অথচ এই মিসির আলিই আরেক জায়গায় বলেছেন –

"তোমার জানা উচিত সমস্যা সমাধান আমার পেশা না। সমস্যার সমাধান আমি সেইভাবে করতেও পারি না। জগতের বড় বড় রহস্যের সমাধান বেশির ভাগ থাকে অমীমাংসিত। প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে। রহস্যের মীমাংসা তেমন পছন্দ করে না।"[২০]

এই আশ্চর্য দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর বৈপরীত্য নিয়েই মিসির আলি। এই অদ্ভুত চরিত্রকে নিয়ে পাঠকদের আগ্রহের অন্ত নেই। প্রথম যে উপন্যাসের মাধ্যমে হুমায়ূন পাঠকদের সামনে হাজির করেছিলেন মিসির আলিকে, তার নাম *দেবী*। রোগা–পটকা মধ্যবয়স্ক পাগলাটে এক শিক্ষককে আমরা চলচ্চিত্রেও দেখতে পেয়েছি। সমাজের আর দশটা মানুষের চেয়ে তিনি আলাদা। একাকী। বুদ্ধিমান, মেধাবী, যুক্তিবাদী কিন্তু সমাজবিচ্যুত। অন্যেরা তাঁকে দেখে অভিভূতই হয়, কিন্তু ভালোবেসে কাছে টানে না। যে ভালোবেসে কাছে টানতে চেয়েছিল, মিসির আলি বরং তাঁর কাছ থেকে পালিয়েই বেড়ান।

মিসির আলিকে কেন্দ্র করে হুমায়ূন আহমেদের লেখা কাহিনির কালানুক্রমিক তালিকাটি এরকম -

দেবী (জুন, ১৯৮৫), নিশীথিনী(১৯৮৮), নিষাদ (১৯৮৯), অন্যভুবন (১৯৮৭), বৃহন্নলা (আগস্ট, ১৯৮৯), ভয় (মে, ১৯৯১), বিপদ (১৯৯১), অনীশ (মে, ১৯৯২), মিসির আলির অমিমাংসিত রহস্য (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬), আমি এবং আমরা (১৯৯৩), তন্দ্রাবিলাস (২০০৯), হিমুর দ্বিতীয় প্রহর (১৯৯৭), আমিই মিসির আলি (ফেব্রুয়ারি, ২০০০), বাঘবন্দি মিসির আলি (জুন, ২০০১), কহেন কবি কালিদাস (২০০৫), হরতন ইশকাপন (২০০৮), মিসির আলির চশমা (ফেব্রুয়ারি, ২০০৮), মিসির আলি ! আপনি কোথায় ? (ফেব্রুয়ারি,

২০০৯), মিসির আলি UNSOLVED (জুলাই, ২০০৯), পুফি (২০১১), যখন নামিবে আঁধার (২০১২)

❖

কাহিনিতে একজন ডিটেকটিভ থাকলেই যে সেটা গোয়েন্দা গল্প হবে তার কোনো মানে আছে কী ? লীলা মজুমদারের *পদিপিসির বর্মিবাক্স* উপন্যাসে একজন ডিটেকটিভ ছিলেন বটে, 'ছাই রঙের পেন্টেলুন আর ছাই রঙের গলাবন্ধ কোট পরে মুখে মাথায় কম্ফর্টার' জড়ানো চিমড়ে ভদ্রলোক, যাঁর নাম নিধিরাম সর্দার। যদিও তিনি যে ডিটেকটিভ সেটা জানা গিয়েছিল অনেক পরে, কিন্তু তা সত্ত্বেও *পদিপিসির বর্মিবাক্স* - কে কোনোভাবেই ডিটেকটিভ উপন্যাস বলা যাবে না। বরং সেটা রহস্য-মজা-হাসি মেশানো এক বিশেষ গোত্রের ন্যারেটিভ।

তাহলে প্রশ্ন হল, ডিটেকটিভ গল্প কাকে বলা যায় ? দেশ-বিদেশের তাত্ত্বিকমহলে এই ব্যাপারে নানান তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। ডিটেকটিভ গল্প নিছক ক্রাইমকাহিনি বা রহস্য-আশ্রিত গল্প নয়, আবার রোমাঞ্চকর বা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির থেকেও তা আলাদা। কোনও কোনও গবেষকের মতে, কোনও অপরাধকাহিনি বা রহস্য উন্মোচনে পুলিশি তদন্তের ঘটনাকেও ডিটেকটিভ কাহিনির থেকে ভিন্নগোত্রের মনে করাই শ্রেয়।

সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে, যে গল্প বা উপন্যাসে কোনও পেশাদার বা অপেশাদার ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দা ডিডাকশন পদ্ধতিতে কোনও আপাত অবোধ্য রহস্য বা সমস্যার সমাধান করেন, তাকেই খাঁটি ডিটেকটিভ কাহিনি বা গোয়েন্দা গল্প হিসেবে গণ্য করা হয়।

শার্লক হোমস যাকে ‘সায়েন্স অফ ডিডাকশন’ বলেছেন, আর অদ্রীশ বর্ধন যার অনুবাদ করেছেন ‘অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান’, সেই পদ্ধতিতে যিনি ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দা, তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সব সময়েই যে গোয়েন্দাপ্রবর তাঁর সুতীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার জোরেই শুধুমাত্র রহস্যের জট ছাড়িয়ে ফেলছেন, সব গোয়েন্দা কাহিনিতে তা নাও হতে পারে। ১৯২৮ সালে এস এস ভ্যান ডাইন এবং ১৯২৯-এ গবেষক রোনাল্ড নক্স গোয়েন্দা গল্পের যে নীতি নির্ধারণ করেছিলেন, বা পরবর্তীকালে আরও অনেক গবেষক-তাত্ত্বিকের আলোচনা থেকে উঠে আসা মতামতের ভিত্তিতে এইসব কাহিনিকে ঠিক গোয়েন্দা কাহিনি বলা চলে না। বরং এগুলোকে একধরণের ক্রাইম কাহিনি বলা যেতে পারে, যেখানে হয়তো একজন সত্যান্বেষী বা গোয়েন্দা বা রহস্য-অনুসন্ধানী উপস্থিত থাকে মাত্র, এবং ঘটনাচক্রে সেখানে সংঘঠিত অপরাধের কিনারা হয়ে যায় অথবা রহস্যের জট ছাড়িয়ে যায়। সারা পৃথিবীতে তো বটেই এমনকী বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এমন উদাহরণ বিরল নয়। ডিটেকটিভ কাহিনি বা গোয়েন্দা গল্প নিঃসন্দেহে ক্রাইম বিষয়ক সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা হলেও অনেক সময়েই দেখা যায় যে, গোয়েন্দা যে ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন সেখানে রহস্যভেদের কোনো অবকাশ-ই নেই, অথবা তার সাথে অপরাধের কোনো যোগাযোগ-ই নেই। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনেক নামকরা লেখকের প্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দারা কখনও কখনও গোয়েন্দা কাহিনির নিয়ম তো মানেন-ই নি বরং নানান উদ্ভট নীতিবিরুদ্ধ কান্ড ঘটিয়ে বসেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা সেই রকম কিছু কাহিনির কথাও বলব, যেখানে, গোয়েন্দামশাই ঠিক ঠিক পাকা গোয়েন্দার মতো আচরণ করছেন না। অর্থাৎ, এও একভাবে ‘গোয়েন্দা যখন গোয়েন্দা নয়’।

বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গোয়েন্দা চরিত্র বলে মনে করা হয় সি অগাস্ত দুপ্যাঁ-কে। স্রষ্টা মার্কিন লেখক এডগার অ্যালান পো (জানুয়ারি ১৯, ১৮০৯ - অক্টোবর ৭, ১৮৪৯)। দুপ্যাঁ-কে নিয়ে যে তিনটি গল্প তিনি লিখেছিলেন তার একদম শেষেরটি, *দ্য পারলয়েন্ড লেটার* (প্রথম প্রকাশ ১৮৪৪) একটি মূল্যবান চিঠি উদ্ধারের গল্প। যে চিঠি ‘শ্রীযুক্ত ডি’-র বাড়ির প্রত্যেকটি আনাচ কানাচ তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেও খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ বিভাগের দুঁদে অফিসারেরা। অবশেষে সেই চিঠির হদিস পান দুপ্যাঁ, খানিকটা

ঘটনাচক্রেই। পো - র প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা রেখেই বলা যায়, দুপ্যাঁ-র এই চিঠি খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে খুব যুক্তিজাল বিস্তার অথবা সাঙ্ঘাতিক বুদ্ধির কৌশল কিছুই তেমন লক্ষ্য করা যায় না। বরং সেখানে আছে খানিকটা অনুমান আর বাকিটা ভাগ্যের সহায়তা !

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৩২ - এ প্রথম প্রকাশিত হলো শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৩০ মার্চ ১৮৯৯ - ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭০) দ্বিতীয় ব্যোমকেশ কাহিনি *সীমন্ত-হীরা* । এই গল্পের কাহিনি যে অ্যালান পো - র *দ্য পারলয়েন্ড লেটার* - এর কাহিনি থেকে অনুপ্রাণিত বা অনুসৃত, এ কথা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। শরদিন্দুর গল্পে ব্যোমকেশ মহা মূল্যবান সীমন্ত-হীরাটি উদ্ধার করে স্যার দিগিন্দ্রের পড়ার টেবিলের ওপরে অযত্নে পড়ে থাকা একটি নটরাজ-মূর্তির পেট থেকে, বলাই বাহুল্য, এখানেও সেই অনুমানই ভরসা। এমনকি, অজিত যখন ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করে যে, সে এই ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত হচ্ছে কী করে, তখন ব্যোমকেশ উত্তর দেয় –

"তাহলে বুঝব, পৃথিবীতে সত্য বলে কোনও জিনিস নেই; শাস্ত্রের অনুমান-খন্ডটা একেবারে মিথ্যা।"[২১]

একগোছা চিঠি পুনরুদ্ধার করা নিয়ে আরেকটি গল্প, *আ স্ক্যান্ডাল ইন বোহেমিয়া*, স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের (২২ মে, ১৮৫৯ - ৭ জুলাই, ১৯৩০) লেখা, *দ্য পারলয়েন্ড লেটার* প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সাতচল্লিশ বছর প্রথম বেরোয় ১৮৯১ সালে, *স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে* । এই গল্পে বেশ কয়েকটি জায়গায় শার্লক হোমসের বিখ্যাত ডিডাকশন পদ্ধতির ঝলক দেখতে পাওয়া গেলেও আসল সময়ে অর্থ্যাৎ চিঠি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে শার্লক কিন্তু অনুমানের ওপর খানিকটা ঝুঁকে ছিল। তবে নিঁখুত পরিকল্পনা আর নির্ভুল সময়জ্ঞানের জন্য চিঠিগুলি কোথায় লুকানো আছে তা শার্লক ধরে ফেলেছিল। যদিও সুচতুর আইরিন অ্যাডলার তাকে চিনতে পেরে যাওয়ায় সেগুলিকে শার্লক পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। সারা জীবনে সম্ভবত এই একবারই কোনো মহিলার কাছে হার মানতে হয়েছে শার্লককে !

******

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে নতুনত্বের স্বাদ এনেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় (২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮ – ১৮ই এপ্রিল ১৯৬৩) তাঁর চরিত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তৈরি করে। তাঁর হেমন্ত - রবীন অথবা বিমল-কুমার দু'টি জুটি-ই বিজ্ঞান ও অপরাধবিজ্ঞানের চর্চায় বেশ আগ্রহী হলেও হেমেন্দ্রকুমারের লেখা *বিভীষণের জাগরণ, মানুষ পিশাচ, নবযুগের মহাদানব, মরণ খেলার খেলোয়াড়* ইত্যাদি গল্পে কিন্তু তন্ত্র-মন্ত্র, ভূত-প্রেতের মতো অলৌকিক প্রসঙ্গ আছে এবং সেখানে উপস্থিত গোয়েন্দারাও সেসব অতিপ্রাকৃত বিষয়কে মোটেই নস্যাৎ করে দেয় না !

যেমন, *মানুষ পিশাচ* গল্পটির কথাই ধরা যাক। এই গল্পটির সমাপ্তি আরেকটু বিজ্ঞানসম্মত হতে পারত। এই কাহিনির শুরু থেকেই জয়ন্ত একজন বৈজ্ঞানিকের মন নিয়েই ঘটনাক্রমের বিশ্লেষণ করে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছে। ভূত-প্রেত, অলৌকিক অথবা অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্বে সে বিশ্বাস রাখেনি। সব অপরাধের মূলে যে কোনো না কোনো মানুষই রয়েছে, তা মেনেছে। কিন্তু গল্পের শেষে গিয়ে দেখা যায়, একজন মানুষই অপরাধী বটে, কিন্তু সে সরসরি কোন অপরাধ করে না। নবাব নামে পিশাচসিদ্ধ একটি লোক তার বশীভূত কিছু মৃতদেহের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে কিছুক্ষণের জন্য। তারপর তাদের কাজে লাগিয়েই বিভিন্ন অপহরণ ও খুনের ঘটনা ঘটায়। তারপরে আবার তাদের মৃতদেহে পরিণত করে !!!

নবাবের সেই অশরীরী সেনাদের বর্ণনা *মানুষ পিশাচ* গল্পের কথক এইভাবে দিয়েছেন,

"যেন সব দম-দেওয়া কলের মূর্তি ! প্রত্যেকের পরনে সাদা কাপড়, প্রত্যেকের দেহের উপর দিকটা আড়ষ্ট এবং প্রত্যেকের হাত দুটো পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর হাতের মতো দু-পাশে স্থিরভাবে ঝুলছে, চলছে কেবল তাদের পাগুলো – যেন তারা থামতে জানে না, কার অভিশাপ যেন তাদের কিছুতেই থামতে দেয়

না, যন্ত্রচালিতের মতো তাদের যেন চলতেই হবে সারা পৃথিবীর মাটি মাড়িয়ে অনন্তকাল ধরে ! 'হেডলাইট' এর তীব্র আলোকে তাদের রুক্ষ চুল ও বিস্ফারিত স্থির চোখের পাতা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছয়জোড়া নিষ্পলক চোখের পূর্ণদৃষ্টি অমিয়দের স্থির হয়ে আছে – প্রত্যেক চোখ যেন মড়ার চোখ।"[২২]

জয়ন্ত - মানিক, সুন্দরবাবুসহ অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের সামনেই এ ঘটনা ঘটে। তারা সবাই তো বটেই, এমনকি জয়ন্ত নিজেও এই অলৌকিক ব্যাপারটি মেনে নেয়। কিন্তু, এই গল্পের পাঠক হিসেবে আমাদের এই ঘটনা মেনে নিতে অসুবিধা হয় কারণ কোন অবস্থাতেই তো মৃত মানুষের পুনর্জীবনলাভ সম্ভব নয় !!

আমার মনে হয়, যদি এইভাবে গল্পটি শেষ হতো, বোধহয় আরেকটু ভালো হতো, যে নবাব নামে লোকটি কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বা চিকিৎসার মাধ্যমে লোকগুলিকে কিছুক্ষণের জন্য মৃতবৎ করে রাখতে পারে। তাদের গায়ে গুলি-না-লাগার কারণ হিসেবে বুলেটপ্রুফ পোশাক ইত্যাদি কিছু যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু, দুঃখজনকভাবে তা হয়নি। গোয়েন্দা সবসময় যুক্তিযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন, এটাই কাঙ্ক্ষিত। তাই তাদের কাউকেই ভূত-প্রেত বা অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী বলে ভাবতে ভালো লাগেনা ঠিক !!

"প্রাকৃতিক বিধানে যে-দেহ থেকে জীবন পালিয়েছে, তান্ত্রিক মন্ত্রের গুণে তা যদি আবার জ্যান্ত হত, লোকে তাহলে তাকে পুড়িয়ে বা পুঁতে ফেলত না। এই বিংশ শতাব্দী জানে, - ম্যাজিকের আসল অর্থ হচ্ছে চোখে ধুলো দেওয়া; তাকে নিয়ে মজা করা চলে, তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা চলে না।"[২৩]

মরণ খেলার খেলোয়াড় গল্পে উপরের কথাগুলো বলে জয়ন্ত যদিও ঘোষণা করে, যে সে কোনরকম যুক্তিহীন ব্যাখ্যা মানতে রাজি নয়, তবুও, সে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণও কিন্তু পূর্বতন দু'টি খুন এবং দুই নিরুদ্দেশ সম্পর্কে করতে পারে না। আমার ধারণা,

সন্তোষজনক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে জয়ন্ত যেন খানিকটা ইচ্ছে করেই এই ব্যাপারটা এড়িয়ে যায়। কিন্তু কোনো নাছোড় গোয়েন্দার এহেন আচরণ কাঙ্ক্ষিত নয়।

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সফল গোয়েন্দা-কাহিনিকার বোধহয় শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়। তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি, সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর একাধিক গল্পেও কিন্তু যুক্তি-বুদ্ধির ধার পাশ না দিয়ে গিয়ে নিছক অনুমান কিংবা ভাগ্যক্রমে অথবা সম্পূর্ণ অলৌকিক উপায়ে রহস্যের কিনারা করে বা অপরাধীকে পাকড়াও করে। *উপসংহার* গল্পে ব্যোমকেশ তো বলেই ফেলে – '...ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং' অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সত্যান্বেষীও স্বীকার করে নিলেন যে ভাগ্য সহায় না হলে তিনিও এই গল্পের অপরাধীকে ধরতে পারতেন না !

******

ব্যোমকেশ ও বরদা গল্পে শরদিন্দুর আরেক বিখ্যাত চরিত্র ভূত-বিশেষজ্ঞ বরদাচরণের সঙ্গেও ব্যোমকেশের সাক্ষাৎ হবে। প্রেতযোনিতে তার বিশ্বাস আছে কী না, বরদার এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যোমকেশ বলে – 'অবিশ্বাসও করি না। প্রেতযোনি আমার হিসেবের বাইরে।' এই গল্পের শেষে অবশ্য ব্যোমকেশ প্রমাণ করে দেয় যে অপরাধী আসলে মানুষ, কোনো ভূত-প্রেত নয় এবং সেই সুবাদে 'বরদার ভূতের রোজা' এহেন খেতাবও লাভ হয় তার। গল্পের একেবারে শেষের দিকে এসে বরদার উদ্দেশ্যে ব্যোমকেশ বলে –

"আমি নেহাৎ বস্তুতান্ত্রিক মানুষ, নিরেট বস্তু নিয়েই আমায় কারবার করতে হয়; তাই অতিন্দ্রীয় জিনিসকে আমি সচরাচর হিসেবের বাইরে রাখি।"[২৪]

যদিও, আরেক ব্যোমকেশ-কাহিনি *শৈল রহস্য* - তে মহাবালেশ্বরের সহ্যাদ্রি হোটেলের ঘরে রাত-দুপুরে যেভাবে অলৌকিক কান্ড-কারখানা ঘটে এবং অশরীরী আত্মার টেবিল-নাড়িয়ে – করা - কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যোমকেশ যখন ভূতুড়ে মক্কেলের কাছ থেকে তার মৃত্যুর তদন্তভার পায়, তখন ব্যোমকেশের যুক্তিবাদী, বস্তুতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পাঠকের একটু ধাঁধাঁ লেগে যায় বইকি!!

❖

বাংলা সাহিত্যের ক্ষুদে গোয়েন্দাদের প্রসঙ্গ আসলেই যাদের কথা সবার আগে মনে পড়ে, তারা হলো ষষ্টীপদ চট্টোপাধ্যায়ের (৯ মার্চ ১৯৪১ - ৩ মার্চ ২০২৩) 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'। ব্রিটিশ লেখক এনিড ব্লাইটনের 'ফেমাস ফাইভ' - এর উদাহরণ সামনে ছিল, যদিও ষষ্টীপদ তাঁকে অনুসরণ করেননি। তিনি তাঁর গোয়েন্দাদের সাজিয়েছেন নিজের মতো করে। বাবলু-বিলু-ভোম্বল-বাচ্চু-বিচ্ছু। এই পাঁচটি ছেলেমেয়ের একটি দল আর সাথে তাদের কুকুর পঞ্চু। তারা দল বেঁধে একসাথে নানারকম রোমাঞ্চকর অভিযান করে। কখনও নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে কোনো ঘটনার সাথে, কখনও অন্য কাউকে সাহায্য করার জন্য তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপদের মুখে। পাঁচজনের মধ্যে বাবলুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং সাহসী, বয়সে সবার চেয়ে বড়ও বটে। অনেক বিষয়ে অনেক পড়াশোনা আছে তার। সে পিস্তল চালাতে জানে, সঙ্গে একটি লাইসেন্সড রিভলভারও সে রাখে। বিলু প্রায় বাবলুরই সমবয়সী, দলে তার স্থানও বাবলুর পরেই। সে-ও বিচক্ষণ এবং সাহসী। বাবলুর অবর্তমানে দলের বাকিরা তার নির্দেশ মান্য করে চলে। এদের মধ্যে ভোম্বল কিছুটা ভীতু প্রকৃতির। সে অভিযানের শুরুতে খানিকটা ভয় পেলেও পিছু হটে না, বাকিদের সাথেই থাকে। খুবই খাদ্যরসিক এবং দুর্দান্ত সাঁতারু। বাচ্চু ও বিচ্ছু দুই বোন। বাচ্চু বয়সে বড়, তাই অপেক্ষাকৃত সাবধানী। বিচ্ছুর বয়স কম, সাহসও খানিক বেশি। পঞ্চ পাণ্ডবের অভিযানের শুভ সূচনা *মিত্তির বাড়ির রহস্য* - র পিছনেও এই বিচ্ছুরই হাত। এদের সঙ্গী

পোষ্য কুকুর পঞ্চু, একটি চোখে সে দেখতে পায় না বটে, কিন্তু তাতে তার সাহসে কিছুমাত্র ভাঁটা পড়েনি। পঞ্চ পাণ্ডবের বহু অভিযানে পঞ্চু শয়তানদের ওপরে আক্রমণ করে তাদের সাহায্য করেছে।

ষষ্টীপদ নিজেই একটা লেখাতে জানিয়েছেন তাঁর পাণ্ডব গোয়েন্দা-র গল্প লেখা শুরু করার কথা। দেব সাহিত্য কুটীরের অন্যতম কর্ণধার ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদারের উৎসাহেই মূলত তিনি এই ধরণের লেখালেখি শুরু করেন। ক্ষীরোদবাবুই ওনাকে বলেছিলেন এই ধরণের টিম ওয়ার্ক-নির্ভর গল্প লিখতে। বলেছিলেন –

"তোমাকে এত করে বলছি গোয়েন্দা গল্প লিখতে, তুমি লিখছ না। লিখলে কিন্তু তুমি পারবে। তোমার ওই পঞ্চুকে নিয়েই একটা টিম ওয়ার্ক তৈরি করে শুরু করো না গোয়েন্দাগিরি। বিদেশে এই ধরণের গোয়েন্দা কাহিনি অনেক লেখা হয়েছে।" ষষ্টীপদ লিখছেন – "উৎসাহ পেয়ে সেদিনই আমি বাড়িতে গিয়ে লিখতে বসলাম পাণ্ডব গোয়েন্দার গল্প। লেখা শেষ হলে নাম দিলাম 'পঞ্চপাণ্ডবের অভিযান'। গল্পের হিরো হল পঞ্চু। আমি হলাম বাবলু। বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছুরাও স্থান পেল। তবে কিনা 'পঞ্চপাণ্ডবের অভিযান' নামটি আমার মনের মতো হল না। ভাবলাম এইরকম নাম দিলে পৌরাণিক কাহিনি ভেবে কেউ যদি না পড়ে ? তাই নাম দিলাম 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'। আবার ভাবলাম, পাণ্ডবের সঙ্গে গোয়েন্দা শব্দটি কি মানাবে ? গুরুচণ্ডালি ব্যাপার হয়ে যাবে না তো ? তাই কী যে করব ভেবে না পেয়ে টস করলাম। হেড হলে পাণ্ডব গোয়েন্দা, টেল হলে পঞ্চ পাণ্ডবের অভিযান। টসে হেড হল। তাই বহাল রইল পাণ্ডব গোয়েন্দাই।"[২৫]

পাণ্ডব গোয়েন্দার কাহিনি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে মাসিক *শুকতারা* পত্রিকায়। পরবর্তীকালে *আনন্দমেলা* - র পাতাতেও পঞ্চ পাণ্ডবের নানান কাহিনি দীর্ঘদিন ধরে শিশু-কিশোরদের মাত করে রেখেছিল।

পাণ্ডব গোয়েন্দা সিরিজের উল্লেখযোগ্য কাহিনিগুলি হল -

মিত্তির বাড়ির রহস্য, জিপসি রহস্য, পঞ্চু দ্য গ্রেট, ওয়াগন চুরির অভিযান, কাঞ্চনজঙ্ঘায় ঝঞ্ঝাট, হাজারহাত কালীতলা রহস্য, দাসনগর রহস্য, পুরী রহস্য, বিষ্ণুপুরের গুপ্তধন ইত্যাদি।

❖

প্রধানত রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের (১৯২৭-১৯৯৮) লেখালেখির দ্বিতীয় পর্যায়ে কিশোর গোয়েন্দা কাহিনির নায়ক অভ্রদীপ। অভ্রদীপের বয়স তেরো-চোদ্দো বছর। সে আর তার ভাই শুভ্রদীপ সারাক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি, খুনসুটি করে চললেও কাজের ব্যাপারে অভ্র সিরিয়াস। শুভ্রও তখন দাদা ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না। এই দুই কিশোরের বেশিরভাগ কাহিনিতে তাদের পারিবারিক বন্ধু তথা গোয়েন্দাগিরির অভিভাবক হিসেবে প্রতুল লাহিড়ীকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

অভ্রদীপ-শুভ্রদীপের কাহিনিগুলির মধ্যে রয়েছে –

গীতাঞ্জলী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা, কফিনের মড়া, সোনার আংটি উধাও, শুভ্রদীপের বুদ্ধি, অভ্রদীপের খুনী ধরা, অভ্র বনাম শুভ্র, অভ্রর গোয়েন্দাগিরি, অভ্রদীপের কারসাজি, পণ্ড পিকনিকের উৎস, ভূতের সন্ধানে ইত্যাদি।

******

ভগীরথ মিশ্রের (জন্ম : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭) গোয়েন্দা গল্প লেখার শুরু কিশোর গোয়েন্দা টিটু - মিঠুকে নিয়ে একটি ছোট মজার উপন্যাসের মাধ্যমে। *বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাস ও আমি* প্রবন্ধে উনি লিখছেন –

"...আমার লেখা প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাসটি হলো ছড়া ও গোয়েন্দাগিরির মিশেলে লেখা একটি কাহিনি। ওই কাহিনিতে টিটু ও মিঠু নামের দুই কিশোর একাধারে ছড়াকার ও গোয়েন্দা। কাজেই, ওরা দুজনেই সারাক্ষণ ছড়াতেই কথা বলে এবং মাথা খাটিয়ে গোয়েন্দাগিরিও করে। ওই নিয়ে ছোট্ট উপন্যাস। নাম দিলাম 'ছড়ারু গোয়েন্দা'।"[২৬]

তাঁর পরবর্তী গোয়েন্দা-কাহিনিগুলিতে অবতীর্ণ হলো অন্য দুই কিশোর। ঋষি আর সুমন। তাদের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার *সামনেই সুড়ঙ্গটা শেষ* । বাবা-মায়ের সঙ্গে বিষ্ণুপুরে বেড়াতে গিয়ে জাল ওষুধ তৈরির এক আন্তর্জাতিক চক্রের হাতে বন্দী হয় তারা। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি খাটিয়ে তারা সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়েও আসতে পারে আর পুলিশকে খুঁটিনাটি তথ্য দিয়ে চক্রের পান্ডাগুলোকে ধরতে সাহায্য করে। প্রখ্যাত কিশোর-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির লেখক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পঞ্চ-পান্ডবের গল্প অনুসরণে পরবর্তীকালে ঋষি-সুমনের সাথে যোগ দেয় একটি কুকুর, যার নাম রোবট।

এই তিনজনকে একসাথে *আড়াই গোয়েন্দা* নাম দিয়ে তারপর বেশ কিছু উপন্যাস লিখেছেন ভগীরথ মিশ্র। সেগুলির মধ্যে আছে –

অপারেশন পার্কার ফিফটি-ওয়ান, ঝাউবনে ঝড়, মৃত্যুর নিগূঢ় ফাঁস, লেডি অফ কেলং, চড়কডাঙার সিংহ ইত্যাদি।

❖

উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে *কৃত্তিবাস* গোষ্ঠীর কবি হিসাবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করলেও আনন্দ বাগচী (১ জুলাই, ১৯৩২ - ৯ জুন, ২০১২) পরবর্তীকালে উপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছোটদের জন্যেও বেশ কিছু কিশোরকাহিনি, রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস লিখেছিলেন। যেগুলির প্রায় সবকটিই *আনন্দমেলা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর ডিটেকটিভ উপন্যাসের নায়ক কিশোর সুনন্দ স্কুলছাত্র। সে শান্ত স্বভাবের ছেলে, বেশ লাজুক এবং গম্ভীর। কোনো বিষয়ে সে যখন গভীরভাবে চিন্তাচ্ছন্ন থাকে তখন সে আরও চুপচাপ হয়ে যায়, নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। পুলিশের এক বড় কর্তা, সুনন্দর বাবার বন্ধু, সুনন্দর কমলেশকাকু মাঝে মাঝে জটিল সব কেস নিয়ে সুনন্দর কাছে আসেন কারণ সুনন্দর গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার উপরে কমলেশকাকুর গভীর আস্থা আছে।

******

প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) সৃষ্টি করেছিলেন কিশোর সাহিত্যের মজাদার চরিত্র টেনিদা ও তার দলবল। এই দলবলের মধ্যে রয়েছে ক্যাবলা, হাবুল আর প্যালা। যাঁরা একসাথে চারমূর্তি বলে পরিচিতি। কলকাতার পটলডাঙ্গায় স্ট্রিটে বাংলা সাহিত্যের এই বিখ্যাত চারমূর্তি থাকে, টেনিদাই এদের সবার মধ্যে বয়েসে বড় এবং সেই - ই সবার ওপরে খবরদারি করে। বাকি তিনজন টেনিদার কথামতো চলে। তাদের জীবনের মূল কাজটা হল পটলডাঙ্গার রকে বসে আড্ডা দেওয়া। এই চারমূর্তি নানান কান্ডকারখানা করে বেড়ায়। দু'একবার তারা বেশ রহস্যময় ঘটনার সাথেও জড়িয়ে পড়েছে। যেমন, *চারমূর্তি* বলেই যে উপন্যাসটি আছে, সেখানেই তারা নিছকই ঘটনাচক্রে

টাকা জাল করে এরকম একটি দলকে ধরে ফেলেছিল। আবার *কম্বল নিরুদ্দেশ* গল্পে টেনি, প্যালারাম, ক্যাবলা আর হাবুল সেন নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে হারিয়ে যাওয়া পাড়ার ছেলে কম্বলকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। কম্বলকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়, কিন্তু ভুল সূত্র ধরে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে ভুলক্রমেই তারা একদল চোরাকারবারীকে ধরে ফেলে এবং পুলিশে দেয়।

টেনিদার কয়েকটি গল্পে এইরকম রহস্য-রোমাঞ্চ বা অনুসন্ধানের ব্যাপার থাকলেও এই গল্পগুলিকে ঠিক গোয়েন্দা গল্প বলা যায় না।

তথ্যসূত্র

১. কর বিমল; *কিকিরা সমগ্র (৩য় খণ্ড)* ; (ভূমিকা অংশ); আনন্দ পাবলিশার্স; প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ২০০২; কলকাতা।

২. কর বিমল; *কিকিরা সমগ্র (১ম খন্ড)* ; আনন্দ পাবলিশার্স; প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ২০০২; কলকাতা; পৃ. ১২৯।

৩. কর বিমল; *কিকিরা সমগ্র (খন্ড)* ; আনন্দ পাবলিশার্স; প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ২০০২; কলকাতা; পৃ. ৩৩।

৪. চক্রবর্তী সুমিতা; "কাকাবাবু কি ডিটেক্‌টিভ ?"; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা (বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা)* ; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; সম্পা. তাপস ভৌমিক; কলকাতা; পৃ. ২১৯।

৫. সেন সুনন্দন কুমার; "সুকুমার সেনের গোয়েন্দাপ্রীতি"; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা (বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা)* ; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; সম্পা. তাপস ভৌমিক; কলকাতা; পৃ. ৬১।

৬. সেন সুকুমার; *গল্প সংগ্রহ* ; (মুখবন্ধ); আনন্দ পাবলিশার্স; প্রথম সংস্করণ; ২০০৯; কলকাতা।

৭. সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা; *কর্ণেল সমগ্র (৯ম খন্ড)* ; দে'জ পাবলিশিং; ১৯৯৯; কলকাতা; পৃ. ২৭৫৫ ও ২৭৮৭।

৮. সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা; *কিশোর কর্ণেল সমগ্র (১ম খন্ড)* ; দে'জ পাবলিশিং; ১৯৯৪; কলকাতা; পৃ. ৫।

৯. চট্টোপাধ্যায় ত্রিদিবকুমার; "জগুমামা-র উৎস-সন্ধানে"; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা (বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা)* ; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; সম্পা. তাপস ভৌমিক; কলকাতা; পৃ. ২৬৯-২৭০।

১০. চট্টোপাধ্যায় ত্রিদিবকুমার; "জগুমামা-র উৎস-সন্ধানে"; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা (বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা)* ; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; সম্পা. তাপস ভৌমিক; কলকাতা; পৃ. ২৭০।

১১. আহমেদ হুমায়ূন; *মিসির আলি সমগ্র* ; অনন্যা; পঞ্চম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬; ঢাকা, বাংলাদেশ; পৃ. ৫৭০।

১২. আহমেদ হুমায়ূন; *মিসির আলি সমগ্র* ; অনন্যা; পঞ্চম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬; ঢাকা, বাংলাদেশ; পৃ. ৪২৫।

১৩. আহমেদ হুমায়ূন; *মিসির আলি সমগ্র* ; অনন্যা; পঞ্চম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬; ঢাকা, বাংলাদেশ; পৃ. ৩২৪।

১৪. কে এই মিসির আলি? | প্রথম আলো (prothomalo.com) ১১.০১.২০২৪ রাত ৮টা ৪২ মিনিট।

১৫. কে এই মিসির আলি? | প্রথম আলো (prothomalo.com) ১১.০১.২০২৪ রাত ৮টা ৪২ মিনিট।

১৬. আহমেদ হুমায়ূন; *মিসির আলি সমগ্র* ; অনন্যা; পঞ্চম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬; ঢাকা, বাংলাদেশ; পৃ. ৯১।

১৭. আহমেদ হুমায়ূন; *মিসির আলি সমগ্র* ; অনন্যা; পঞ্চম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬; ঢাকা, বাংলাদেশ; পৃ. ২২৩।

১৮. আহমেদ হুমায়ূন; *মিসির আলি সমগ্র* ; অনন্যা; পঞ্চম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬; ঢাকা, বাংলাদেশ; পৃ. ৩৪৩।

১৯. আহমেদ হুমায়ূন; *মিসির আলি সমগ্র* ; অনন্যা; পঞ্চম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬; ঢাকা, বাংলাদেশ; পৃ. ৪৬৯।

২০. আহমেদ হুমায়ূন; *মিসির আলি সমগ্র* ; অনন্যা; পঞ্চম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬; ঢাকা, বাংলাদেশ; পৃ. ৪৫৬।

২১. বন্দোপাধ্যায় শরদিন্দু; *ব্যোমকেশ সমগ্র* ; আনন্দ পাবলিশার্স; দশম মুদ্রণ অক্টোবর, ২০০৭; কলকাতা; পৃ .৮৮।

২২. রায় হেমেন্দ্রকুমার; *জয়ন্ত-মানিক সমগ্র (১ম খন্ড)* ; দেব সাহিত্য কুটীর; প্রথম সংস্করণ, ২০১৮; কলকাতা; পৃ. ৫১।

২৩. রায় হেমেন্দ্রকুমার; জয়ন্ত-মানিক সমগ্র (১ম খন্ড) ; দেব সাহিত্য কুটীর; প্রথম সংস্করণ, ২০১৮; কলকাতা; পৃ. ৭৩।

২৪. বন্দোপাধ্যায় শরদিন্দু; *ব্যোমকেশ সমগ্র* ; আনন্দ পাবলিশার্স; দশম মুদ্রণ অক্টোবর, ২০০৭; কলকাতা; পৃ. ২৪৩।

২৫. চট্টোপাধ্যায় ষষ্ঠীপদ; "প্রসঙ্গ : পান্ডব গোয়েন্দা"; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা (বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা)* ; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; সম্পা. তাপস ভৌমিক; কলকাতা; পৃ. ২৫১।

২৬. মিশ্র ভগীরথ; "বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাস ও আমি"; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা (বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা)* ; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; সম্পা. তাপস ভৌমিক; কলকাতা; পৃ. ২৬৩।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দারা

অধ্যায়টি বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একবার বিশ্বসাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে তাকানো যাক। এ বিষয়ে যাঁর কথা প্রথমেই বলতে হয়, তিনি একজন শখের গোয়েন্দা, মিস জেন মার্পল। ইংল্যান্ডের ছোট্ট গ্রাম সেন্ট মেরিজ মিড-এর বাসিন্দা। সাহিত্যের পাতায়, গোয়েন্দা সাহিত্যের রানি আগাথা ক্রিস্টির (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ – ১২ই জানুয়ারি, ১৯৭৬) জনপ্রিয় চরিত্র মিস মার্পলের প্রথম আবির্ভাব ১৯২৭-এ *দ্য রয়্যাল ম্যাগাজিন* – এ প্রকাশিত *দ্য টুইজডে নাইট ক্লাব* গল্পে। প্রথম উপন্যাস ১৯৩০-এ প্রকাশিত *দ্য মার্ডার অ্যাট দ্য ভিকারেজ।*

প্রথমদিকের কাহিনিগুলিতে আগাথা, অন্যের ব্যাপারে বেশি কৌতূহলী, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, বয়স্ক এক গ্রাম্য মহিলা হিসবে মিস মার্পলকে এনেছিলেন। কিন্তু পরের দিকে তাকে দয়ালু এবং পরোপকারী হিসেবে দেখতে পাওয়া গেছে।

মিস মার্পল অবিবাহিতা। আত্মীয় বলতে ভাইপো (অথবা ভাগ্নে) রেমন্ড ওয়েস্ট এবং তার স্ত্রী জোয়ান। রেমন্ড সাহিত্যিক। পিসিকে বেশ শ্রদ্ধা-ভক্তি করলেও তার বুদ্ধির ওপরে খুব ভরসা রাখে বলে মনে হয় না। *দ্য থাম্ব মার্ক অব সেন্ট পিটার* গল্পে মিস মার্পলের এক ভাইঝি কিংবা ভাগ্নি মেবেলের কথা জানা গিয়েছিল, কিন্তু তারপরে আর কখনও তাকে দেখা যায়নি।

সাধারণ গ্রাম্য মহিলাদের মতো মিস মার্পলকেও বেশিরভাগ সময়ই উল বুনতে দেখা যেত। কিংবা বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে। কিন্তু যাই করুন না কেন, তাঁর চোখ-কান যে সবসময়েই সজাগ, তা বোঝা যায় পরে, যখন তিনি একের পর এক যুক্তি সাজিয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহকারে অকাট্যভাবে কোনও রহস্যভেদ করতেন।

মিস মার্পলের রহস্যভেদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, তিনি রহস্য সমাধানের সময় সেই ঘটনায় জড়িত মানুষদের সাথে তাঁর নিজের গ্রাম, অর্থাৎ সেন্ট মেরিজ মিডের কোন না কোন বাসিন্দার মনোগত অথবা আচরণগত সাদৃশ্যের তুলনা করতেন। নিজের গ্রামের চেনা মানুষটি এহেন পরিস্থিতিতে কেমন ব্যবহার করবে বা কেমন প্রতিক্রিয়া দেবে তা আন্দাজ করে বৃদ্ধা সন্দেহভাজনের চরিত্র বোঝার চেষ্টা করতেন। বিশ্বসাহিত্যের আর অন্য কোনো ডিটেকটিভকে এইভাবে রহস্যভেদ করতে বোধহয় দেখা যায়নি। যদিও এই পদ্ধতি আদৌ কতদূর যুক্তিসঙ্গত, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

আর্থিক ব্যাপারে স্বচ্ছল মিস মার্পল গোয়েন্দাগিরিকে কখনোই পেশা হিসেবে নেওয়ার কথা ভাবেননি। অবশ্য এই আর্থিক দিক থেকে তিনি ভাইপো রেমন্ডের ওপরে বেশ নির্ভরশীল ছিলেন। তবে একবার এক ধনী ব্যক্তির খরচে তিনি একটি প্যাকেজ ট্যুরের যাত্রী হয়েছিলেন *নেমেসিস* উপন্যাসে। এই ট্যুর চলাকালীন তিনি একটি পরিবারের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের একটি পুরনো রহস্য সমাধান করেন।

মিস মার্পলকে নিয়ে লেখা আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাসগুলি হল –

দ্য মার্ডার অ্যাট দ্য ভিকারেজ (১৯৩০), দ্য বডি ইন দ্য লাইব্রেরি (১৯৪২), দ্য মুভিং ফিঙ্গার (১৯৪৩), আ মার্ডার ইস অ্যানাউন্সড্ (১৯৫০), দে ডু ইট উইথ মিররস্ (১৯৫২), আ পকেট ফুল অব রাই (১৯৫৩), ৪ ৫০ ফ্রম প্যাডিংটন (১৯৫৭), দ্য মিরর ক্র্যাকড্ ফ্রম সাইড টু সাইড (১৯৬২), আ ক্যারিবিয়ান মিস্ট্রি (১৯৬৪), অ্যাট বার্ট্রামস্ হোটেল (১৯৬৫), নেমেসিস (১৯৭১), স্লিপিং মার্ডার (১৯৭৬)।

এবং ছোটগল্পের সংকলনগুলি হল –

দ্য থার্টিন প্রবলেমস্ (১৯৩২), দ্য রুগাটা মিস্ট্রি অ্যান্ড আদার স্টোরিজ (১৯৩৯), থ্রি ব্লাইন্ড মাইস অ্যান্ড আদার স্টোরিজ (১৯৫০), দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ক্রিসমাস পুডিং (১৯৬০), ডাবল সিন অ্যান্ড আদার স্টোরিজ (১৯৬১), মিস মার্পলস্ ফাইনাল কেসেস অ্যান্ড টু আদার স্টোরিজ (১৯৭৯)।

প্রায় বারোটি উপন্যাস আর বহু ছোটগল্প লিখেছিলেন আগাথা, যেখানে মিস মার্পল রহস্যভেদে অবতীর্ণ। কোনো পারিবারিক খেতাব না থাকা সত্ত্বেও, কোনো ইংলিশ অ্যারিষ্টক্রেশির সদস্য না হয়েও মিস মার্পল যেভাবে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শিক্ষা এবং আচার-ব্যবহার দিয়ে একের পর এক কাহিনিতে পাঠকের হৃদয় জয় করেছেন, তাতে তাঁকে ইংরেজি সাহিত্যের তো বটেই, বিশ্বসাহিত্যের বিচারেও 'জেন্টলম্যান ডিটেকটিভ' হিসেবে গণ্য করতেই হবে।

******

মিস মার্পল ছাড়াও বিশ্বসাহিত্যের আর অন্যান্য মহিলা গোয়েন্দাদের খুঁটিনাটির দিকে একবার নজর দেওয়া যাক।

- এডওয়ার্ড স্ট্রেটমেয়ার (১৮৬২-১৯৩০) এবং তাঁর প্রকাশনা সংস্থার আরও অনেকে মিলে ক্যারোলিন কিন ছদ্মনামে ন্যান্সী ড্রিউ নামের এক কিশোরী গোয়েন্দা চরিত্রকে নিয়ে অন্তত ১৭৫টি উপন্যাস লিখেছেন। আমেরিকার নারীমুক্তির প্রতীক বলে মনে করা হয় ন্যান্সীকে। প্রথম প্রকাশ ১৯৩০-এ। এরপরে প্রায় উনিশ বছর পেরিয়ে অষ্টাদশী ও সুন্দরী এই গোয়েন্দাকে আরও ঘষে মেজে, আরও পরিশীলিত করে নতুনভাবে প্রকাশ করা হতে থাকে এই সিরিজের উপন্যাসগুলি।

ন্যান্সীর বয়স আঠেরোর কাছাকাছি। শৈশবে মাতৃহারা ন্যান্সীর বাবা কারসন ড্রিউ রীতিমত ধনী, পেশায় অ্যাটর্নি। ন্যান্সী পেশাদার গোয়েন্দা নয়, রহস্যজনক কিছু হঠাৎ করেই ন্যান্সীর গোচরে আসে, আবার কিছু আসে তার বাবার পেশার খাতিরে।

ন্যান্সী সাইকোলজির ছাত্রী এবং সে বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। এছাড়াও সে ভাল ছবি আঁকে, বিভিন্ন পদ রান্না করে, মোটরবোট চালায়, নৌকা বায়, সাঁতার কাটে, ব্রিজ খেলে, গলফ ও টেনিস খেলে। তাছাড়া ঘোড়ায় চড়া ও গাড়ি চালানোয় তার বিশেষ দক্ষতা আছে। অর্থাৎ, এককথায়, সর্বগুণসম্পন্না।

- আর্ল স্ট্যানলি গার্ডনার (১৮৮৯-১৯৭০), যিনি বিখ্যাত পেরি ম্যাসনের জনক, তাঁর মেয়ে গোয়েন্দা হল বার্থা কুল ।

- এনিড ব্লাইটন (১৮৯৭-১৯৬৬) - এঁর ফেমাস ফাইভ সিরিজ প্রকাশ হতে শুরু করে ১৯৪৩ সালে। ১৯৪৩-এ প্রকাশিত *ফাইভ অন আ ট্রেজার আইল্যান্ড* থেকে শুরু করে ১৯৬২-র *ফাইভ আর টুগেদার এগেন* পর্যন্ত তিনি এই সিরিজের প্রায় একুশটি উপন্যাস লিখেছিলেন। ফেমাস ফাইভের পাঁচ খুদে সদস্যের মধ্যে অ্যানি এবং তার তুতো বোন জর্জিনা হলো কিশোরী। আর আছে অ্যানির ভাই জুলিয়ান ও ডিক এবং জর্জিনার পোষ্য বিশালদেহী মংগ্রেল কুকুর টিমোথি ওরফে টিমি – এই হলো ফেমাস ফাইভের দল।

জুলিয়ান, ডিক এবং অ্যানি বোর্ডিং স্কুলে পড়ে। স্কুলের ছুটিতে প্রতিবার তারা বেড়াতে যায় কর্নওয়ালের সমুদ্র উপকূলে কিরিন শহরে আঙ্কল কোয়েন্টিন ও আন্টি ফ্যানির বাড়িতে। সেখানে থাকে এই আঙ্কল-আন্টির মেয়ে জর্জিনা। সে বেশ ডাকাবুকো মেয়ে, ইংরিজিতে যাকে বলে টমবয়, নিজের পরিচয় দেয় জর্জ নামে। মাথার চুল ছোট করে কেটে রাখে, ছেলেদের পোশাক পরে। রেগে গেলে তার হুঁশ থাকে না। ব্লাইটন পরবর্তীকালে স্বীকার করেন, ওই মেয়েটিকে তিনি নিজের ছোটবেলার আদলেই গড়েছিলেন। কোনো কোনো গল্পে জিপসি মেয়ে জো-কে তাদের সঙ্গী হতে দেখা যায়।

স্কুলছুটির দিনগুলিতে এই ফেমাস ফাইভ জড়িয়ে পড়ে নানান রহস্যময় ঘটনা বা রোমাঞ্চকর অভিযানের সাথে। তাদের বেশিরভাগ কাহিনি কিরিন দ্বীপের সাগর-উপসাগর

লাগোয়া খাঁড়ি, সেখানকার পাথুরে পাহাড়ি অঞ্চল, প্রাচীন পরিত্যক্ত প্রাসাদ, জলদস্যু আর চোরাচালানকারীদের লুকোন সুড়ঙ্গ ইত্যাদির পটভূমিকায় রচিত। কোনো কোনো ছুটিতে দূরে কোথাও ক্যাম্পে থাকতে বা চড়ুইভাতি করতে দেখা যায় তাদের। আঙ্কল কোয়েন্টিন হলেন বিজ্ঞানী, তিনি অপহৃত হলেও ভরসা সেই বিখ্যাত পাঁচ খুদে।

প্রসঙ্গত, ব্লাইটনের ফেমাস ফাইভের আদলেই বাংলায় সন্দেশ পত্রিকার পাতায় নলিনী দাশ তাঁর 'গোয়েন্দা গন্ডালু'-র সিরিজের চারটি স্কুলপড়ুয়া কিশোরী মেয়ের রহস্য ও রোমাঞ্চকর অভিযানের গল্প লিখতেন। গন্ডালুর গল্পগুলি পড়লেই বোঝা যায়, শুধু চরিত্রের ক্ষেত্রেই নয়, অনেকসময় গল্পের কাহিনির ক্ষেত্রেও ব্লাইটনের অনুবর্তিনী হয়েছেন লেখিকা।

- স্টুয়ার্ট পামার (১৯০৫-১৯৬৮) এর গোয়েন্দা হিলডাগ্রেড ইউদার্স।

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন বিমান-বাহিনির 'এয়ার গানার' ফরেস্ট ফিকলিং (১৯২৫-১৯৯৮) ও তাঁর স্ত্রী গ্লোরিয়া ফিকলিং(১৯৪৯-১৯৯৮), যাঁদের যুগ্ম ছদ্মনাম জি জি ফিকলিং, তাঁরা লিখেছেন মেয়ে গোয়েন্দা হানি ওয়েস্টের কাহিনি। এই সিরিজের প্রথম কাহিনি *দিস গার্ল ফর হায়ার* প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। তারপর ১৯৬৪ পর্যন্ত একে একে *গার্ল অন দ্য লুজ, আ গান ফর হানি, হানি ইন দ্য ফ্লেশ, গার্ল অন দ্য প্রল, কিস ফর আ কিলার, ডিগ আ ডেড ডল, ব্লাড অ্যান্ড হানি, বম্বশেল* প্রকাশিত হয়। তার বেশ কয়েক বছর পর ১৯৭১-এ *হানি অন হার ট্রেল* এবং ১৯৭২-এ *স্টিফ অ্যাজ আ বোর্ড* প্রকাশিত হয়।

গ্লোরিয়া ছিলেন বিখ্যাত *লুক ম্যাগাজিনের* ফ্যাশন এডিটর এবং *ফ্যাশন ওয়্যার ডেলি* পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা। তাঁর কথা থেকেই জানা যায়, হানি ওয়েস্টের কাহিনি বেশিরভাগটাই লিখতেন ফরেস্ট। শুধু ওয়েস্টের পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপার এবং নারী-কেন্দ্রিক বিষয়গুলি দেখতেন তিনি নিজে।

হানি সুন্দরী, বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ এক বেসরকারি গোয়েন্দা। *লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস* -কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লেখক ফরেস্ট ফিকলিং জানিয়েছিলেন, সাহিত্যের গোয়েন্দা

মাইক হ্যামার এবং বিখ্যাত অভিনেত্রী মেরিলিন মনরোর মিশেল হল হানি ওয়েস্ট। তার নাম হানি, কারণ পছন্দের নারীর এর থেকে ভালো নাম আর হতে পারে না, আর পদবি ওয়েস্ট, কারণ সে আমেরিকার ওয়েস্ট কোস্টে থাকে।

- মার্কিন শিক্ষাবিদ ও সে দেশের নারীবাদী আন্দোলনের অন্যতম ক্যারোলিন গোল্ড হিলব্রুন (১৯২৬-২০০৩), আমান্ডা ক্রস ছদ্মনামে লিখেছেন কাল্পনিক চরিত্র কেট ফ্যান্সলারকে নিয়ে। কেট নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে সাহিত্যের অধ্যাপক। ক্যারোলিন নিজেও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে পি এইচ ডি করেছিলেন। কেট ফ্যান্সলার সিরিজের প্রথম উপন্যাস *ইন দ্য লাস্ট অ্যানালিসিস* ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। ফ্যান্সলারের গোয়েন্দাগিরির সাথে শিক্ষামহল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ দেখা গেছে প্রায় সব কাহিনিতেই। অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে ও পারিপার্শ্বিক সূত্রের ওপরে ভিত্তি করে ফ্যান্সলার রহস্যভেদের চেষ্টা করে থাকেন।

এই সিরিজের উল্লেখযোগ্য কাহিনিগুলির মধ্যে *পোয়েটিক জাস্টিস, দ্য কোয়েশ্চেন অব ম্যাক্স, নো ওয়ার্ড ফ্রম ইউনিফ্রেড, অ্যান ইমপারফেক্ট স্পাই, দ্য পাজলড হার্ট, অনেস্ট ডাউট* ইত্যাদি অন্যতম। ফ্যান্সলারকে নিয়ে লেখা শেষ উপন্যাস *দ্য এজ অব ডুম* প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে। পরের বছর, অর্থাৎ ২০০৩-এ নিউ ইয়র্কে তাঁর নিজের বাসস্থানে আত্মহত্যা করেন হিলব্রুন। সুইসাইড নোটে লেখা ছিল, 'দ্য জার্নি ইজ ওভার। লাভ টু অল।'

- মার্কিন লেখক বারবারা মের্টজ (১৯২৭-২০১৩), ছদ্মনাম এলিজাবেথ পিটার্স। বারবারা শিকাগো ইউনিভার্সিটি থেকে ইজিপ্টোলজি বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। ফলে তাঁর গোয়েন্দা গল্পে প্রাচীন মিশর বিশেষভাবে এসে হাজির হয়। তাঁর মেয়ে গোয়েন্দা এমিলিয়া পিবডি-র গল্পগুলির প্রেক্ষাপট উনিশ শতকের শেষ দিক।

পিবডি-র আবির্ভাব *ক্রোকোডাইল অন দ্য স্যান্ডব্যাঙ্ক* (১৯৭৫) উপন্যাসে। ঘটনার সময়কাল ১৮৮৪ সালের। ২০১০ সাল পর্যন্ত এই সিরিজে প্রায় উনিশটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। শেষটি হল *আ রিভার ইন দ্য স্কাই*, অন্যান্যগুলির মধ্যে *দ্য কার্স অব দ্য ফারাওস, দ্য*

লাস্ট ক্যামেল ডায়েড অ্যাট নুন, দ্য ফ্যালকন অ্যাট দ্য পোর্টাল, গার্জেন অব দ্য হরাইজন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এমিলিয়া পিবডি এক বিশেষ ধরণের পোশাক পরে। আপৎকালের জন্য যার ভেতরদিকে থাকা একাধিক পকেটে সে ছুরি, পিস্তল, ব্র্যান্ডির শিশি, কিছু খাবার, ওয়াটারপ্রুফ বাক্সে মোমবাতি, দেশলাই, পেনসিল, নোটবই, সুচ-সুতো, কম্পাস, কাঁচি, শক্ত অথচ হালকা দড়ি, ফার্স্ট এড প্রভৃতি রেখে দেয়।

এই জনপ্রিয় সিরিজটি ছাড়াও আরও দু'টি গোয়েন্দা সিরিজের রচয়িতা এলিজাবেথ। একটিতে ডিটেকটিভ ভিকি ব্লিস আমেরিকার কলেজে আর্ট-হিস্ট্রি পড়ায়। কোনও আন্তর্জাতিক চক্র বা শিল্পদ্রব্য চোরাচালানকারীদের অনুষঙ্গ এই সিরিজের গল্পে ঘুরেফিরে আসে। প্রথম উপন্যাস *বরোয়ার অব দ্য নাইট,* অন্যন্যগুলি হল *স্ট্রিট অব দ্য ফাইভ মুনস, সিলুয়েট ইন স্কারলেট, ট্রোজান গোল্ড, নাইট ট্রেন টু মেমফিস এবং দ্য লাফটার অব দ্য ডেড কিংস।*

এলিজাবেথের অন্য গোয়েন্দাটিও মহিলা। তিনি পেশায় লাইব্রেরিয়ান ও নেশায় গোয়েন্দা জ্যাকলিন কার্বি। বেজায় ধনী এই মহিলা প্রথম উপন্যাস *দ্য সেভেনথ সিনার* (১৯৭২) - এ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তদন্তে জড়িয়ে পড়ে। পরের উপন্যাসগুলি *মার্ডারস অব রিচার্ড দ্য থার্ড, ডাই ফর লাভ, নেকেড ওয়ান্স মোর* ইত্যাদি।

- আধুনিককালের বিখ্যাত ডিটেকটিভ কাহিনি লেখক স্যু গ্রাফটনের (১৯৪০-২০১৭) বিশেষত্ব হল তাঁর উপন্যাসগুলির নামে। প্রথম বই *এ ইজ ফর অ্যালিবাই, তারপর বি ইজ ফর বার্গলার, সি ইজ ফর কর্পস* ইত্যাদি। ইংরেজি বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর ছুঁয়ে ছুঁয়ে তাঁর সিরিজ গিয়ে থেমেছে *ওয়াই ইজ ফর ইয়েসটারডে* - তে পৌঁছে। লেখিকা জানিয়েছিলেন, এই সিরিজের শেষ বইটির নাম হবে *জেড ইস ফর জিরো*। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তা লেখা আর সম্ভব হয়নি।

অ্যালফাবেট সিরিজের সবক'টি গল্পেই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর মিসেস কিনসে মিলহনের দেখা মেলে। ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারিয়ে কিনসে বড় হয়েছে তার আন্ট জিনের কাছে। কলেজের পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে প্রথমে পুলিশের চাকরি, পরে আন্ট জিনের কর্মস্থল ক্যালিফোর্নিয়া ফাইডেলিটি ইনসিয়োরেন্সে ইনভেস্টিগেটরের চাকরি নেয় কিনসে। সেখানে বছর দুয়েক চাকরি করার পর নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থা শুরু করে।

কিনসে মিলহনের ওজন একশো আঠেরো পাউন্ড। উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি। পছন্দের পোশাক হল জিনস্-এর প্যান্ট আর টার্টলনেক সোয়েটার। দু'বার বিয়ে করেছে কিনসে, কোনোটাই টেঁকেনি। ছোট্ট বাসায় একাই থাকে।

স্যু গ্রাফটনের লেখায় কিনসে মিলহনের কাহিনিগুলির সময়কাল উনিশ শতকের আশির দশক। লেখকের ইচ্ছে ছিল শেষ উপন্যাসটিকে এনে ফেলবেন নব্বইয়ের প্রেক্ষাপটে, যাতে কিনসের জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে পারা যায়। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

- মার্কিন লেখিকা মার্সিয়া মুলার (জন্ম ১৯৪৪)-এঁর মহিলা ডিটেকটিভ, সানফ্রানসিসকো শহরের প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর শ্যারন ম্যাককন। শ্যারনকে হার্ড বয়েলড ডিটেকটিভ বলা চলে। সে শিক্ষিত, শক্তপোক্ত ও ডানপিটে। সান ডিয়েগোর নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মেও সে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পেরেছে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সিকিওরিটি গার্ড-এর ভূমিকায় কর্মজীবন শুরু করে সে ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে হার্ড বয়েলড ডিটেকটিভে। লক্ষণীয়, এই প্রথম কোনো মেয়ে ডিটেকটিভকে পাওয়া গেল, যে হার্ড বয়েলড, এবং সমাজের নিম্নস্তর থেকে উঠে আসা। সম্ভবত, শ্যারনের জীবনসংগ্রামই তাকে 'হার্ড বয়েলড' হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

শ্যারন ম্যাককনের আবির্ভাব ১৯৭৭-এ প্রকাশিত *এডউইন অব দ্য আয়রন গুজ* উপন্যাসে। ২০১১-তে প্রকাশিত হয়েছে উনত্রিশতম উপন্যাস *সিটি অব হুইসপার্স*। রয়েছে প্রায় বাইশটি ছোটগল্প।

নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে ম্যাককনের সাথে কাজ করতে শুরু করে রে কেলহার। তখন থেকেই পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে ম্যাককনের গোয়েন্দাগিরিতে। ডিডাকশন পদ্ধতির সাথে যুক্ত হয় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

শ্যারন ম্যাককন সিরিজের উল্লেখযোগ্য কাহিনিগুলি হল – *দ্য চেশায়ার ক্যাটস আই, দেয়ার্স নাথিং টু বি অ্যাফ্রেড অব, ট্রফিজ অ্যান্ড ডেড থিংস, উলফ ইন দ্য শ্যাডোজ, বোথ এন্ডস অব দ্য নাইট, লিসন টু দ্য সাইলেন্স, ভ্যানিশিং পয়েন্ট, লকড ইন* ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্যারন ম্যাককন ছাড়াও মার্সিয়া মুলার আরও কয়েকটি সিরিজ লিখেছেন। সেগুলির গোয়েন্দারাও মহিলা। যদিও তারা কেউই শ্যরনের মতো জনপ্রিয় হতে পারেনি। এদের

মধ্যে এলিনা আলভারেজ সিরিজে লেখা হয়েছিল মাত্র তিনটি উপন্যাস। অন্য একটি সিরিজের গোয়েন্দার নাম জোয়ানা স্টার্ক। তাকে নিয়েও তিনটি উপন্যাস লেখা হয়।

- লরি আর কিং (জন্ম ১৯৫২) – এঁর চরিত্র মেরি রাসেল; যার জন্ম ১৯০০-তে। কিং নিজে মার্কিন হলেও মেরি রাসেল ব্রিটিশ। মেরির কান্ডকারখানা সম্পর্কে কিং জানতে পেরেছেন রাসেলের বৃদ্ধ বয়েসে লেখা স্মৃতিচারণের পান্ডুলিপি অজানা কেউ কিং-এর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ায়।

মেরি রাসেলের নিজের বর্ণনায় তার চেহারা রোগা এবং লম্বা। চোখ খারাপ তাই চশমা ব্যবহার করতেন। নীল চোখ, লম্বা সাদা চুল। পুরুষদের মতো প্যান্ট-শার্ট পছন্দের পোশাকের মধ্যে পড়ে।

কিন্তু মেরি রাসেলের ব্যাপারে সবচেয়ে যা উল্লেখযোগ্য তা হলো, ১৯৯৪-তে প্রকাশিত এই সিরিজের প্রথম উপন্যাস *দ্য বি-কিপারস অ্যাপ্রেন্টিস* - এ পঞ্চদশী মেরির সাথে নিতান্ত ঘটনাচক্রে সাসেক্সের উপকূলে অবসর কাটানো শার্লক হোমসের পরিচয় হয়। মেরির ডিডাকশন করার ক্ষমতা দেখে অভিভূত হয়ে যাওয়া শার্লক মেরিকে গোয়েন্দাগিরির প্রশিক্ষণ দিতে রাজি হয়ে যায়।

পরবর্তী উপন্যাস *আ মনস্ট্রাস রেজিমেন্ট অব উইমেন* - এ শার্লকের সাথে মেরির ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সিরিজের তৃতীয় উপন্যাস *আ লেটার অব মেরি* - তে দেখা যায় শার্লক হোমস এবং মেরি রাসেল বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন !

এরপর একের পর এক রহস্যের ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছেন শার্লক ও মেরি একসাথে। তাদের মধ্যে ২০০৪ – এ প্রকাশিত ১৯২৪ সালের পটভূমিতে লেখা *দ্য গেম* উপন্যাসে দেখা যায়, শার্লকের দাদা মাইক্রফটের অনুরোধে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কোনো এক স্থানে ব্রিটিশ গুপ্তচর কিম্বল ও' হারার সন্ধানে এসেছিলেন মেরি ও শার্লক। এটি সম্ভবত শার্লকের দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন। প্রথমবার এসেছিলেন ওয়াটসনের সাথে। সেবার কলকাতায় এসে দেখা করেছিলেন গরিব মাস্টারমশাই রাখাল মুস্তৌফির সঙ্গে। জানা যায়, রাখাল মাস্টারের কাছ থেকে কিছু দা'-কাটা তামাকও হোমস সাথে করে লন্ডনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই গল্প অবশ্য মেরি রাসেলের স্মৃতিচারণে পাওয়া যায়নি। এ কাহিনি আমাদের বলেছিলেন পরশুরাম।

- সুইডিশ লেখিকা স্টিগ লারসন (১৯৫৪-২০০৪) -এঁর গোয়েন্দা লিজ্‌বেথ স্যালান্ডার।

- লরা লিপম্যানের (জন্ম ১৯৫৯) লেখা *বাল্টিমোর ব্লুজ* উপন্যাসে আবির্ভাব ঘটে সেই শহরের প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর টেস মনাঘানের। টেসের বাবা প্যাট্রিক ছিল লিকার বোর্ডের ইন্সপেক্টর। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত *বাল্টিমোর ব্লুজ* - এ টেসের বয়েস ছিল উনত্রিশ। অষ্টম কাহিনি *বাই আ স্পাইডারস থ্রেড* – এ টেসকে ত্রিশের কোঠায় দেখা যায়।

মেরিল্যান্ডের ওয়াশিংটন কলেজ থেকে ইংরেজি ভাষায় ডিগ্রি পাওয়ার পর 'বাল্টিমোর স্টার' পত্রিকায় যোগ দেয় টেস, কিন্তু সেই কাগজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে কর্মহীন হয়ে পড়ে এবং পেশাদার গোয়েন্দাগিরিকে বেছে নেয়। মানসিকভাবে টেস বেশ কঠিন স্বভাবের হলেও তার চরিত্রে কিছু মানবিক দিকও ফুটিয়ে তুলেছেন লরা। বাল্টিমোরের রোম্যান্ড পার্ক এলাকায় একটি বাংলোয় একটি ডোবারম্যান এবং একটি গ্রে হাউন্ড কুকুর নিয়ে বাস করে টেস। শহরের বিভিন্ন রেস্তরাঁয় গিয়ে পছন্দের খাবার খাওয়া তার শখের মধ্যে অন্যতম।

টেসের মতো লেখক লরা নিজেও বাল্টিমোরের বাসিন্দা এবং তাঁর পড়াশোনাও মেরিল্যান্ডে। টেস মনাঘান সিরিজে এ পর্যন্ত বারোটি উপন্যাস ও বেশ কিছু ছোটগল্প লেখা হয়েছে। টেস-কাহিনি *দ্য গার্ল ইন দ্য গ্রিন রেনকোট* ২০১১ সালে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস* ম্যাগাজিনে। শেষ উপন্যাস *হাস, হাস* প্রকাশিত হয়েছে ২০১৫-তে।

- মধ্য ত্রিশের এক মহিলা গোয়েন্দা থার্সডে নেক্সট-কে নিয়ে উপন্যাস লেখেন ব্রিটিশ লেখক জ্যাসপার ফোর্ড (জন্ম ১৯৬১)। প্রথম কাহিনি *দ্য আয়ার অ্যাফেয়ার* প্রকাশিত হয় ২০০১-এ। তাঁর এই সিরিজের অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল *লস্ট ইন আ গুড বুক, দ্য ওয়েল অব লস্ট প্লটস, সামথিং রটন, ফার্স্ট অ্যামং স্যিকুয়েলস, ওয়ান অব আওয়ার থার্সডে ইস মিসিং, দ্য ওম্যান হু ডায়েড আ লট* ইত্যাদি।

ফোর্ডের এই উপন্যাসগুলিতে সমান্তরাল জগৎ, কাল্পনিক পৃথিবী, রূপকথা এই সবকিছু মিলেমিশে একটু অন্যধরণের আস্বাদ পাঠক লাভ করে।

❖

বাঙালি সাহিত্যিকরা প্রচুর গোয়েন্দা গল্প লেখেন, কিন্তু কেউ মেয়েদের গোয়েন্দাগিরি নিয়ে লেখালেখি করেন না, এই বিষয়ে আক্ষেপ করে আশাপূর্ণা দেবী লিখেছিলেন –

"মেয়েরাও গোয়েন্দাগিরিতে কম তুখোড় হতে পারে না.... এই তো – ঘরে সংসারে, এদিকে-সেদিকে নিরীক্ষণ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে – মেয়েরা সহজেই সহজাত ক্ষমতায় 'অপরাধের' গন্ধটি পায় ! আর পেয়ে তার মূল উৎসটি আবিষ্কার করে ফেলতে ছেলেদের থেকে চতুর্গুণ উৎসাহ বোধ করে। তবু গোয়েন্দা গল্প লিখিয়েরা যে-কেন সেদিকে নজর দেন না !...কারণটা আর কিছুই নয়, অন্তত আমার তাই মনে হয়, মেয়েরা তো পুরুষের মতো কেবলমাত্র একটি 'সহকারিণী' বা একটি বিশেষ ঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন কুকুরকে সম্বল করে রণে-বনে-অরণ্যে, পাহাড়চূড়োয়, এমনকী সমুদ্দুরের তলায় পর্যন্ত হানা দিয়ে উঠতে পারে না। তাদের অনেক অসুবিধে ! .... আর আমাদের এই ঘরোয়া বাঙালি বাড়ির মেয়েদের তো কথাই নেই। পদে পদে বাধা !"[১]

প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্যে মেয়েদের গোয়েন্দাগিরির বেশ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, *মনসামঙ্গল* কাব্যে ফুলের সাজির মধ্যে দেবী চন্ডীর মনসাকে খুঁজে পাওয়ার ঘটনা অথবা বৈষ্ণব কবিতায় রাধার ননদিনীর প্রসঙ্গ। বলাই বাহুল্য, সেই সব মেয়েরা কেউই গোয়েন্দা ছিল না। আটপৌরে সাংসারিক গন্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করত তাদের শানিত বুদ্ধির কারসাজি। পরবর্তীকালে, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের *বিন্দিপিসির গোয়েন্দাগিরি* অথবা প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের *ঠাকুমার গোয়েন্দাগিরি*-র মতো কয়েকটি বিক্ষিপ্ত উদাহরণ বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে কোনো মহিলার গোয়েন্দাগিরি করা নিয়ে লেখালেখির

সূত্রপাত বিশ শতকের চল্লিশের দশকে, প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর ‘কৃষ্ণা’ সিরিজের হাত ধরে। সৌভাগ্যের বিষয়, আশাপূর্ণা যখন এই কথা লিখছেন, সেই সময়ের আশে পাশেই জন্ম নিয়েছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা গোয়েন্দা কৃষ্ণা, মেয়েদের এই তথাকথিত ‘বাধা’ বা সমস্যার অনড় মিথকে ভেঙেচুরে দিয়ে যে বহুদিন বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের আসর মাত করে রাখবে।

❖

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে দেব সাহিত্য কুটীর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল দু-খানি গোয়েন্দা গল্পের সিরিজ, *প্রহেলিকা* ও *কাঞ্চনজঙ্ঘা* । কিশোরী কৃষ্ণাকে নিয়ে প্রভাবতী দেবীর (৫ই মার্চ, ১৯০৫ – ১৪ই মে, ১৯৭২) আত্মপ্রকাশ এখানেই।

কৃষ্ণার বাবা মিঃ সত্যেন্দ্র চৌধুরী উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী। তিনি রেঙ্গুনে চাকরি করেছেন দীর্ঘ কুড়ি বছর। সরকারি খেতাব এবং প্রচুর অর্থ সবই তিনি পেয়েছিলেন। কৃষ্ণার মা মারা গেছেন তিন মাস আগে। এখন সংসারে মিঃ চৌধুরীর আপন বলতে একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কেউ নেই। কৃষ্ণার জন্ম, পড়াশুনো সবই বর্মায়। বাংলার সাথে তার কোন পরিচয়ই নেই। তাই তার বাবা যখন অসময়ে চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে বর্মার পাট চুকিয়ে কলকাতায় ফিরতে চেয়েছেন, কৃষ্ণা অবাক হয়েছে। বাবাকে জিগ্যেস করেছে। কিন্তু তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

এবার কৃষ্ণার পরিচয় দেওয়া যাক। প্রথম কৃষ্ণা-কাহিনি *গুপ্তঘাতক* - এ কৃষ্ণার বয়স মাত্র ষোল-সতেরো বছর। সচরাচর বাঙালি ঘরে এই বয়সের মেয়েরা যেমন ভীরু নম্র বা

শান্ত হয়, কৃষ্ণা তেমন ছিল না। বাঙালির ঘরে এই বয়সের ছেলেরা যেমন হয়, কৃষ্ণা তেমনও ছিল না। বাবার শিক্ষায় সে ইতিমধ্যেই অনেক কিছুই জেনে-শুনে ফেলেছে। এই বয়সে কৃষ্ণা মাতৃভাষা ছাড়া আরও পাঁচ-সাতটি ভাষা রপ্ত করেছে। শুধু শেখেইনি, এইসব ভাষাতে সে অনর্গল কথা বলে যেতে পারে, পড়তে পারে। বাবা তাকে অশ্বারোহন শিখিয়েছেন। গাড়ি সে নিজেই চালাতে পারে। বাবার সাথে বর্মার জঙ্গলে সে বহু শিকার করেছে। উপযুক্ত ব্যায়ামের ফলে তার দেহ সুগঠিত, শক্তিশালিনী। দেহে যেমন তার অটূট শক্তি, মনে তেমনই তার অকুতো সাহস।

কৃষ্ণার ঠাকুর্দা, অর্থ্যাৎ মিঃ চৌধুরীর পিতাও পুলিশকর্মী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই মিঃ চৌধুরীর ঝোঁক ছিল পুলিশলাইনে কাজ করার। বিদেশে বাঙালির নাম-যশ খ্যাতি ছড়িয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল তাঁর। সেই চেষ্টা থেকেই বর্মায় চাকরি নিয়ে যাওয়া। তিনি সব সময় চেয়েছেন তাঁর কন্যাও তাঁর মতই হোক, অকুতোভয়। তিনি কৃষ্ণাকে বলেছেন –

“ আমার ছেলে নেই, তুমি মেয়ে হলেও তোমায় গড়ে তুলেছি ছেলের মতো – আমি আশাও করি আমার যা কিছু অসমাপ্ত কাজ তুমি শেষ করবে, আমার মুখ তুমি উজ্জ্বল করবে।”[২]

এই গল্পে মিঃ চৌধুরীও কোন এক গুপ্ত ঘাতকের হাতে খুন হয়ে যান। মায়ের পর বাবাকেও হারিয়ে কৃষ্ণা যখন শোকস্তব্ধ, সেই সময় তার পিতৃবন্ধু পুলিশকর্মী ব্যোমকেশবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করেন এরপর তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি, তখন কৃষ্ণা বলে –

“ এখনও কিছু ঠিক করিনি কাকাবাবু, যা করব তা পরে জানাব। কিন্তু আপনারা বাবার হত্যাকারীকে ধরবার কিছু করলেন কি ? কোনো সন্ধান পেলেন ?”[৩]

পিতার মৃতদেহ স্পর্শ করে সে শপথ করেছে, পিতা-মাতা হত্যার প্রতিশোধ সে নেবেই।

তদন্ত ভুল পথে চালিত হচ্ছে দেখে এই কৃষ্ণাই ব্যোমকেশবাবুকে বলেছে, রামের দোষ শ্যামের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তার বাবা-মাকে একই লোক হত্যা করেছে। এবং সে বার্মিজ দস্যু ইউ-উইন ছাড়া আর কেউ নয়। যে তাকে ধরে দিতে পারবে তার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছে। এবং শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে নিজেই তদন্ত শুরু করতে চেয়েছে। এই কাজে তার সহায়ক হয়েছে তার মামা প্রণবেশ। বস্তুত, কৃষ্ণার কাহিনিগুলি পড়লেই বোঝা যায়, যে কৃষ্ণা মেয়ে হয়ে দুঁদে পুলিশ ব্যোমকেশবাবুকে গোয়েন্দাগিরিতে টেক্কা দেবে, এই ব্যাপারটা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। তিনি বলেন

" আরে, গোয়েন্দাগিরি কি সবার ধাতে পোষায় ? এ-সব পুরুষের কাজ – মেয়ে হয়ে তুই করতে আসিস কেন ?" প ১৮৬ কৃষ্ণাও সেটা বোঝে। তাই মামাকে সে বলে – " কাকাবাবু বোঝেন একরকম, কাজ করেন অন্যরকম। ওঁর মনের ধারণা, উনি যা করবেন তাই নির্ভুল, অন্যে যা করবে সে সবই ভুল। আমি যে এতবড় একটা সূত্র এনে দিলুম, সেটাও উনি উড়িয়ে দিচ্ছেন। ওঁর ওপরে নির্ভর করে থাকলে শুধু হবে না মামা ! এস, আমরা দুই মামা-ভাগনিতে অন্যদিক দিয়ে কাজ করি।"[৪]

কৃষ্ণার অপূর্ব ছদ্মবেশ ধারণের কথাও এ গল্পে আছে। লেখকের বর্ণনায় –

" নিখুঁত একটি ইউরোপিয়ান-বালিকা, - এই গাউনে আর টুপিতে তাহাকে বড় সুন্দর মানাইয়াছে। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌর থাকায় কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না যে, সে ইউরোপিয়ান নয়। প্রণবেশ তাহার ইংরেজি উচ্চারণ শুনিয়াছেন, -ইউরোপিয়ান গভর্নেসের কাছে দুই বৎসর হইতে মানুষ হওয়ায় কথাবার্তা ও চালচলনে তাহাকে সর্বাংশে ইউরোপিয়ান-বালিকা বলিয়াই মনে হয়।"[৫]

গ্রহের ফের গল্পে কৃষ্ণা লুঙ্গি, গায়ে ডোরাকাটা বেনিয়ান আর মাথায় পাঞ্জাবি পাগড়ি পরে একটি কিশোর ছেলের ছদ্মবেশে মামার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন প্রণবেশও তাকে চিনতে পারেননি।

গুপ্ত ঘাতক গল্পের শেষে ইউ-উইন কৃষ্ণাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে ঘায়েল করে পালিয়েছিল। দীর্ঘ দু'মাস অসুস্থ হয়ে ব্যোমকেশবাবুর বাড়িতে থাকার পরে কৃষ্ণা নিজের বাড়িতে ফিরতে চাইলে ব্যোমকেশ সংশয় প্রকাশ করেছে –

" এ কি সম্ভব হতে পারে কৃষ্ণা ! তুমি মেয়ে – তার ওপর তোমার বয়স নেহাৎ কম, তুমি তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ কি করে নেবে ? সংসারের কতটুকুই বা তুমি জানো বল ? দুনিয়ায় এমন সব লোকের সংস্পর্শে আমাদের আসতে হয়েছে, যারা ইউ-উইনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আমরা আমাদের কাজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, তাদের ধরা বা শাস্তি দেওয়া কতখানি বিপজ্জনক ! ও সব চিন্তা তুমি ছাড়, --নিজের বাড়িতে থেকে বরং পড়াশোনা করো, যা করবার আমরাই করব !"[৬]

বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর কৃষ্ণার পিতৃবংশে আর কেউ বেঁচে নেই। মাতৃবংশে দাদামশাই-দিদিমা ছিলেন, তাঁরাও গত হয়েছেন। এখন আত্মজন বলতে মামা প্রণবেশ ছাড়া কৃষ্ণার আর কেউ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার পিতৃহন্তারক ইউ-উইনের চরম শাস্তি হচ্ছে, ততক্ষণ কৃষ্ণা শান্তি পাবে না। আর এই কাজে সে মামাকে পাশে চায়। প্রণবেশ তার ভাগ্নীটিকে বিলক্ষণ চেনে। তাই সেও উৎসাহিত হয়ে তাদের দারোয়ান প্রতাপ সিংয়ের কাছে কুস্তি শিখছে। তার বিশ্বাস সে যদি রোজ ব্যায়াম করে তাহলে গায়ে যা শক্তি হবে তা দিয়ে সে একাই দু'-পাঁচ জনকে আছাড় দিতে পারবে।

আত্মরক্ষার জন্য কৃষ্ণা রিভলবার চালাতেও দ্বিধা করে না। *হত্যার প্রতিশোধ* গল্পে পালানোর সময় সে অব্যর্থ লক্ষ্যে মহীপালকে গুলি করে হত্যা করে। কৃষ্ণার মনের মধ্যে যে একটি কোমল দিকও আছে তা জানা যায় যখন ইউ-উইনকে চরম শাস্তি দেওয়ার পরেও কৃষ্ণা তার সাহসের কথা ভুলতে পারে না। ইউ-উইন তার পিতৃহত্যাকারী। তা ছাড়াও সে বহু নির্দোষ লোককে হত্যা করেছে। অনেকের বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণাকে সে দু'বার অপহরণ করেছে। হয়তো আরেকবার তাকে ধরতে পারলে মেরেই ফেলত। তবু কৃষ্ণা আরেক দিক দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা করে – সেটা তার বীরত্বের দিক। অতখানি শক্তি সাহস কোনো সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

দুর্ধর্ষ দস্যু ইউ-উইনের মৃত্যুর পর পুলিশ কর্মচারী ব্যোমকেশবাবুর সাথে কৃষ্ণাও গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছিল, এবং সেদিনই তার মামাকে সে জানিয়েছিল, সে আর পড়াশোনা করতে চায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না হলেও তার দিন চলবে। সে এমন কোনো কাজ করতে চায়, যাতে মানুষের উপকার হবে আবার কাজটা করে সে নিজেও আনন্দ পাবে।

গ্রহের ফের গল্পে জানা যায়, কৃষ্ণা স্কটিশ চার্চ কলেজে আই এ পড়ছে। পুজোর ছুটিতে সে বেড়াতে এসেছে কলকাতার অদূরে বসিরহাটে, পিতৃবন্ধু ও স্থানীয় এস.ডি.ও অতুল মিত্রের বাড়িতে। অতুলবাবু আর তার স্ত্রী দু'জনেই কৃষ্ণাকে খুব স্নেহ করেন। তবে সব থেকে বেশি ভালবাসা সে পেয়েছে তাঁদের কিশোর পুত্র দেবুর কাছে। সে কৃষ্ণার অলৌকিক কীর্তি কাহিনি শুনে তার একান্তই ভক্ত হয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণার যে কোনো কাজকেই সে সম্ভ্রমের চোখে দেখত। ঘটনাক্রমে এই দেবু পিকনিক করতে গিয়ে যখন আর বাড়ি ফেরে না তখন কৃষ্ণাই তাকে উদ্ধারের দ্বায়িত্ব নেয়। চিন্তায় আকুল মিঃ মিত্রকে কৃষ্ণা বলেছে –

" নিজে যখন কিছুই পারবেন না, অন্যের কাজে বাধা দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই আপনার। আপনি একজন তৃতীয় লোকের মতো নির্বাক হয়ে থাকুন। আমায় যদি আপনার বিশ্বাস হয়, এখনকার মতো আমার হাতে ভার দিন দেখি।"[৭]

অতুলবাবু মেয়েমানুষ বলে যখন কৃষ্ণার ওপর ঠিক ভরসা করতে পারছেন না তখন দৃঢ়কণ্ঠে সে বলেছে –

" মেয়েরাও মানুষ মেশোমশাই। তারাও যে শিক্ষা পেলে ছেলেদের মতোই কাজ করতে পারে, আমি শুধু সেইটাই দেখাতে চাই। চিরদিন মেয়েরা অন্ধকারে অনেক পিছনে পড়ে আছে, আমি তাদের জানাতে চাই, পিছিয়ে নয় – সামনে এগিয়ে চলার দিন এসেছে, মেয়েরা এগিয়ে চলুক, তাদের শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিক।"[৮]

কলঙ্কী চাঁদ গল্পে অপহৃতা কিশোরী প্রতিমাকে কৃষ্ণা বলেছে –

" ভয় পাচ্ছ কেন প্রতিমা ? আমার পরিচয় তো তুমি জান। সাহস আর শক্তি না থাকলে আমি এই তদন্তের ভার নিয়ে লাহোরে আসতুম না। তুমি শুনেছ তো, আমি কত বিপদে পড়েছি, বুদ্ধি করে পালিয়েও এসেছি ! আমার উপর নির্ভর কর – আমি যেমন করে পারি তোমায় ঠিক তোমার কাকার কাছে পৌঁছে দেব।"[৯]

কৃষ্ণাকে যেমন তার শুভাখাঙ্খীরা আশীর্বাদ করেছেন তেমনই তার প্রতিপক্ষ দুর্বৃত্তরাও তার সাহসের তারিফ না করে পারেনি। যেমন, ছেলে পাচারকারী খাঁজাহান বলেছিল –

" তোমার বাহাদুরি আছে বটে, সে জন্যে তোমায় প্রশংসা না করে পারিনে। পুরুষ যা করতে ভয় পায়, মেয়ে হয়ে তুমি তাই করতে এসেছ।"[১০]

দেবুকে ফিরে পেয়ে তার মা যখন কৃষ্ণাকে আশীর্বাদ করতে চেয়েছেন তখন কৃষ্ণা বলেছে

" আশীর্বাদ করুন, আমার যেন এই রকমই শক্তি ও সাহস থাকে, যেন প্রত্যেকের উপকারে লাগতে পারি, নিজের জন্ম যেন এমনি করে পরের কাজে সার্থক করতে পারি, আর বাঙালি মেয়ের ভীরুতার অপবাদ ঘুচাতে পারি।"[১১]

ব্যক্তিগত কারণেই কৃষ্ণা পা বাড়িয়েছিল রহস্য সন্ধানের পথে। সেখান থেকেই নির্ণীত হয়েছিল তার আগামী জীবনের গতিপথ। সেই পথে নিহিত ছিল নিজের শর্তে বাঁচতে চাওয়ার ইচ্ছা। যে ইচ্ছা ছিল তার স্রষ্টা প্রভাবতী দেবীরও। আজীবন স্বাধীনচেতা, চিরন্তনী শিক্ষিকা তাঁর ছাত্রীদের সামনে হাজির করতে চেয়েছিলেন আদর্শ নারীর ধারণা। সেদিনের নারী নয়, বরং নারী যা হয়ে উঠতে পারে, তাই। *গ্রহের ফের* গল্পে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের চিন্তায় আকুল অতুলবাবু মেয়েমানুষ বলে যখন কৃষ্ণার ওপর ঠিক ভরসা করতে পারছেন না তখন দৃঢ়কণ্ঠে সে বলেছে –

"মেয়েরাও মানুষ মেশোমশাই। তারাও যে শিক্ষা পেলে ছেলেদের মতোই কাজ করতে পারে, আমি শুধু সেইটাই দেখাতে চাই। চিরিদিন মেয়েরা অন্ধকারে অনেক পিছনে পড়ে আছে, আমি তাদের জানাতে চাই, পিছিয়ে নয় – সামনে এগিয়ে চলার দিন এসেছে, মেয়েরা এগিয়ে চলুক, তাদের শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিক।"[১২]

সম্পন্ন শিক্ষিত পরিবারে জন্ম হওয়ায় ছেলেবেলা থেকেই দেশি-বিদেশি বই পড়বার ঝোঁক ছিল প্রভাবতী দেবীর। ভালোবাসতেন লেখালেখি করতেও। ১৯৬২ সালের ১০ই জুলাই সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রভাবতী জানান, বিড়ম্বিত জীবনের ভার লাঘবের জন্য তাঁর মা তাঁকে 'বেশির ভাগ মেয়েদের লেখা বই' পড়ে শোনাতেন। আর বলতেন – ইচ্ছে করলে মেয়েরাও কত বড় হতে পারে ! নিজের দুঃখ নিয়ে ভেঙে পড়তে সকলেই পারে। কিন্তু দুঃখ জয় করে পরের জন্য কাঁদতে পারে ক'জন ! কৃষ্ণা-সিরিজের বিজ্ঞাপনে (*শুকতারা,* বৈশাখ ১৩৫৯) সদ্য-স্বাধীন দেশের মেয়েদের আত্মরক্ষায় স্বনির্ভর হওয়ার ডাক দিয়ে তিনি লেখেন –

"...কৃষ্ণা-সিরিজের প্রত্যেক বইখানিই স্বৈরাচারীদের অত্যাচার থেকে আমাদের মা-বোনেদের আত্মরক্ষা করবার নূতন প্রেরণা এনে দেবে। আজ স্বাধীন দেশের মা-বোনেরা যদি নিজেদের রক্ষার ভার নিজেরা না নিয়ে সেই মান্ধাতার আমলের মত পরমুখাপেক্ষী হয়েই থাকেন, তবে সে লজ্জা নারীসুলভ লজ্জার চেয়েও বেশী লজ্জার হয়ে পড়বে।"[১৩]

প্রসঙ্গত, প্রাবন্ধিক সুদক্ষিণা ঘোষ তাঁর *মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা* নামক বইতে আমাদের মনে করিয়ে দেন –

"১৩৩১ বঙ্গাব্দে 'আমার কথা' নামে আরেকটি উপন্যাস লিখেছিলেন প্রভাবতী, সেখানে দেখি যে বালবিধবাটির মনে স্বামীকে চোখে দেখার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত নেই, তার পুনর্বিবাহের জন্য তার দাদার চেষ্টাকে নিন্দা করা হয়েছে উপন্যাস জুড়ে, বালিকাটি পুনর্বিবাহে নারাজ হওয়ায় তার সতীত্বের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছে উপাখ্যান আর শেষ পর্যন্ত 'ধর্ম' রক্ষা করতে আত্মহননের পথে জীবন বিসর্জন দিয়েছে সে, জীবনের চেয়ে তার কাছে অনেক বড়ো তার সতীত্বের সংস্কার, সেই তার 'ধর্ম'। প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল এ উপন্যাসের নায়িকা শান্তির, সেই বৃদ্ধের সঙ্গে দাম্পত্য-সম্পর্কে যথোচিত

ভালোবাসা এবং সতীত্বের প্রকাশ না দেখে ক্ষুব্ধ এবং মর্মাহত হয়ে উঠেছে নায়ক, সে-ও তো এই পিতৃতন্ত্রেরই যোগ্য প্রতিনিধি !

অথচ, প্রভাবতীর এ উপন্যাসের তেরো বছর আগেই 'বালবিধবা ও ব্রহ্মচর্য' শিরোনামে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১৩১৮) প্রবন্ধ লিখেছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী, প্রশ্ন তুলেছেন, বালবিধবাকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেবার উপযুক্ত শিক্ষক কোথায় এ সমাজে ? মেয়েদের জন্য দাবি করেছেন 'মানুষের অধিকার' – 'পরিণত বয়সে' স্ব-ইচ্ছায় পরিণীত হবার এবং পুনর্বিবাহ বিষয়ে স্বাধীনতার অধিকার। যখন মেয়েদের মনে ধরা দিতে শুরু করেছে এমন ভাবনা, মেয়েদেরই কলমে শুরু হয়ে গেছে এ আলোচনা, তখনও প্রভাবতী দেবী কিন্তু পুরোনো প্রথাকে, পুরোনো সংস্কারকেই প্রশ্নহীনভাবে আঁকড়ে ধরেছেন তাঁর সমস্ত উপন্যাসে।"[১৪]

বৈধব্যের সাধনার এমন অমিত জয়গান ছড়িয়ে আছে প্রভাবতীর সব উপন্যাসেই। *জাগৃহি* উপন্যাসে সতীদাহ প্রথার জয়ধ্বনিও শুনতে পাই এক প্রগতিশীলা রমণীর কণ্ঠেই –

"এরই জন্য মুনি ঋষিরা তপস্যা করে গেছেন, একটা জন্মে সাধনার ধন না পেয়েও পরজন্মে পেয়েছেন এমন প্রমাণও আমরা পাই। এ দেশের মেয়েরা স্বামীর চিতায় জীবন বিসর্জন দিয়েছে – সে-ও তো ঠিক এরই জন্যে – পরজন্মে সে সেই স্বামীরই অনুবর্তিনী হয়ে তাঁর সহধর্মিণী হবে এই আকাঙ্ক্ষায়।"[১৫]

অভিভূত নায়িকা ইন্দ্রাও এ কথা শুনে ভেবেছে বাংলার ঘরে ঘরে 'কামনাশূন্য' ব্রহ্মচারিণী বিধবার কথা, বুঝতে পেরেছে –

"বিধবা ব্রহ্মচারিণী মনের মাঝে কী আশা রাখে ? তাহার দৃষ্টি তো ইহলোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পরলোকের পানে দৃষ্টি রাখিয়া কোনক্রমে জীবনের কয়টা দিন সে কাটাইয়া দেয়।

সত্য ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই আছে, যুগ যুগ ধরিয়া আজ পর্যন্ত মিথ্যা টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। মিথ্যা দু'দিনের, সত্য চিরদিনের।"[১৬]

এই যুক্তিতে সহজেই বৈধব্যের সংস্কারকে, প্রচলিত সামাজিক বিধিনিষেধকে 'চিরদিনের সত্য' বলে মেনে নিতে বাধে না ইন্দ্রার। ঠিক যেমন সপত্নী-প্রথার গুণগান শোনা যায় প্রভাবতী দেবীর *খেয়ার শেষে* উপন্যাসে।

আমাদের মনে পড়বে, এই প্রভাবতী দেবীরই সৃষ্ট কিশোরী গোয়েন্দা কৃষ্ণা নিজেই বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় সত্য অনুসন্ধানের পথে পা বাড়িয়েছে। নিজের জীবনকে তৈরি করে নিতে চেয়েছে নিজেরই শর্তে। একই মানুষের কলমে দু'ধরনের উপন্যাসের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির এই স্ববিরোধ গবেষকদের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করতে পারে নিশ্চয়ই। কিন্তু বর্তমান সন্দর্ভে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। প্রাসঙ্গিকতাটুকু উল্লেখ করা রইল মাত্র।

প্রভাবতী দেবীর লেখা কৃষ্ণা-কাহিনিগুলি হল –

গুপ্ত ঘাতক, হত্যার প্রতিশোধ, গ্রহের ফের, কলঙ্কী চাঁদ, কারাগারে কৃষ্ণা, মায়াবী ও কৃষ্ণা, কৃষ্ণার অভিযান, কৃষ্ণার পরিচয়, বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা, মুক্তি-পথে কৃষ্ণা, কৃষ্ণার জয়যাত্রা।

কৃষ্ণা – সিরিজের আগে অগ্নিশিখা রায় নামের আরেকটি মেয়ে গোয়েন্দাকে নিয়ে *কুমারিকা সিরিজ* প্রকাশ করেছিলেন প্রভাবতী দেবী। লেখক জানিয়েছিলেন, শুধু ছেলেদের ছাড়া মেয়েদের 'অ্যাডভেঞ্চারে'র বই এ পর্যন্ত কেউ লেখেননি। এই কারণেই *কুমারিকা সিরিজ* - এর আবির্ভাব। কোন আকস্মিক বিপদ এলে কলেজের মেয়েদের যা করা প্রয়োজন, *কুমারিকা সিরিজ* পড়লেই তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় শিখা চরিত্র সৃষ্টির পিছনে প্রভাবতীর উদ্দেশ্য কী ছিল। বিদ্যা – বুদ্ধি – শক্তিমত্তায় শিখাও প্রায় কৃষ্ণারই সমান। কিন্তু *কুমারিকা সিরিজ* - এর

কাহিনিগুলি যে রহস্যের চেয়ে রোমাঞ্চের দিকে বেশি হেলে আছে, এ কথা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। শিখা – কাহিনিকে ঠিক গোয়েন্দা গল্প বলা চলে না, বরং এই কাহিনিগুলির ক্ষেত্রে রোমাঞ্চকর অভিযান শব্দটা বেশি ভালভাবে প্রযোজ্য হবে। সম্ভবত সেইজন্যেই অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* বইটিতে শুধুমাত্র কৃষ্ণার প্রসঙ্গই উল্লেখ করেছেন।

আমরাও তাই বর্তমান আলোচনায় *কুমারিকা সিরিজ* নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। শুধুমাত্র শিখা – কাহিনিগুলির উল্লেখ এখানে রইল –

গোয়েন্দা শিখা, অগ্নিশিখা, শিখার সাধনা, বিজয়িনী শিখা, শিখা ও সবিতা, রহস্যময়ী শিখা, দুর্গম পথে শিখা, শিখার আবিষ্কার, শিখার কালরাত্রি, শিখার ছদ্মবেশ, শিখার অগ্নিপরীক্ষা, শিখা ও রাজকন্যা।

❖

এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বে এনিড ব্লাইটনের ‘ফেমাস ফাইভ’ প্রসঙ্গে আলোচনার সময়ে আমাদের বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দা গন্ডালুর কথা এসেছিল। বিশ শতকের ষাটের দশকে *সন্দেশ* পত্রিকার পাতায় নলিনী দাশের (৫ই আগস্ট,১৯১৬ – ২৬শে মার্চ ১৯৯৩) হাত ধরে আবির্ভাব ঘটে এই মেয়ে-গোয়েন্দার দল ‘গোয়েন্দা গন্ডালু’র। চার কিশোরী স্কুল পড়ুয়া কালু-মালু-বুলু-টুলু। রহস্য দেখলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। চারটি মেয়েকে নিয়ে গন্ডালু গোয়েন্দা দলের সৃষ্টি। এই গন্ডালুদের মূলত দু’ধরনের রহস্য সমাধান করতে দেখা যায়। গুপ্তধন খুঁজে বের করা এবং নিরুদ্দিষ্ট কাউকে খুঁজে বের করা।

কালু (কাকলি চক্রবর্তী), বুলু (বুলবুলি সেন), মালু (মালবিকা মজুমদার) এবং টুলু (টুলু বোস) এই চার বন্ধু পশিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের সীমান্তের কাছাকাছি এক কাল্পনিক শহরের একটি বোর্ডিং স্কুলে পড়ে আর সেখানকার হোস্টেলে একই ঘরে থাকে। গোয়েন্দা গন্ডালু সমগ্র (প্রথম খন্ড) - এর ভূমিকায় বইটির প্রকাশক ও নলিনীর পুত্র অমিতানন্দ দাশ লিখছেন –

"লেখিকার বাবা অরুণনাথ চক্রবর্তী লেখিকার ছেলেবেলায় (বিশেষত ১৯২০-এর দশকে) সরকারী কাজ করতেন হাজারিবাগ, ধানবাদ, গয়া ইত্যাদি ছোট ছোট টাউনে। হাজারিবাগ অঞ্চলটি লেখিকার বিশেষ প্রিয় ছিল। গন্ডালুদের স্কুলের আশেপাশের কাঞ্চনপুর-ঝাউতলা-দেওদারগঞ্জ অঞ্চলের বর্ণনায় ও তাদের বেড়াবার গল্পে লেখিকার ছেলেবেলায় হাজারিবাগ অঞ্চলে বেড়াবার আনন্দের অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে।

নলিনী ও কল্যাণী দুই বোনের সঙ্গেই মানুষ হয়েছিলেন অরুণনাথের দুই ভাইঝি ও এক ভাইপো। তখন ওই অঞ্চলে মেয়েদের স্কুল প্রায় ছিলই না – তাই চার বোনই বাড়িতে পুণ্যলতার কাছে পড়াশোনা করেছিলেন প্রায় বছর চোদ্দ বয়স অবধি। চার বোনের একসঙ্গে বাড়িতে থেকে মানুষ হবার অভিজ্ঞতার আনন্দের স্মৃতির ছাপ পড়েছে গন্ডালুদের গল্পে। আর স্কুলের উঁচু ক্লাস থেকে শুরু করে কলেজ জীবনে লেখিকা কলকাতায় হস্টেলে থেকে পড়েছেন, তাই মেয়েদের হস্টেলের বর্ণনা কিছুটা এসেছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। সত্যজিতের সন্দেশের তৃতীয় বছরে, ১৯৬৩ সালে, "সন্দেশ" দপ্তর চলে আসে আমাদের রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে, আর তখন থেকেই আমার মা (লেখিকা) সন্দেশের সম্পাদনায় দৈনন্দিন কাজের ভার নেন। তারপর থেকে নিয়মিত গন্ডালু রহস্য লিখতে শুরু করেন তিনি।

ছোটবেলায় আমার মা ও মাসী বৃটেনের কিছু ছোটদের পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন, সেই পত্রিকার গল্পে চোরা-কুঠুরি, গুপ্ত-সুড়ঙ্গ, সংকেতিক ভাষা-সহ খুদে গোয়েন্দাদের গল্প থাকত – সেগুলির প্রভাব পড়েছে গন্ডালুর গল্পে। তাছাড়া "সন্দেশ" যখন শুরু হচ্ছে তখন আমি গোগ্রাসে বহু এনিড ব্লাইডনের উপন্যাস গিলছি। ছোটদের জন্য গল্প লেখার উদ্দেশ্যে আমার মাও দেখাদেখি এনিড ব্লাইটনের কয়েকটা "ফাইভ", "সেভেন" ইত্যাদি রহস্য উপন্যাস পড়ে ফেলেন।"[১৭]

এদের মধ্যে কাকলি এই দলের প্রধান এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমতী। তারা যেখানেই বেড়াতে যায় একটা করে রহস্য সামনে উপস্থিত হয় আর তার সমাধানে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই গন্ডালুরা। ছেলেধরা, ডাকাত, চোরাকারবারী আর অপরাধীদের বুদ্ধির জোরে পরাস্ত করে তারা। তাদের গোয়েন্দাগিরি দেখে বন্ধুরা তাদের নাম দেয় গোয়েন্দা গন্ডালু। *তিব্বতী গুহার ভূত* গল্পে টুলু আত্মপরিচয়ের ঢং-এ লেখে –

"আমাদের গন্ডালু-দলকে, মানে কালু, মালু, বুলু আর (টুলু) আমাকে অনেকেই চেনে। আমরা রোমাঞ্চ আর রহস্য ভালবাসি বলে রোমাঞ্চকর ঘটনাও যেন আমাদের ভালবাসে। ছোটবেলা থেকে একই হোস্টেলে থেকে আমাদের খুব ভাব হয়ে গেছে আর চারজনে কয়েকটা রহস্যের সমাধান করেছি বলে বন্ধুরা আমাদের নাম দিয়েছে 'গোয়েন্দা গন্ডালু'। যেখানেই যাই অ্যাডভেঞ্চার আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।"[১৮]

টুলু এই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলির কথক। *রাণী রূপমতীর রহস্য* গল্পে টুলু লিখছে –

"আমাদের প্রত্যেকের বাবা-মা আমাদের সকলকেই খুব ভালবাসেন। আমরা প্রত্যেকে বাকি তিনজনের বাবা মাকে মাসিমা মেসোমশাই বলি – তাই নিয়ে অনেক সময়ে বেশ মজার ভুল বোঝাবুঝি হয়।

আমাদের কারোরই নিজের দাদা-দিদি বা ভাই বোন নেই। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মামা-কাকি-মাসি-পিসি আর সমস্ত আত্মীয় স্বজনরা আমাদের সকলকেই খুব ভালবাসেন। আমরা বেড়াতে খুব ভালবাসি বলে যিনিই কোনো ভাল জায়গায় থাকেন অথবা যান তিনিই আমাদের চার বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেন। আমরা প্রায় প্রত্যেক ছুটির কিছুটা অংশ এই ভাবে নানা দেশে বেড়িয়ে কাটাই। একটা বড় আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমরা যেমন রহস্য আর এডভেঞ্চার ভালবাসি। তেমনি রোমাঞ্চকর ঘটনা যেন আমাদের পিছু পিছু তাড়া করে বেড়ায়। যখনই যেখানে যাই, কোনো না কোনো রহস্যের সন্ধান পাই এবং তার সমাধান না করে ছাড়ি না। এর জন্যে আমরা অনেকবার দারুন বিপদে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। যদিও সব কথা আমাদের বাবা-মাকে খুলে বলিনি, তবু তাঁরা যেটুকু জেনে ফেলেছেন, তাতেই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে বেশি বাড়াবাড়ি করলে, বা তাঁদের কথা না শুনলে আর কোনোদিন আমাদের 'চারজনকে একলা' বেরোতে দেবেন না। তাই আমরা স্থির করেছি যে এই ছুটিতে আর কোনো এডভেঞ্চার করা হবে না। লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকব আর বাবা-মার সব কথা মেনে চলব।"[১৯]

কিন্তু, তারা 'এডভেঞ্চার' করতে না চাইলেও, রহস্যের মধ্যে তো তাদের জড়িয়ে পড়তেই হবে। টুলুর মতে, কালুর মত ডানপিটে সাহসী মেয়ে বাঙালির ঘরে আজ পর্যন্ত জন্মেছে কি না সন্দেহ আছে। সে মুখে যতই কাঠখোট্টা হোক না কেন, মনটা তার বড় নরম। প্রতিটি রোমাঞ্চকর অভিযানের খুঁটিনাটি তার ডায়রিতে নোট করা থাকে। তার কাজে কোনও ত্রুটি থাকবার জো নেই।

মালু খুব বেশি রহস্য উপন্যাস পড়ে আর নিজে বাস করে কল্পনার রাজ্যে। কালুর সঙ্গে তার স্বভাবের একেবারেই মিল নেই। কিন্তু তাদের দুজনের মধ্যেই ভাব বেশি। কালু কাঠখোট্টা, ডানপিটে, অসমসাহসী। কোনো কল্পনা কবিত্বের সে ধার ধারে না। তার ভাল লাগে অঙ্ক, বিজ্ঞান, ড্রিল আর দৌড়ঝাঁপ। মালু এর একদম উল্টো। সে ভালবাসে কাব্য – বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত। ড্রিলের নামে তার গায়ে জ্বর আসে, আর অঙ্ক ক্লাসে চোখে আসে জল। সে লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লেখে। রোমাঞ্চকর কাহিনি পড়ে। আর আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজেকে গল্পের নায়িকা বলে কল্পনা করে। অথচ এই কালু-মালুই হল হরিহর আত্মা।

বুলু এই চারজনের মধ্যে সবচেয়ে ভীতু। প্রত্যেকবারই সে বাকিদের সাথে ঝামেলা পাকায় এবং তাদের বলে অযথা জটিলতায় না জড়াতে। কিন্তু কেউই তার কথা শোনে না, তাই অগত্যা তাকেই শেষ পর্যন্ত বাকি তিনজনের সঙ্গে বিপদের মুখে যেতে হয়। বুলু আর এই গল্পগুলির কথক টুলু ছোটবেলা থেকেই এই বোর্ডিং-এর আবাসিক। কালু প্রথমদিকে নিকটবর্তী শহর থেকে বাসে করে স্কুলে আসত। তার বাবা-মা বিদেশে চলে গেলে সে পাকাপাকিভাবে হস্টেলে চলে আসে। তারপর ক্লাস সেভেনে তাদের সাথে যোগ দেয় মালবিকা মজুমদার অর্থাৎ মালু।

মালু মনে করে, চোখ – কান ইত্যাদি ছাড়াও কালুর একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। গুন্ডাদের ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকতে সে মোটেও রাজি নয়। কোনো ব্যাপারে খটকা লাগলে সে তার শেষপর্যন্ত অনুসন্ধান চালিয়ে যাবে। ভৌতিক ব্যাপার স্যাপারে কালু মোটেই বিশ্বাস করে না। মালুর আবার অলৌকিক বিষয়-আশয়ে অগাধ বিশ্বাস। এই নিয়ে তাদের মধ্যে তর্কও হয়। *হাতীঘিসার হানাবাড়ি* গল্পে কালু বলে –

"ভুতুড়ে ব্যাপার বিশ্বাসও করব না, ঠাট্টাও করব। আর তোদের মাথা থেকে ভূত ঝাড়াবার জন্যই অন্ততঃ আসল কারণটা খুঁজে বার করতে হবে।"[২০]

গন্ডালুরা যখনই অভিযানে বেরয়, তাদের ঝোলায় প্রচুর খাবার দাবার আর জল থাকে। ঘোরাঘুরি করতে করতে যখনই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বা কোনো বিপদে পড়ে, অথবা কোন কারণে দিশাহারা হয়ে পড়লে তারা কিছুটা সময় বিশ্রাম করে, এবং সেই সব খাবার দাবার খায়। এরপর কিছুক্ষণ আজে-বাজে ঠাট্টা তামাশা করার পর তারা আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মাথাটা তখন খোলে ভাল।

কালুর মতে সবসময় সবরকম অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, তাই তারা যেখানেই যায় সাথে ঝোলায় ভরে নিয়ে যায় দড়ি-লাঠি-ছুরি-কম্পাস-হুইসল্-ম্যাপ-টর্চ-কাগজ-পেন্সিল-ওষুধপত্র। প্রয়োজন পড়লে তারা ছদ্মবেশও ধরে। শুধু তাই নয়, তারা মর্স কোডও জানে এবং নিজেদের মধ্যে তার মাধ্যমে সংকেত পাঠায়। *টাওয়ার হিলের রহস্য* গল্পে কালুর ডায়রির পাতা থেকে মর্স কোড উদ্ধার করে বাকি তিনজন কালুকে খুঁজে বের করেছিল। সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য তারা একধরণের সাংকেতিক বাক্য বলে যার প্রথম অক্ষরগুলি জুড়লেই বোঝা যায় তাদের বক্তব্য। ছদ্মবেশ ধারণেও গন্ডালুরা কম যায় না। *কলকাতায় গন্ডালু* গল্পে এক শিশু-পাচারকারীর সাথে গন্ডালুদের লড়াই হবে। কালু মনে করে –

"যতরকম অপরাধ আছে, আমার মনে হয় ছোট ছেলেমেয়ে চুরি করাটা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। এর কোন ক্ষমা নেই।"[২১]

গন্ডালু-কাহিনি প্রকাশক্রম অনুসারে –

গোয়েন্দা গন্ডালু (শ্রাবণ, ১৩৬৮), নিখিল বঙ্গ কবিতা সংঘ (চৈত্র, ১৩৭০), জমিদারবাড়ির রহস্য (শারদীয়া, ১৩৭১), গুন্ডা ও গন্ডালু (শারদীয়া, ১৩৭২), সোনার খনির সন্ধানে (শারদীয়া, ১৩৭৩), টাওয়ার হিলের রহস্য (শারদীয়া, ১৩৭৪), গন্ডালু ও তিব্বতী গুহার ভূত (শারদীয়া, ১৩৭৫), নন্দনকাননের রহস্য (শারদীয়া, ১৩৭৬), অভিশপ্ত রাজবাড়ি

(শারদীয়া, ১৩৭৭), তপোবন রহস্য (শারদীয়া, ১৩৭৮), হাতীঘিসার হানাবাড়ি (শারদীয়া, ১৩৭৯), খোয়াই রহস্য (শারদীয়া, ১৩৮০), রঙ্গনগড়ের রহস্য (১৩৮২-৮৩) গন্ডালু ও রাণী রূপমতী রহস্য (শারদীয়া, ১৩৮৪), গন্ডালু আর অলৌকিক বুদ্ধমূর্তি রহস্য (শারদীয়া, ১৩৮৫), গন্ডালু ও হিড়িম্বাদেবী রহস্য (শারদীয়া, ১৩৮৬), ঝাউতলার ভূত (শারদীয়া, ১৩৮৭), কলকাতায় গন্ডালু (শারদীয়া, ১৩৮৮), নন্দিনী নিরুদ্দেশ (শারদীয়া, ১৩৮৯), মাউন্ট আবুর রহস্য (শারদীয়া, ১৩৯০), নীলাঞ্জনার দুর্ভোগ (শারদীয়া, ১৩৯০), ডন পেরেরার দ্বীপ (শারদীয়া, ১৩৯২), রঙ্গনপাহাড়ের রহস্য (শারদীয়া, ১৩৯৩), দেওদারগঞ্জের ভূত (শারদীয়া, ১৩৯৪), গুপ্তাসাহেবের গুপ্তধন (শারদীয়া, ১৩৯৫), সিমলার মামলা (শারদীয়া, ১৩৯৬), সামলে চলো গন্ডালু (শারদীয়া, ১৩৯৭), কাঞ্চনপুরের রাজবাড়ি (শারদীয়া, ১৩৯৮), শিখর রহস্য (শারদীয়া, ১৩৯৯)।

সন্দেশ পত্রিকার পাঠকদের জন্যই গোয়েন্দা গন্ডালু লিখেছিলেন নলিনী, তাঁর উদ্দীষ্ট পাঠকদের বয়স শৈশব থেকে কৈশোরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখায় বন্ধুত্ব, পারস্পরিক আস্থা ও সহমর্মিতা, দলবদ্ধভাবে কাজ করার মানসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধির ব্যবহার, অসীম সাহস আর অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার মানসিকতা – এইসব বিষয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গোয়েন্দা গন্ডালুর কার্যকলাপ আসলে নলিনীর খুদে পাঠকদের সামনে সাজিয়ে রাখতে চাওয়া এমন একটি সম্ভার, যা হয়তো তাদের নীরস একঘেয়ে পাঠক্লান্ত জীবনে কিছুটা উদ্দীপনার, কিছুটা আনন্দের সঞ্চার করতে পারে। ডানপিটে সাহসী আর কবিতাপ্রেমী কল্পনাবিলাসী দুজন বিপরীতমুখী মানুষের মধ্যেও যে গভীর বন্ধুত্ব হতে পারে, তার হদিশও তারা পাবে এসব গল্পে।

******

আশাপূর্ণা দেবীর (৮ই জানুয়ারি ১৯০৯ – ১২ই জুলাই ১৯৯৫) *মেয়ে গোয়েন্দার বাহাদুরি* গল্পের মেয়ে-গোয়েন্দাও এক কিশোরীই। গ্রামের মেয়ে কাজল মন্ডল। ইস্কুলে আট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে সে। কলকাতা শহরে এক ডাক্তারবাবুর বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধা মাকে দেখাশোনা করা এবং তাকে নানান ডিটেকটিভ গল্প শোনাতে শোনাতে সেই 'কাজের মেয়ে' কাজলই তাঁর বুদ্ধি আর সাহসের জোরে সমাধান করে ফেলে পড়শি বাড়ির এক খুনের রহস্য। পুলিশের কাছ থেকে পুরস্কারও পায়। যদিও লেখিকা তাঁর এই মেয়ে-গোয়েন্দাটিকে নিয়ে আর কোন কাহিনি লেখেননি।

******

অজিতকৃষ্ণ বসু (৩রা জুলাই, ১৯১২ – ৭ই মে, ১৯৯৩) অ কৃ ব নামেই সর্বত্র পরিচিত। তিনি মূলত ব্যঙ্গ ও কৌতুক রস সাহিত্যিক হলেও জাদুবিদ্যা ও সঙ্গীতে তার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। শৈশব থেকেই তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম নেওয়া শুরু করেন। স্কুলজীবন থেকে বন্ধু পি সি সরকার (সিনিয়ার) এর সমান্তরালে জাদুচর্চাও চলতে থাকে। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তিনি মূলত অনুবাদ এবং মজাদার রম্যরচনা ইত্যাদির জন্যেই আলোচিত। তাঁর ডিটেকটিভ কাহিনিও আছে, তবে অ কৃ ব দুয়েকটির বেশি সেই ধরণের লেখা লেখেননি। তাঁর ডিটেকটিভ নন্দিনী সোমকে নিয়ে লেখা উপন্যাস নন্দিনী সোম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬-তে। নন্দিনী বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে। মেয়ের যেমন আশ্চর্য সুন্দর চেহারা, তেমনি গায়ের আর মনের জোর, তেমনি ধারালো বুদ্ধি আর জোরালো স্মৃতিশক্তি। সায়েন্স কলেজ থেকে অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজি নিয়ে এম.এস.সি পরীক্ষায় প্রথম। অসামান্য বিদুষী এই মেয়ে-গোয়েন্দা কল্পনাশক্তি আর বাস্তববুদ্ধির জোরে অনায়াসেই টক্কর দিতে পারে যে-কোনো পুরুষ গোয়েন্দার সাথে।

❖

এই সূত্রেই এসে পড়বে বাংলা সাহিত্যের আর এক বিদুষী মেয়ে-গোয়েন্দা গার্গীর কথা। তপন বন্দোপাধ্যায়ের (জন্ম ৭ই জুন, ১৯৪৭) গোয়েন্দা চরিত্র এই গার্গী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের মেধাবী ছাত্রী ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় গার্গী তার জীবনের প্রথম যে জটিল রহস্যটির সমাধান করেছিল, সেই কাহিনিই *বহে বিষ বাতাস* নামের উপন্যাসে ধরা আছে। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় এক সাপ্তাহিক পত্রিকায়, জানুয়ারি, ১৯৯৬ – এ। তখন অবশ্য লেখক বীথিন মুখোপাধ্যায় ছদ্মনামে সেটি লিখেছিলেন।

বহে বিষ বাতাস তপনবাবুর লেখা প্রথম গার্গী-কাহিনি হলেও প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু *ঈর্ষার সবুজ চোখ* উপন্যাসটি; জানুয়ারি, ১৯৯৫ – তে। গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র প্রথম খন্ডের প্রচ্ছদে *ঈর্ষার সবুজ চোখ* সম্পর্কে জানা যায়, এই উপন্যাসটি যখন রবিবাসরীয়তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, সে সময় চলচ্চিত্র পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ লেখককে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, যে তিনি এই লেখাটি নিয়ে দূরদর্শনে সিরিয়াল করতে চান। অমিতাভ বচ্চন কর্পোরেশন লিমিটেডের প্রথম বাংলা সিরিয়াল 'ঈর্ষা' দূরদর্শনে প্রচারিত হয়েছিল। পরিবেশনার দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত বাঙালি চিত্রতারকা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

এই *ঈর্ষার সবুজ চোখ* খুবই চমৎকার একটি কাহিনি। সে প্রসঙ্গে পরে আসব। আপাতত গার্গীর পড়ুয়া জীবন সম্পর্কে কিছু কথা বলা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ গণিতের ছাত্রী ছিল গার্গী। তার স্মৃতিশক্তিও তুখোড়। একবার এক ডিবেট প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সাড়া ফেলে দিয়েছিল সে। তার চমৎকার বক্তৃতা শুনে ইউনিয়নের ছেলেরা পর্যন্ত তাকে নির্বাচনে দাঁড়াতে জোর জবরদস্তি শুরু করেছিল। যদিও গার্গী কায়দা করে তা এড়িয়ে যায়।

গার্গীর প্রিয় বিষয় ছিল দেশ, কাল, সময়। বিজ্ঞানের ছাত্রী হলেও সে পড়তে ভালবাসে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান। গার্গীর ইচ্ছা ছিল গণিতে শিক্ষকতা করার। কিন্তু পরে সে তার মত পাল্টে ফেলে শুরু করে ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিকতা। যখন গার্গীর বন্ধুরা নানান জায়গায় চাকরির আবেদন করছে, গার্গী তখন কলকাতার বিভিন্ন এলাকায়, অলিতে-গলিতে, বস্তিতে, রাজপথে ঘুরে ঘুরে বিচিত্র সব পরিবেশ, ঘটনা, চরিত্র খুঁজে খুঁজে কোন অদ্ভূত, অভাবনীয়, অভিনব খবর নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে বিভিন্ন সংবাদপত্রের অফিসে। বোঝাই যায়, প্রথম থেকেই সচেতনভাবে গার্গীকে বেশ অন্যরকম, আর পাঁচজনের থেকে আলাদা করেই আঁকতে চেয়েছেন লেখক। *বহে বিষ বাতাস* উপন্যাসে গার্গী সম্পর্কে তিনি লিখছেন –

"গণিতের ছাত্রী হয়েও গার্গীর কৌতূহলের বৃত্তটি পরিসরে বড্ডই বড়। সে তার নিজস্ব বিষয়ের বাইরে হুটহাট বেরিয়ে পড়ে আরও বহুবিধ তথ্য, তত্ত্ব ও তর্কের তালাশে। কখনও সাহিত্য, কখনও রাজনীতি, কখনও অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কখনও দর্শনের তত্ত্বতালাশও তার অন্যতম হবি। কখনও কলকাতার পথে পথে সন্ধানী চোখ নিয়ে টুকটাক ঘোরাফেরা করাও তার আর এক প্রিয় বিলাস। ঠিক বোহেমিয়ান তাকে বলা যাবে না। কেন না আসলে এতসব অ্যাডভেঞ্চারের ভেতর ঢুঁ দিতে দিতে তার কালি, কলম ও মন জন্ম দেয় এক একটি ফিচারের। ইতিমধ্যে তার কিছু কিছু ফিচার প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার দু-তিনটি জনপ্রিয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়।

... গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ার দিকে তার বরাবরের ঝোঁক। আগাথা ক্রিস্টি কিংবা আর্থার কোনান ডয়েলের কোনও বই তার হাতে পড়লেই সে গোগ্রাসে পড়ে ফেলে, শুধু পড়েই তা নয়, পড়ার পর খুনের মোটিভ, খুনির চালচলন, গোয়েন্দাপ্রবরের তদন্তের ধারা সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবে, আর মনে মনে এও চিন্তা করে, সে গোয়েন্দা হলে এই হত্যারহস্যটির কিনারা করতে পারত কি না।"[২২]

ফিরে আসা যাক *ঈর্ষার সবুজ চোখ* প্রসঙ্গে। এই উপন্যাসটিতেই ঘটে যায় গার্গীর জীবন বদলে দেওয়ার মতো ঘটনা। সফল বাঙালি ব্যবসায়ী সায়ন চৌধুরীর সাথে গার্গীর সূত্রেই বিয়ে হয় ঐন্দ্রিলার, যে সম্পর্কে গার্গীর মাসতুতো বোন। পাত্র হিসেবে সায়ন খুবই উপযুক্ত। সৎ, চরিত্রবান ও সুপুরুষ। ঐন্দ্রিলার সাথে তার সুখী দাম্পত্য। কিন্তু, অকস্মাৎ বদলে যায় সবকিছু। খুন হয়ে যায় ঐন্দ্রিলা, সায়ন গ্রেপ্তার হয় সেই খুনের দায়ে। আসরে

নামে গার্গী। নিজের অসাধারণ বিচক্ষণতা দিয়ে বিচার করে সে বুঝতে পারে, সায়ন অপরাধী নয়, অন্য কেউ ষড়যন্ত্র করে সায়নকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।

আগেই বলেছিলাম, গার্গীকে আর পাঁচজনের থেকে একটু আলাদা করেই দেখাতে চেয়েছেন লেখক। নিজের বোনের হত্যায় অভিযুক্ত সায়নকে সে অবিশ্বাস করেনি, ঘৃণা করেনি। বরং সহমর্মী হয়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছে, নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ঐন্দ্রিলা খুনের রহস্য ভেদ করে এক সাংঘাতিক বিপদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছে। এই কাজ করতে গিয়ে তাকে সমাজ, পরিবার আত্মীয়স্বজন সবার কাছে থেকে সহ্য করতে হয়েছে অনেক অপমান, কুৎসা, বাঁকা কথা। কিন্তু কোনকিছুই তাকে সত্য অন্বেষণের পথ থেকে সরাতে পারেনি। ঐন্দ্রিলা খুনের তদন্তকারী অফিসার দেবাদ্রি সান্যালের সামনে গার্গী বলে ফেলেছে তার মনের কথা –

"যে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসকে শুধু নিজের মেধা, পরিশ্রম ও একাগ্রতার ফলে তুলে এনেছিল সাফল্যের চূড়ায়, তাতে এত বড় একটা আঘাত এসে পড়ায় সায়ন তখন চূড়ান্ত বিপর্যস্ত। সংবাদপত্র আর পুলিশ-রিপোর্টের কল্যাণে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছিল দুর্নামের আড়ালে। একই সঙ্গে তার নিজের, তার পরিবারের, তার প্রতিষ্ঠানের সুনাম ধুলোয় মিশে যেতে থাকায় সে চূর্ণ ছিন্নভিন্ন, বিধ্বস্ত। নিঃশেষিত সায়নের পাশে সেই মুহূর্তে আমি প্রচন্ড ঝুঁকি নিয়ে না দাঁড়ালে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না, তার প্যারাডাইস প্রোডাক্টসকে তো নয়ই।

পুলিশ তখন সন্দেহ করে চলেছে একমাত্র সায়ন চৌধুরীকেই, তারপর বিয়েটা হয়ে যেতে আমাকেও। ঠিক তখনই আমি ঠিক করেছিলাম, পুলিশের এই ভ্রান্ত ধারণা ভাঙতে হলে তদন্ত করতে হবে তাদের সন্দেহভাজন এই আমাকেই। অন্তত নিজেদের বাঁচার স্বার্থে। মিঃ সান্যাল আমি কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভ নই, শখের গোয়েন্দা নই, কিন্তু কোন বিষয়ের গভীরে ঢুকে তাকে তন্নতন্ন বিশ্লেষণ করা আমার বরাবরের স্বভাব। এক্ষেত্রেও সেভাবে এগিয়ে গিয়েছি। ঘটনার উৎস খুঁজতে। প্রতি চরিত্র, প্রতিটি ঘটনার চুলচেরা আলোচনা করে বুঝতে চেয়েছি কীভাবে হয়ে গেল এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি।"[২৩]

পরবর্তীকালে এই সায়নকেই বিয়ে করে সংসারে থিতু হয়েছে গার্গী, সায়নও গার্গীর প্রতিভাকে চিনতে ভুল করেনি। তার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব দিয়েছে

গার্গীকে। ঘটনাচক্রে বিখ্যাত কোম্পানীর এমডি হয়ে যাওয়া এহেন গার্গী স্বভাবতই রহস্যের গন্ধ পেলে তার সমাধান করতে না পারা পর্যন্ত স্বস্তি পায় না। সংসার-সন্তান এবং কর্মক্ষেত্র সামলেও সে অদ্ভুত দক্ষতায় সমাধান করে নানান রহস্যময় ঘটনা। তার এই সহানুভূতিশীল ও সহমর্মী মনোভাবের জন্য সে যেমন তার কর্মচারীদের কাছে প্রিয়, তেমনি বহু ক্ষেত্রে আপদে-বিপদে তারা গার্গীর শরণাগত। মানুষ হিসেবে গার্গী খুবই সাধারণ। অফিসের সবাই গরমে কষ্ট পাবে ভেবে নিজের চেম্বারেও এয়ার কন্ডিশনার লাগাতে রাজি হয়নি সে। গার্গীর ছোটবেলা মোটেই নিশ্চিন্ত আরামের ছিল না। অনেক কম বয়সেই তার বাবা মারা যায়, মা শিক্ষকতার চাকরি করে সংসার চালিয়েছেন, গার্গী আর তার দাদা সুশোভনকে বড় করেছেন। মা মারা যাওয়ার পর দাদা-বৌদির সংসারেই থাকত সে। সম্ভবত সেই কারণেই অল্পেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে সে। সবসময়েই স্রোতের বিরুদ্ধে চলা মেয়ে। ক্রিম-পাউডার মেখে সে কখনও প্রসাধন করে না। যে কোন রকম সাজগোজেই তার অনীহা আছে। শাড়ি – ব্লাউজের ব্যাপারেও উদাসীন। হালকা রঙের তাঁতের শাড়িই তার পছন্দের। কোমর ছাপানো চুল গার্গীর, যদিও সে ব্যাপারেও সে নির্বিকার।

হলুদ খামের রহস্য উপন্যাসে একটি খুনের মামলায় ঘটনাচক্রে গার্গী জড়িয়ে পড়লে সায়ন তার ওপরে খানিক অসন্তুষ্ট হয়। তখন পুলিশ অফিসার দেবাদ্রি সান্যাল গার্গী সম্পর্কে সায়নের কাছে দরাজ প্রশংসা করে –

"মি চৌধুরি আপনার মিসেস একটি রত্ন বিশেষ। পুলিশে চাকরি না করেও কঠিন কঠিন হত্যারহস্য কী অবলীলায় সলভ করে ফেলছেন তা তো দেখতেই পারছেন। আপনি কি চান না ওঁর বুদ্ধি মাঝেমধ্যে এক আধটু ধার নিই আমরা ?"[২৪]

সেই *ঈর্ষার সবুজ চোখ* – এর ঘটনার পর থেকেই অফিসার দেবাদ্রি সান্যাল গার্গীর কাজের অনুরক্ত। তার পরের কয়েকটি ঘটনায় তিনি গার্গীর প্রতি এতটাই আস্থা অর্জন করেছেন যে, কোনো কেসে ঝামেলা আছে বুঝলেই তিনি গার্গীকে ফোন করে পরামর্শ

করেন, আলোচনা করেন বহুক্ষণ ধরে। মাঝে মধ্যে চলেও আসেন তার অফিস চেম্বারে। এক কাপ কফির সঙ্গে গার্গীর বুদ্ধিরও স্বাদ নিতে থাকেন তারিয়ে তারিয়ে। *টপস্পিন রহস্য* উপন্যাসে দেখি, অন্যদের কাছে গার্গীর পরিচয় দিতে গিয়ে সান্যাল বলেন,

"এঁকে চিনে রাখুন। ইনি গার্গী চৌধুরি। পুলিশের কেউ নন। কিন্তু কোন অপরাধের তদন্ত করতে গেলে ওঁর মাথাটা কম্পিউটারের মতো কাজ করে। তাই কোন জটিল কোনও অপরাধ ঘটলে ওঁর বুদ্ধিটা আমরা ধার নিই। তাতে আমাদের কাজের চাপ অর্ধেক হালকা হয়ে যায়।"[২৫]

গোয়েন্দাগিরির খাতিরে বহুবার ঝুঁকির মুখোমুখি গার্গী হয়েছে কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে তাকে দেখা যায়নি। বরং ক্যারাটে বিদ্যেটা তার ভালোই জানা আছে, প্রয়োজনে সেটাকেই সে কাজে লাগায়। ছদ্মবেশেও সে কম যায় না। *নীল রক্ত নীল বিষ* উপন্যাসে তাকে একটি মডার্ণ জিন্স-টপ পরা মেয়ের ছদ্মবেশ নিতে দেখা গিয়েছিল। গার্গী মনে করে, সব খুনের পেছনেই একটা অঙ্ক থাকে। আপাতভাবে জটিল মনে হলেও সেখানে কোন না কোন ফর্মুলা থাকে। খুনি কীভাবে অঙ্কটা কষেছে, সেটা বের করে ফেলতে পারলেই রহস্যভেদ।

ধূসর মৃত্যুর মুখ উপন্যাসে তপন বন্দোপাধ্যায় লিখছেন –

"সম্ভবত তার (গার্গীর) একটা তৃতীয় নয়ন আছে, যে-চোখ দিয়ে আজকাল সে যে-কোনও ঘটনার সে অনেকটা ভেতর পর্যন্ত দেখতে পায়। কৈশোরকাল থেকে আজ পর্যন্ত একের পর এক অনেক ছোট বড় রহস্যময় ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে তার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, সব অস্বাভাবিক ঘটনার ভেতর নিহিত থাকে আরও অনেক ঘটনার বীজ। ঘটনার গভীরে ঢুকলেই দেখতে পায়, যা সে একেবারেই ভাবেনি এমন অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাহিনী অবয়ব পাচ্ছে ক্রমশ। তাই যত দিন যাচ্ছে, গার্গীর ভেতর জন্ম নিচ্ছে এক বিশাল অনুসন্ধিৎসার জগৎ।"[২৬]

৭৭, সবুজ সরণি উপন্যাসে এক নার্সিংহোমকে কেন্দ্র করে দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে গার্গী। সেখানে সোনালিচাঁপা বলে একটি মেয়ের চাকরি চলে যায় তার তদন্তের কারণে। এই ঘটনায় যথেষ্ট দুঃখবোধ করে গার্গী, এবং সায়নকে বলে সোনালিচাঁপার একটি চাকরির ব্যবস্থা করে সে নিজেদের কোম্পানিতে। পরবর্তীকালে এই মেয়েটিই নিজগুণে হয়ে ওঠে গার্গীর প্রধান সহকারী ও বিশ্বস্ত সঙ্গী। পিঙ্কি হত্যারহস্য উপন্যাসে সোনালিচাঁপার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন লেখক –

"গার্গী সোনালিচাঁপার দিকে চোখ রাখে। ...ইদানীং তার সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরছে সোনালিচাঁপা। গোলগাল চেহারা। ফুলো-ফুলো গাল। তাকে দেখলেই বার্বি ডলপুতুলের উপমা মনে পড়ে গার্গীর। তার গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গি অনেকটা বাচ্চাদের ধরণের। কিন্তু বেশ বুদ্ধিমতী। গার্গীর অফিস সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও অন্য যে কোনও কাজে যথাসাধ্য চেষ্টা করে সাহায্য করতে। গোয়েন্দাগিরি করতে তার আরও উৎসাহ। কিন্তু মুশকিল হল গার্গী আজকাল তার অফিসের কাজে এতই ব্যস্ত যে, গোয়েন্দাগিরি করার সময় পায় না। সোনালিচাঁপা মাঝেমধ্যে পরোক্ষে তাগাদা দেয়, দিদি, কাগজ খুললেই আজকাল শুধু খুন আর খুন। পুলিশ ধরতেই পারছে না ! আপনি কিছু একটা করুন !

গার্গী হাসি-হাসি মুখে বলে, তুই তো দেখছিস, আমার হাতে তদন্ত করার মতো সময় একেবারেই নেই। এবার তোকেই ট্রেনিং দিয়ে নামিয়ে দেব গোয়েন্দাগিরি করতে।

সোনালিচাঁপা মুখ টিপে হাসে, কিছু বলে না। তার যে গোয়েন্দা হওয়ার শখ ষোলো আনা তা গার্গীর অজানা নয়।

সোনালিচাঁপা তো তার ডানা তুলেই আছে, শুধু গার্গীর হুকুমের অপেক্ষা।"[২৭]

সায়নও নিশ্চিন্ত হয়, যাক এতদিনে গোয়েন্দা গার্গীর একজন সহকারীও হল। যদিও নিজেকে গোয়েন্দা বলে পরিচয় দিতে গার্গীর কুণ্ঠাবোধ হয়।

"পৃথিবীতে এত নামীদামি ডিটেকটিভ আছে, তাদের পাশে তার মেধা, বুদ্ধি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আসলে পৃথিবীর আরও সব মেয়েদের মতো তারও সব ব্যাপারে প্রবল কৌতূহল। সেই কৌতূহলেরসূত্র ধরে সে অনুসন্ধান করতে চায় কোনও রহস্যের সন্ধান পেলে। তাতে কখনও বিপদের মুখোমুখিও হয়। সে তাতে ভয় পায় না বলেই সে আরও এগিয়ে যেতে পারে অপরাধীদের সন্ধানে।"[২৮]

আজকাল কিছু কিছু খারাপ খবর কীভাবে যেন দ্রুত পৌঁছে যায় গার্গীর কানে। কোন অদ্ভূত, রহস্যময় ঘটনা দেখলেই তার যে একটু তলিয়ে খোঁজখবর করার অভ্যাস আছে, তা কলকাতা শহরে মোটামুটি রাষ্ট্র হয়ে গেছে এতদিনে। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার কাহিনি খুবই দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশে যার কারণে কোথাও কোন অঘটন ঘটলে মুহূর্তের মধ্যে সেই খবর ছুটে আসে গার্গীর কাছে। আর তারপরেই শুরু হয় গার্গীর টানাপড়েন।

প্যারাডাইস প্রোডাক্টস – এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করার পর গার্গীর হাতে সময় প্রায় নেই, সেখানে আছে শুধু কলম, যা ব্যবহার করে তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নিজের ব্যক্তিগত ও সাংসারিক জীবন, সন্তান, দারুন ব্যস্ত কর্মজীবন সবকিছু সামলেও গার্গীকে নানান রহস্যভেদে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমরা দেখি, কারণ একটি সহানুভূশীল মন তার আছে। কেউ অকারণে বিপদগ্রস্ত হয়েছে জানলে গার্গী তার পাশে না দাঁড়িয়ে পারে না।

গার্গী-কাহিনিগুলির মধ্যে অন্যতম –

ঈর্ষার সবুজ চোখ (জানুয়ারি, ১৯৯৫), বহে বিষ বাতাস (জানুয়ারি, ১৯৯৬), ধূসর মৃত্যুর মুখ (অক্টোবর, ১৯৯৭), হলুদ খামের রহস্য (জানুয়ারি, ১৯৯৯), নীল রক্ত নীল বিষ (অক্টোবর, ২০০০), সোনালি সুতোর ফাঁস (বইমেলা, ২০০৪), ইহুদিকন্যা রহস্য (জানুয়ারি, ২০০৪), কফিন রঙের রুমাল (জানুয়ারি, ২০০৮), ক্যাপসুল রহস্য (জানুয়ারি,২০১১), ৭৭, সবুজ সরণি, একটি ইমন সন্ধ্যা, সোনার কেল্লায় গার্গী, গোয়ায় গার্গী, সবুজ দোপাট্টা রহস্য, গড় চক্রায়ণে গার্গী, পুরস্কার অপহরণ রহস্য, চিনা ডাক্তারের হত্যা রহস্য, পূর্বা অ্যাপার্টমেন্টে গার্গী, রজনি হত্যা রহস্য, গার্গীর এবিসিডি রহস্য, গার্গীর পিছু – পিছু রহস্য, হোস্টেলে হত্যা, ডঃ ঋতম্ভর মিত্রর হত্যারহস্য, বিকানিরে এক রহস্যময়ী ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, *কফিন রঙের রুমাল* উৎসর্গ করা হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের আরেক জনপ্রিয় রহস্য - রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে।

❖

পেশায় ইতিহাসের অধ্যাপিকা দময়ন্তীর নেশা হল গোয়েন্দাগিরি করা। যদিও সে মূলত আর্মচেয়ার-নির্ভর। খুব বেশি দৌড়-ঝাঁপ করতে তাকে দেখা যায় না। বরং ঘরে বসে মাথা খাটিয়ে রহস্য সমাধানেই তাঁর আগ্রহ বেশি। *রোমাঞ্চ* পত্রিকার পাতায় *সরল অঙ্কের ব্যাপার* গল্পের মাধ্যমে প্রথম দময়ন্তীর আবির্ভাব। তার স্রষ্টা মনোজ সেনের (জন্ম ১৯৪০) কথায় –

"একজন ঐতিহাসিক যেমন কোনো প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাবশেষ, কিছু ধূসর পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া পাতা অথবা আপাত-কাল্পনিক লোকস্মৃতি আর উপকথা থেকে একটি ঐতিহাসিক সত্যকে খুঁজে বের করে আনেন, তেমনি কোনো অপরাধের উল্টোপাল্টা সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে একটি যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান প্রতিষ্ঠিত করে দময়ন্তী। সে গোলাগুলি চালায় না, চোর ধরে না, সে-কাজ যাদের করা উচিত তারাই করে। তাই, দময়ন্তী নিজেকে রহস্যসন্ধানী বলতে পছন্দ করে।"[২৯]

টাকা পয়সার জন্য দময়ন্তী এই কাজে আগ্রহী হয়নি, রহস্য সন্ধানের আনন্দটুকুই তার কাঙ্ক্ষিত। *নকল হিরে* গল্পে সুশীলবাবু দময়ন্তীর কাছে তার মেয়েকে বাঁচানোর দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ করেন, বিনিময়ে যা পারিশ্রমিক দময়ন্তী চায়, তা দিতে তিনি রাজি বলে জানান। এ কথার উত্তরে দময়ন্তী ফিকে হেসে বলে –

“দেখুন, প্রফেশনাল প্রাইভেট ডিটেকটিভ বলতে যা বোঝায়, আমি তা নই। টাকা নিয়ে আমি কাজ করি না। আর কাউকে বাঁচানোর কোনো দায়িত্বও আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। কোথাও কোনো রহস্য থাকলে, আমী সেটার জট ছাড়ানোর চেষ্টা করতে পারি মাত্র।”[৩০]

এই গল্পেই আরেকটু কাহিনি এগোলে পরে, গল্পের এক চরিত্র পাঞ্চালী যখন দময়ন্তীকে বলে –

“সুশীলবাবুর মুখে আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনলুম। আপনি ইতিহাসের অধ্যাপিকা হয়েও শখের জন্যে এইসব কাজ করেন। সুশীলবাবু কেন আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন আমি জানি না, কিন্তু আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন যে দীপান্বিতা নির্দোষ, সে খোকা, মানে প্রতাপকে খুন করেনি ?”[৩১] পৃ ৬৫

দময়ন্তী শান্ত গলায় উত্তর দেয় –

“সুশীলবাবু আপনাকে আমার সম্বন্ধে কী বলেছেন আমি জানি না, তবে স্পষ্টতই একথা বলেননি যে কাউকে দোষী বা নির্দোষ প্রমাণ করা আমার কর্তব্য নয়। কোনো ঘটনার পেছনের পারম্পর্য এবং তার কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করে, তার বিশ্লেষণই যেমন ঐতিহাসিকের কর্তব্য, আমারও তাই। দীপান্বিতা তার স্বামীকে দুপুর বেলা তার নিজের ঘরে গুলি করে মেরেছে এটা ঘটনা, কিন্তু তার এখানেই শুরু এবং এখানেই শেষ, তা নয়। আমাদের একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে এই দুর্ভাগা দম্পতি একটা দীর্ঘদিনের অতি নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের অসহায় শিকার। সেই ষড়যন্ত্রের মূল খুঁজে বের করব – এরকম কথাই আমি সুশীলবাবুকে দিয়েছি।”[৩২]

নকল হিরে গল্পটির শেষে দেখা যায়, প্রতাপ এবং দীপান্বিতার দাম্পত্যের মধ্যে চারপাশের আরও নানান মানুষ ঢুকে পড়ে তাদের সম্পর্কের সহজতাকে বিষিয়ে দেয়, যার ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে শুরু হয় মনোমালিন্য, যা শেষ পর্যন্ত গড়ায় খুনে। দময়ন্তী একজন বিবাহিত নারী, সে তার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই দু’টি অসহায়, অসুখী মানুষের কষ্ট নিশ্চয়ই অনুভব করেছে। তাদের প্রতি সমব্যাথী হয়েছে বলেই কেন মেয়েটি

তার স্বামীকে নিজের হাতে খুন করল, সেই রহস্যের শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখতে চেয়েছে। এবং সে রহস্যভেদ করেওছে। একটি সহানুভূতিশীল, মানবিক হিসেবে দময়ন্তীকে এঁকেছেন মনোজ, যে শুধুমাত্র অপরাধীকে শনাক্ত করে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, কেন সে অপরাধটি করল, তাও খতিয়ে বুঝতে চায়।

দময়ন্তীর গল্পগুলির মধ্যে – *সরল অঙ্কের ব্যাপার, নকল হিরে, রাজমহিষীর রহস্য, পর্বতো বহ্নিমান, সূর্যগ্রহণ, চরৈবেতি* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

❖

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের (১০ই জানুয়ারি, ১৯৫০- ১২ই মে, ২০১৫) মিতিন মাসি বা প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি পুরোদস্তুর পেশাদার গোয়েন্দা। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে মিতিন ওরফে প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জীর খুব নামডাক। তার গোয়েন্দা সংস্থা ‘থার্ড আই’কে লালবাজারের তাবড় পুলিশ অফিসারেরা সমীহ করে। মাঝেমাঝে তার পরামর্শও নেয়। অপরাধতত্ত্বের সমস্ত বিভাগ নিয়ে দিন-রাত চর্চা করে মিতিন। ফরেন্সিক সায়েন্স, অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব, নানারকম অস্ত্রশস্ত্রের খুঁটিনাটি, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, এই আইন সেই আইন। পুরনো জটিল কেসগুলিকে স্টাডি করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। নিষ্ঠায় মিতিন লা-জবাব। প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের জন্য সে অনায়াসে পরিশ্রম করতে পারে। আর পারিশ্রমিক নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় না। সে বলে-

“টাকা জিনিসটা আমার কাছে খুবই মূল্যবান। তবে একটা জটিল রহস্যভেদ করার আনন্দ তার চেয়েও দামি।”[৩৩]

কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভ -এও মিতিনকে বলতে শোনা যায় –

"প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায় অর্থ ছাড়াও কেস করে স্যার। মগজের খিদে মেটানোর বাসনা তো থাকে মানুষের।"[৩৪]

গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি মিতিন একটি ভরভরন্ত সংসারের কর্ত্রীও বটে। বাংলা সাহিত্যের পুরুষ গোয়েন্দাদের মতো সে সাংসারিক ব্যাপারে মোটেই উদাসীন নয়। সে রান্না করে, ঘরদোর গোছায়, অতিথি আপ্যায়ন করে, ছেলে বুমবুমকে পড়তেও বসায়। আবার কুংফুর প্যাঁচে অপরাধীকে ঘায়েল করার পর অবলীলায় ফোন করে ছেলের খবর নেয়।

তবে তদন্ত চলাকালীন মিতিন যেন অন্য মানুষ। দু'কামরার ভাড়াবাড়ির পিছনের চওড়া বারান্দায় মিতিন তার অফিস কাম ডিটেকশন চেম্বার বানিয়ে নিয়েছে। খুপরি জায়গাটুকুতে আছে চেয়ার টেবিল, খুদে সোফা, একখানা ফাইল ক্যাবিনেট, বেঁটে একটা স্টিল আলমারি আর বইটই। গোপন নথিপত্রও থাকে আলমারিতে। নিজের পেশার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। রহস্য যখন বেশ জমে ওঠে তখন মিতিন বেশিরভাগ সময় এই ঘরেই কাটায়। পায়চারি করে, পড়াশুনো করে, নেট ঘাঁটে অথবা স্রেফ বসে বসে চিন্তা করে। এ সময় সে পারতপক্ষে কথা বলে না, কেউ কোন প্রশ্ন করলে দায়সারাভাবে এড়িয়ে যায়। টুপুরের কথায় –

"চিন্তা করার সময় মিতিনমাসি কেমন যেন খ্যাপাটে হয়ে যায়। এই সময়ে ডাকাডাকি করলে মিতিনমাসির চিন্তার সুতো না কি ছিঁড়ে যায়।"[৩৫]

মিতিনের দিদির মেয়ে টুপুর। চোদ্দ বছর বয়েস। স্কুল পড়ুয়া। সেও ভবিষ্যতে তার মিতিনিমাসির মতো গোয়েন্দা হতে চায়। পড়াশুনোর চাপ সামলে মূলত ছুটিছাটায় তার

মিতিনিমাসিকে গোয়েন্দাগিরিতে সাহায্য করে। তার ধারণা, মিতিনের সাথে বেড়াতে গেলে নির্ঘাত কিছু না কিছু ঘটবে।

“গোয়েন্দাদের ভ্রমণ কি কখনও পুরোপুরি নিরামিষ হয় ?”

টুপুরের এই আন্তরিক বাসনার সাথে বোধহয় সব বাঙালি কিশোর-কিশোরীরই নিজেদের মেলাতে পারবে, বিশেষত যারা ফেলুদা-কাহিনির পাঠক।

ট্রেনের একজন সহযাত্রী সম্পর্কে টুপুর ভুল ধারণা করলে মিতিন বলে –

“কী রে, তোর না আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়ার শখ ? অবজার্ভেশন পাওয়ার এত পুওর হলে চলবে ?”

মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ে টুপুর। মিতিনের নির্দেশে এই অভ্যেসটা গজিয়েছে টুপুরের, ফাঁক পেলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গলাধঃকরণ করে আস্ত কাগজখানা। খুদে খুদে বিজ্ঞাপনগুলোকেও ছাড়ে না। মিতিন বলেছে, খবরের কাগজের ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনে অনেক সময় মজার মজার গল্প লুকিয়ে থাকে। চোখ মেলে খুঁজতে জানলে কখনও সখনও ছোটখাটো রহস্যের সূত্রও মিলে যেতে পারে।

মিতিনমাসির কোন কাজে সহকারী হতে টুপুরের কণামাত্র আপত্তি নেই। সে গোয়েন্দাগিরিই হোক, কি নিছক ঘরোয়া কাজে। গরমের ছুটি পড়তে না পড়তেই মাসির বাড়িতে চলে আসে টুপুর। সর্বক্ষণ মাসির গা ঘেঁষে থাকবে, প্রতি পদে কিছু না কিছু শিখবে বলে। আর তার সাথে যদি কোন কেস এসে যায়, টুপুরের তো পোয়া বারো।

তদন্ত চলাকালীন টুপুরকে অনেকসময় একটি কাজের ভার দেয় মিতিন। রাইটিং প্যাড নিয়ে টুপুরকে তখন লিখতে বসতে হয়। কেসের প্রথমদিন থেকে যাদের যাদের দেখেছে, যেখানে যেখানে তারা গ্যাছে, যা যা শুনেছে সব ডিটেলে নোট করতে হয়। তারপর রিমার্কস কলামে গিয়ে কার কোন ব্যাপারটা সন্দেহজনক লেগেছে, তাও লিখতে হয়।

টুপুর ছাড়াও মিতিনের বর পার্থও তার আরেক সহকারী বটে। কোন কোন কেসে মিতিন তার প্রয়োজনমতো পার্থর সাহায্য নেয়। ছুটোছুটির ব্যাপারটা তো বটেই, নানান বিষয়ে অগাধ ফান্ডা দিয়েও মিতিনকে হেল্প করে থাকে পার্থ। যদিও সময় সুযোগ বুঝে মিতিনের পেছনে লাগতেও, তার সাথে খুনসুটি করতেও ছাড়ে না সে। মন ফুরফুরে থাকলে মিতিনও পাল্টা দেয়, আর মাথায় চিন্তার জট থাকলে স্পিকটি নট।

হাতে মাত্র তিনটে দিন উপন্যাসে আমরা দেখি, মিতিনের হাতে যখন কোন কাজ থাকে না, তখন তার কোন ছটফটানিও থাকে না। একবারও কম্পিউটার খোলে না, ফোনাফুনি করে না, ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করে না, বাইরে বেরয় না। সারাদিন হয় গল্পের বই পড়ে, নয়তো গান শোনে। অবিরাম রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা পুরনো আমলের হিন্দি গান। মোটেই রান্নাঘরে ঢোকে না। এত উদাসীন, এমন নিস্পৃহ মাসিকে চট করে দেখে না টুপুর। পার্থমেসো এই পরিস্থিতিতে আবার বেকার, ঘরে-বসে-থাকা মিতিনকে বাড়িতে চপ-কাটলেট ভাজার পরামর্শ দেয়। যথারীতি এই খোঁচা টুপুরের ভাল লাগে না। সে প্রতিবাদ জানায় -

“মিতিনিমাসি মোটেই এখন বসে নেই মেসো। মগজটাকে কয়েকদিন রেস্ট দিচ্ছে শুধু।”

পার্থও ছোড়নেওয়ালা নয়। কৌতুক করে বলে –

"তোরও গায়ে ফোসকা পড়ে বুঝি ?...জব্বর একখানা চামচি হয়েছিস বটে মাসির। একজনকে ছ্যাঁকা দিলে অন্যজনের চামড়া জ্বলে।"[৩৬]

টুপুর এই কাহিনিতে অনেক পরিণত। যে আট বছরের বাচ্চাটি এই গল্পে কিডন্যাপড হয়, তার বাবা, মিস্টার জরিওয়ালা ভয় পেয়ে গিয়ে কেস থেকে মিতিনকে সরে যাওয়ার অনুরোধ করেন তার পারিশ্রমিক দিয়ে দিতে চাইলে টুপুর বলে –

"কোনও ইনভেস্টিগেশন শুরু করে মাঝপথে থেমে যাওয়াটা মাসির স্বভাবে নেই...কাজ না করে ফিজ নেওয়াটাও আমার মাসির ধাতে নেই। তাছাড়া মাসি এই কেসটায় বেশ খানিকটা এগিয়েছেন, এখন কিডন্যাপারদের না ধরে আগেই থেমে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক।"[৩৭]

মিতিনের স্নেহপরায়ণ এবং সাংসারিক স্বভাবের খুব সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত এই গল্পে পাওয়া যায়। তদন্তের ব্যাপারে চিন্তান্বিত থাকলেও সে ঠিক মনে করে বাড়ির পরিচারিকা আরতিকে জিগ্যেস করে মোমো খেয়েছে কি না। তার বাচ্চা মেয়েটার জন্যেও কিছুটা নিয়ে যেতে বলে –

"আরও তো অনেক রয়েছে, তোর মেয়ের জন্য দু'-চারটে নিয়ে যা। শাশুড়ির জ্বর হয়েছে বলছিলি, সেরেছে ?...দেখিস বাবা, সিজন চেঞ্জের সময় নানান রোগ ব্যাধি হয়। মেয়েকেও সাবধানে রাখিস। সারাদিন ঠাকুরমার কাছে থাকে, তার যেন ছোঁয়াচ না লাগে।"[৩৮]

জোগাড় করা সমস্ত তথ্যকে ছেঁকেছুঁকে তাদের একটা যুক্তির শিকড়ে গেঁথে ফেলা। তারপর মেথড অব এলিমিনেশন দিয়ে ধাপে ধাপে বুলস্ আই-তে পৌঁছনো। এই হল মিতিনের কাজের পদ্ধতি। মিতিনের মতে ভাল গোয়েন্দাদের ফটোগ্রাফিক মেমরি থাকাটা খুব জরুরি। একবার যা দেখবে বা শুনবে, সেটা ভোলা চলবে না। তার সঙ্গে ঘটনা

পরম্পরা সাজানো, সেগুলো সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার অভ্যাস – এগুলোই একজন ভাল গোয়েন্দার বৈশিষ্ট্য। টুপুরকে মিতিন উপদেশ দেয় –

"স্মৃতিশক্তিকে আরও প্রখর কর। তোর মেসোর মতো শুধু শব্দজব্দ করে কিস্‌সু হবে না। প্রতিটি ডাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে রাখার একটা প্রসেস্‌ আছে। সময়ের উল্টোদিকে ধাপেধাপে এগোতে হয়। অর্থাৎ দিনের শেষ থেকে ক্রোনোলজিক্যালি শুরুতে যাওয়ার চেষ্টা করবি। প্রথমে শুধু আজকের দিনটা। তারপর আজ আর গতকাল। তারপর আজ কাল পরশু।"[৩৯]

মিতিনের সব দিকে খেয়াল থাকে। তদন্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই টুপুরকে পড়তে বসার কথা মনে করিয়ে দেয় মিতিন। ঠিক একজন দায়িত্ববান অভিভাবকের মতোই। মিতিনের আরেকটি চমৎকার ক্ষমতা, তদন্তের স্বার্থে গোপন খবর টেনে বের করার জন্য রাঁধুনি, পরিচারিকা, মালী অথবা গাড়িচালক শ্রেণির মানুষদের সাথে আলাপ জমাতে ওস্তাদ সে। আর তারাও অল্প সময়ের মধ্যেই মিতিনকে বেশ আপন মনে করে মনের কথা বলতে শুরু করে। যেমন, *গুপ্তধনের গুজব* উপন্যাসে মক্কেলের রাঁধুনির সাথে আলাপ জমাতে হয়েছে তাকে। সরল গ্রাম্য বৌটি প্রথম দিকে মিতিনকে দেখে থতমত খেয়ে যায়। কিন্তু তাকে সহজ করার জন্য মিতিন অবলীলায় তার কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রাখে। বলে, 'তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম ভাই'। মিতিনমাসির এই কায়দাটা ভালোই কাজ দেয়, খেয়াল করে দেখেছে টুপুর। তার ঘনিষ্ঠ আন্তরিক ব্যবহারে আপ্লুত হয়ে অনেক সময়েই মনের-প্রাণের কথা বলে ফেলে কাজের লোকজন।

শরীরকে চাঙ্গা রাখার জন্য নিয়মিত যোগব্যায়াম করে মিতিন। ভুজঙ্গাসন, শলভাসন, ময়ূরাসন, মৎসাসন করল মিনিট পনেরো তারপরে শবাসন। তারপরে প্রাণায়াম। পালা করে পূরক, কুম্ভক, রেচক। ওয়ান ইজ টু ফোর ইজ টু টু। দশ সেকেন্ড ধরে এক নাক চেপে শ্বাস টানা, চল্লিশ দমবন্ধ, তারপর অন্য নাক দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে ফুসফুস খালি করা।

টুপুরও এসব চেষ্টা করে দেখেছে। ওই রেচকটা নিয়েই তার সমস্যা হয়। অতক্ষণ ধরে একটু একটু করে শ্বাস ফেলা যে কী কঠিন ! একবার এ নাক দিয়ে টানতে হবে তো পরেরবার ও নাক দিয়ে। রীতিমতো আয়াসসাধ্য ব্যাপার। তবে মিতিন ভারী সহজেই সেসব করে ফেলে। মনে হয় যেন তার কাছে এসব ছেলেখেলা। এরপর চোখ বন্ধ করে দশমিনিট ধ্যান। মিতিন বিশ্বাস করে, এই ধ্যানটা না কি মস্তিষ্কের জন্য খুব জরুরি। এতে না কি মনোঃসংযোগের ক্ষমতা বাড়ে।

টুপুর মিতিনমাসিকে 'দ্য গ্রেট' মিতিনমাসি বলে সম্বোধন করায় মিতিন হেসে বলে -

"গ্রেট - ফ্রেট কিছুই নই, চোখ-কানটা খোলা রাখি। মনের দরজাটাও। ভাবনাচিন্তা তৈরি হওয়াটাও একটা প্রসেস.....এর জন্য প্রয়োজন চর্চা, অধ্যবসায়, আর নিষ্ঠা। আর একটু কমনসেন্স।"[৪০]

টুপুরকে মিতিনের উপদেশ –

"অ্যাটেনশানটা বাড়া। শুধু ক্যারাটে শিখলেই হবে না, মস্তিষ্কের ব্যায়ামটাও চাই। দৃষ্টিশক্তিকেও অনেক তীক্ষ্ণ করতে হবে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না দেখলে সিদ্ধান্তে ভুল হয়ে যাবে যে।"[৪১]

মিতিন যুক্তিবাদী, স্বাবলম্বী। স্টেশনে নেমে ছুটোছুটি করে খাবার কিনে আনার প্রসঙ্গে দিদি সহেলীকে সে বলে -

"পার্থ পারলে আমিও পারব। মেয়ে বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকব, আর ছেলেরা ছুটে ছুটে খাবার জোগাড় করবে, ওসব দিন আর নেই রে বড়দি।"[৪২]

মাত্র কয়েক বছরেই মিতিন গোয়েন্দা হিসেবে বেশ নাম করেছে। এখন তো পুলিশের উপর মহলের লোকেরাও মঝেমধ্যে মিতিনিমাসির পরামর্শ নিতে আসে। যেমন, *সর্প-রহস্য সুন্দরবনে* উপন্যাসে সরকারি পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার অনিশ্চয় মজুমদার নিজে মিতিনের কাছে ছুটে এসেছেন একটা কেসের ব্যাপারে সাহায্য চাইতে। পুলিশের এই বড়কর্তাটির সঙ্গে মিতিনের ভারী সুসম্পর্ক। মিতিন যেমন অনেকসময় পুলিশের সাহায্য প্রয়োজন হলে অনিশ্চয়কে স্মরণ করে, তেমনই অনিশ্চয়ও মিতিনের প্রতিভাকে কদর করে, নানান জটিল ঝামেলায় মিতিনের স্মরণাপন্ন হয়। অনিশ্চয়ের কথায় –

"আমাদের পুলিশের চোখ একটা বাঁধাধরা গতে চলে। তাতে সবকিছুই ধরা পড়ে বটে, তবে ছোটখাটো দু'একটা জিনিস তো নজর এড়িয়েও যায়। আর আমাদের ম্যাডামের অবজার্ভেশন তো মন্দ নয়, উনি সঙ্গে থাকলে পুলিশি চোখের ঘাটতিটুকু পুষিয়ে যেতেও পারে।"[৪৩]

আর পুলিশ সম্পর্কে মিতিনের কী মতামত ?

"পুলিশের কাজ তো অনেকটাই রুটিন জব, ভাল লাগে না। তুলনায় আমার কাজে স্বাধীনতা অনেক বেশি। নিজের পছন্দমতো কেস নিতে পারি। অবশ্য পুলিশের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ রাখতেই হয়। তাদের সাহায্য ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই এগোন মুশকিল।"[৪৪]

একখানা রিভলবার আছে মিতিনের, আত্মরক্ষার খাতিরে। তবে অযথা অস্ত্রের ব্যবহার তার না-পসন্দ। কিন্তু মিতিনের দিকে যদি কেউ রিভলবার তোলে, তাহলে পাল্টা আক্রমণ শানানোতে আপত্তি নেই তার। রিভলবার চালানোর পাশাপাশি কুং-ফু ক্যারাটেতেও যথেষ্ট দক্ষ মিতিন। মিতিনের ভালোমানুষ গোবেচারা চেহারা দেখে কেউ চট করে ভাবতে পারে না যে তার হাতব্যাগে রিভলবার রাখা আছে। এই গল্পের সুধন্য সান্যালের শাক্‌রেদকে কুংফুর প্যাঁচেই ধরাশায়ী করে মিতিন। এবং এসব সে কখনই জাহির করতে চায় না। অনায়াসে এইসব মারপ্যাঁচ কষার পরেই বাড়িতে ফোন করে ছেলের খোঁজ নেয় মিতিন,

পরিচারিকাকে সাংসারিক নির্দেশ দেয় টুকিটাকি। পেশাদার জীবন আর সাংসারিক জীবনের মধ্যে অদ্ভূত ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে সে।

ছকটা সুডোকুর উপন্যাসে টুপুর মিতিনের নিজস্ব ঘরখানার একটা বর্ণনা দিয়েছে যেটা থেকে গোয়েন্দা মিতিনের আগ্রহের বিষয়গুলির একটা ধারণা পাওয়া যাবে -

"এই ঘরখানায় ঢুকলেই টুপুরের অদ্ভূত রোমাঞ্চ জাগে। কত কিছু যে আছে এখানে। সম্প্রতি একটা ল্যাপটপ কিনেছে মিতিনিমাসি, বাহারি ছোট্ট কম্পিউটারখানা শোভা পাচ্ছে টেবিলে। দেওয়ালজোড়া র‍্যাকে থরে-থরে বই আর বই। ইতিহাস, ভূগোল, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, সাহিত্য সবই অবস্থান করছে পাশাপাশি। এছাড়াও রয়েছে অজস্র ফাইল। নানান কেসের। এক-একটা বিষয় ধরে খবরের কাগজের কাটিং জমায় মিতিনমাসি, সেই ফাইলের সংখ্যাও কম নয়। কোনওটায় একের পর এক খুনের খবর। কোনওটায় শুধু কিডন্যাপিং। কিংবা জালিয়াতি, ডাকাতি। গত তিন-চার বছরের একটা অপরাধও বোধহয় মিতিনিমাসির তথ্যভান্ডারের বাইরে নেই। এত গুছিয়ে কাজ করে বলেই না ঝানু গোয়েন্দা হিসেবে মিতিনমাসির এত নামডাক।"[৪৫]

আরাকিয়েলের হিরে উপন্যাসে জেসমিনকে অপরাধী হিসেবে শনাক্ত করেও তাকে ছেড়ে দিয়েছিল মিতিন। টুপুর এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে মিতিন বলে –

"জেসমিন তো জাত ক্রিমিনাল নয়। লোভের তাড়নায় দুর্বুদ্ধি চেপেছিল মাথায়। দুর্বুদ্ধি ঠেলেছে পাপের পথে। অনুশোচনা এলে নিশ্চই শুধরে যাবে। ...আশা করতে দোষ কি ! মানুষই ভুল করে মানুষই শুধরোয়।"[৪৬]

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা মিতিনমাসি সিরিজের উপন্যাস ও তাদের গ্রন্থপ্রকাশ–

সারান্ডায় শয়তান (২০০৩), জোনাথনের বাড়ির ভূত (২০০৪), কেরালায় কিস্তিমাত (২০০৫), সর্প-রহস্য সুন্দরবনে (২০০৬), ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য (২০০৭), ছকটা সুডোকুর (২০০৮), আরাকিয়েলের হিরে (২০০৯), গুপ্তধনের গুজব (২০১০), হাতে মাত্র তিনিটে দিন (২০১১), কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভ (২০১২), মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যুফাঁদ (২০১৩), টিকরপাড়ায় ঘড়িয়াল (২০১৪), দুঃস্বপ্ন বারবার (২০১৫), স্যান্ডরসাহেবের পুঁথি (২০১৬)।

❖

বাংলা সাহিত্যের আরেক পেশাদার মেয়ে-গোয়েন্দা, পারমিতা ঘোষ মজুমদারের চরিত্র, অর্থনীতির ছাত্রী ও প্রাক্তন সাংবাদিক রঞ্জাবতী মজুমদার অবিবাহিত, কিন্তু বন্ধু ও সহকারী লাজবন্তীর পরিবারকেই সে আপন করে নিয়েছে। তার 'টিম ট্রুথসিকার্স' এর বাকি সদস্যরা হলেন তার সহচরী লাজবন্তি গঙ্গোপাধ্যায় আর তার ছেলে বীতশোক ওরফে পোগো। কম্পিউটারে তুখোড়, ছদ্মবেশে ধারণে জুড়িহীন এহেন রঞ্জাবতী মগজাস্ত্রের পাশাপাশি শারীরিক দক্ষতাতেও হয়ে উঠেছে যথার্থ একুশ শতকীয়।

******

অঞ্জন মান্নার গল্পের অঝোরঝরা বসু আরেক মেয়ে-গোয়েন্দা। রাজেশ বসুর গল্পে দ্যুতি, দিয়ালা, রুদ্রাণী তিন জন মহিলা গোয়েন্দা এসেছেন। স্বাতী ভট্টাচার্যের গল্পে মেধা বা মেধাবিনীকে গোয়েন্দা হিসেবে পাওয়া গেছে। অভিজ্ঞান রায়চৌধুরীর অনিলিখাও এই

সময়েরই মেয়ে গোয়েন্দা। এঁরা সকলেই নারী গোয়েন্দা বলতেই মিস মার্পেলের ভেসে ওঠা ছবিটা ভেঙে দিয়েছেন। মেয়ে গোয়েন্দা বলতে ঘরের এক কোণে বসে থাকা যে 'প্রোটোটাইপ'টা দেখতে আমরা অভ্যস্ত তা এখনকার মহিলা গোয়েন্দারা ভেঙেছেন। এনারা ঘরের বাইরে এসেছেন। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ঘরে বাইরে সবেতেই সমান পারদর্শী। মেয়েরা স্বভাব গোয়েন্দা। অপরাধের গন্ধ তারা পুরুষের আগেই পেয়ে যান। তাই তারা স্বাভাবিক নিয়মেই সফল। অবশ্য সকলেই সমান সৌভাগ্যবান নয়। গোয়েন্দা হলেও, যেন ঠিক আলো পড়েনি বাচ্চু বিচ্ছুর উপর। 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র মূল গোয়েন্দা চরিত্র বাবলু আর বিলুর ভাগ্যেই জুটেছে বেশিরভাগ প্রশস্তি।

******

সহকারীর ভূমিকাতেও মেয়েরা কম যায় না। গোয়েন্দা গার্গীর সহকারী সোনালিচাঁপা তার অফিসে কাজ করার পাশাপাশি গোয়েন্দাগিরিতেও তাকে সাহায্য করে। মিতিনের বোনঝি, বছর চোদ্দর কিশোরী টুপুরকে যদিও মিতিন খুব একটা গুরুদায়িত্ব দেয় না, কিন্তু টুপুর পড়াশুনোর অবসরে মিতিনমাসির রহস্য-অ্যাডভেঞ্চারের শরিক হওয়ার সুযোগ কখনোই হারাতে চায় না। মিতিনকে যথাসাধ্য সাহায্য করে নিজেকে তার সহকারী হিসিবে প্রমাণ করার প্রাণপণ চেষ্টা সে চালিয়ে যায়। নারায়ণ সান্যালের 'কাঁটা সিরিজ'-এ ব্যারিস্টার পিকে বাসুর গল্পে 'সুকৌশলী'র পরিচয় পেয়েছি। 'সুকৌশলী'র 'সু' মানে সুজাতা অথবা 'ত্রয়ী সত্যসন্ধানী'র শেলী অথবা, গৌরপ্রসাদ বসুর গল্পে এলা, গোয়েন্দা কুশলের সহকারীর ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সরাসরি সহকারী না হয়েও, গোয়েন্দা অশোক ঠাকুরের বৌদি কাঞ্চনের কথা বাদ দেব কেমন করে। গোয়েন্দা অশোক ঠাকুরকে, তার বৌদি কাঞ্চন মাঝে মাঝেই যুক্তির খেই ধরিয়ে দেয়, সমাধানের রাস্তা দেখিয়ে দেয়। একইরকম ভাবেই পরিমল গোস্বামীর গোয়েন্দা হরতনকে সাহায্য করে তার স্ত্রী কুসুমিতা

আর অদ্রীশ বর্ধনের ইন্দ্রনাথ রুদ্র এই ধরনের সহায়তা পেয়ে থাকে আবার মৃগাঙ্কর স্ত্রী কবিতার থেকে। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের শান্ত শিষ্ট প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপঙ্কর বাগচীতো আবার অ্যাকশনের জন্য নির্ভর করে তার কুংফু-ক্যারাটে জানা সহকারী ঝিনুকের ওপর।

❖

বাংলা ক্রাইম কাহিনিতে মেয়েদের প্রসঙ্গ গোড়া থেকেই এসেছিল অপরাধী হিসেবে। গোয়েন্দা পুলিশ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবরণে তাঁর *দারোগার দপ্তরে* প্রকাশিত *মা, না রাক্ষসী ?* (আশ্বিন, ১৩০৬), *রাঙ্গা বউ* (মাঘ, ১৩০৮), *সাবাইস বুদ্ধি* (কার্ত্তিক, ১৩১১) ঘটনাগুলি সবই মেয়েদের অপরাধের কাহিনি। উনিশ শতকের স্বল্প বিনোদনের যুগে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জারিত সেই গরম খবর কেমন আলোড়ন ফেলেছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে, তার প্রমাণ *দারোগার দপ্তর*-এর একুশ বছরে প্রায় ২০৬টি কিস্তি! এ জাতীয় পুলিশ কেস বা ফাইলের সূত্রেই বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের গোড়াপত্তন। এই সব লেখায় অপরাধের সঙ্গে মেয়েদের পাকাপোক্ত যোগাযোগের হদিশ মেলে বটে, কিন্তু গোয়েন্দাগিরির ক্ষেত্রে স্বভাবতই এখানে মেয়েদের কোনও ভূমিকা থাকা সম্ভব ছিল না। অথচ তাদের উপস্থিতি কাজে লাগিয়ে পাঠকের চোখ টানার চেষ্টা ছিল পুরোদমে। *দারোগার দপ্তর*-এর বাণিজ্যিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই বটতলা-জাতীয় গোয়েন্দা কাহিনি লেখার হিড়িক পড়ে গেল। মহাজনের পন্থা মেনেই সেখানেও লাস্যময়ী খলনায়িকাদের ভিড়। কিছু দিন পরেই আসর জাঁকিয়ে বসলেন পাঁচকড়ি দে। *মায়াবিনী, মনোরমা, নীলবসনা সুন্দরী*— তাঁর একের পর এক বইয়ে সুপারহিট হল গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয় আর খলনায়িকা জুমেলিয়ার জুটি। গোয়েন্দা কাহিনির জমজমাট বাজার ধরতে পিছিয়ে ছিলেন না তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দীনেন্দ্রকুমার রায়ও। তাঁর *রঙ্গিনীর রণরঙ্গ* বইয়ে সগৌরবে উপস্থিত মেয়ে দস্যু মিস ওল্‌গা নাসমিথ। ভদ্র কন্যার চরিত্র দিয়ে তো জনতোষণের চাহিদা মেটে না। অতএব লেখকদের এক ঢিলে দুই পাখি মারার উপায় ছিল খলনায়িকার

চরিত্র সৃষ্টি। আরও পরে স্বপনকুমারও তাঁর গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জির বিপরীতে আমদানি করেন দুর্দান্ত কালনাগিনীকে। দস্যুতা তার পেশা হলেও অপরূপা সুন্দরী কালনাগিনীর রবিনহুড-জাতীয় কার্যকলাপ অবশ্য তাকে পূর্বসূরিদের থেকে খানিক আলাদা করেছে। বলতে হয় স্বপনকুমারের সৃষ্ট আর এক খলনায়িকা, 'আগুনের নেশা মাখানো' লাস্যময়ী ফ্লোরার কথাও। ইন্দো-চিনা অপরাধী লিউসিনের এই সঙ্গিনী রূপযৌবনের ফাঁদ পেতে কার্যোদ্ধার করতেই অভ্যস্ত।

প্রশ্ন উঠতে পারে, উনিশ শতকের শেষেই যখন মেয়েরাও ক্রমশ পা রাখছেন লেখালিখির জগতে, সে ক্ষেত্রে মেয়েদের কলমেই কি তৈরি হতে পারত না এই গড্ডালিকা প্রবাহের বিপ্রতীপে একটা অন্য বাঁক! তা হলে মনে করে নেওয়া যাক প্রথম অপরাধ-বিষয়ক কাহিনির লেখিকা সৌদামিনী দেবীর কথা। তাঁর বই *মাতঙ্গিনী* প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৫ বঙ্গাব্দে। এক ব্যভিচারিণী স্ত্রীর স্বামী-হত্যার ঘটনা ঘিরে গড়ে উঠেছিল এই বইয়ের কাহিনি। সৌদামিনী যদিও পিতৃতন্ত্রের পক্ষেই আদ্যন্ত ওকালতি করেছিলেন, তবু এমন পাপের চিত্র অঙ্কনের অভিযোগে *বামাবোধিনী* পত্রিকার তীব্র নিন্দার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। আদর্শ নারীর সঙ্গে হিংসাত্মক ঘটনার এই যে মুখ দেখাদেখিটুকুও বন্ধ, এমন শর্ত মেনে আর যা-ই হোক, মেয়ে গোয়েন্দার উৎপত্তি আদৌ সম্ভব ছিল না। তাই সরলাবালা দাসী, সুষমা সেন, প্রতিভা বসু, আশালতা সিংহ, শৈলবালা ঘোষজায়ার মতো নারী ঔপন্যাসিকের কলমে গোয়েন্দা গল্প লেখা হলেও এঁদের গোয়েন্দা চরিত্ররা অনিবার্যভাবেই পুরুষ। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের প্রথম মেয়ে গোয়েন্দার জন্মও এক নারীর হাতেই। নারীমুক্তি, নারী স্বাধীনতার যে ডাক সে দিন প্রভাবতী দেবী কৃষ্ণার কণ্ঠে ধ্বনিত করেছিলেন তারই অনুরণন পরবর্তীকালের মেয়ে গোয়েন্দাদের চিন্তায়-ভাবনায়-কর্মকুশলতায় প্রবাহিত।

তথ্যসূত্র

১. দেবী আশাপূর্ণা; *গল্পই কী অল্প ?* ; *মেয়েরা যখন গোয়েন্দা* ; সম্পা. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; নিউ স্ক্রিপ্ট; মার্চ, ২০১৯; কলকাতা; পৃ. ৩৯।

২. দেবী সরস্বতী প্রভাবতী; *গোয়েন্দা কৃষ্ণা* ; সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়; দেব সাহিত্য কুটীর; জানুয়ারি, ২০২০; কলকাতা; পৃ. ১৬।

৩. দেবী সরস্বতী প্রভাবতী; *গোয়েন্দা কৃষ্ণা* ; সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়; দেব সাহিত্য কুটীর; জানুয়ারি, ২০২০; কলকাতা; পৃ. ৩৫।

৪. দেবী সরস্বতী প্রভাবতী; *গোয়েন্দা কৃষ্ণা* ; সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়; দেব সাহিত্য কুটীর; জানুয়ারি, ২০২০; কলকাতা; পৃ. ১২৮।

৫. দেবী সরস্বতী প্রভাবতী; *গোয়েন্দা কৃষ্ণা* ; সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়; দেব সাহিত্য কুটীর; জানুয়ারি, ২০২০; কলকাতা; পৃ. ৩৯।

৬. দেবী সরস্বতী প্রভাবতী; *গোয়েন্দা কৃষ্ণা* ; সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়; দেব সাহিত্য কুটীর; জানুয়ারি, ২০২০; কলকাতা; পৃ. ৫৮।

৭. দেবী সরস্বতী প্রভাবতী; *গোয়েন্দা কৃষ্ণা* ; সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়; দেব সাহিত্য কুটীর; জানুয়ারি, ২০২০; কলকাতা; পৃ. ১১৩।

৮. দেবী সরস্বতী প্রভাবতী; *গোয়েন্দা কৃষ্ণা* ; সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়; দেব সাহিত্য কুটীর; জানুয়ারি, ২০২০; কলকাতা; পৃ. ১২২।

৯. দেবী সরস্বতী প্রভাবতী; *গোয়েন্দা কৃষ্ণা* ; সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়; দেব সাহিত্য কুটীর; জানুয়ারি, ২০২০; কলকাতা; পৃ. ১৮০।

১০. দেবী সরস্বতী প্রভাবতী; *গোয়েন্দা কৃষ্ণা* ; সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়; দেব সাহিত্য কুটীর; জানুয়ারি, ২০২০; কলকাতা; পৃ. ১৩৫।

১১. দেবী সরস্বতী প্রভাবতী; *গোয়েন্দা কৃষ্ণা* ; সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়; দেব সাহিত্য কুটীর; জানুয়ারি, ২০২০; কলকাতা; পৃ. ১৫০।

১২. দেবী সরস্বতী প্রভাবতী; *গোয়েন্দা কৃষ্ণা* ; সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়; দেব সাহিত্য কুটীর; জানুয়ারি, ২০২০; কলকাতা; পৃ. ১২২।

১৩. ঘোষ নির্মাল্যকুমার; *গোয়েন্দানীর সাতকাহন* ; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* ; বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা; সম্পা. তাপস ভৌমিক; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; কলকাতা; পৃ. ৭১।

১৪. ঘোষ সুদক্ষিণা; *মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা* ; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০০৮; কলকাতা; পৃ. ৭২।

১৫. ঘোষ সুদক্ষিণা; *মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা* ; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০০৮; কলকাতা; পৃ. ৭২।

১৬. ঘোষ সুদক্ষিণা; *মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা* ; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০০৮; কলকাতা; পৃ. ৭২।

১৭. দাশ নলিনী; *গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র (১ম খণ্ড)* ; নিউ স্ক্রিপ্ট; মার্চ, ২০১৯; কলকাতা; (ভূমিকা)।

১৮. দাশ নলিনী; *গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র (১ম খণ্ড)* ; নিউ স্ক্রিপ্ট; মার্চ, ২০১৯; কলকাতা; পৃ. ১৫৪।

১৯. দাশ নলিনী; *গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র (১ম খণ্ড)* ; নিউ স্ক্রিপ্ট; মার্চ, ২০১৯; কলকাতা; পৃ. ৮৫।

২০. দাশ নলিনী; *গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র (১ম খণ্ড)* ; নিউ স্ক্রিপ্ট; মার্চ, ২০১৯; কলকাতা; পৃ. ১৯৮।

২১. দাশ নলিনী; *গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র (১ম খণ্ড)* ; নিউ স্ক্রিপ্ট; মার্চ, ২০১৯; কলকাতা; পৃ. ১৩৮।

২২. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন; *গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র (১ম খণ্ড)* ; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০১৮; কলকাতা; পৃ. ২৪৩, ২৪৭।

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন; *গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র (১ম খণ্ড)* ; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০১৮; কলকাতা; পৃ. ২২৫।

২৪. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন; *গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র (১ম খণ্ড)* ; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০১৮; কলকাতা; পৃ. ৪৩৮।

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন; *গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র (৭ম খণ্ড)* ; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০১৯; কলকাতা; পৃ. ৮৮।

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন; *গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র (২য় খণ্ড)* ; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০১৮; কলকাতা; পৃ. ২৫।

২৭. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন; *গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র (৭ম খণ্ড)* ; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০১৯; কলকাতা; পৃ. ৪৪।

২৮. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন; *গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র (২য় খণ্ড)* ; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০১৮; কলকাতা; পৃ. ১৮৪।

২৯. সেন মনোজ; *রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র* ; বুক ফার্ম; নভেম্বর, ২০১৯; কলকাতা; (ভূমিকা)।

৩০. সেন মনোজ; *রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র* ; বুক ফার্ম; নভেম্বর, ২০১৯; কলকাতা; পৃ. ৩০।

৩১. সেন মনোজ; *রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র ১* ; বুক ফার্ম; নভেম্বর, ২০১৯; কলকাতা; পৃ. ৬৫।

৩২. সেন মনোজ; *রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র ১* ; বুক ফার্ম; নভেম্বর, ২০১৯; কলকাতা; পৃ. ৬৬।

৩৩. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *মিতিনমাসি সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; জুন, ২০০৩; কলকাতা; পৃ. ১২৫।

৩৪. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *মিতিনমাসি সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; জুন, ২০০৩; কলকাতা; পৃ. ৩৪২।

৩৫. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *মিতিনমাসি সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; জুন, ২০০৩; কলকাতা; পৃ. ১০৮।

৩৬. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *মিতিনমাসি সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; জুন, ২০০৩; কলকাতা; পৃ. ২১২।

৩৭. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *মিতিনমাসি সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; জুন, ২০০৩; কলকাতা; পৃ. ২৬১।

৩৮. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *মিতিনমাসি সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; জুন, ২০০৩; কলকাতা; পৃ. ২৭৩।

৩৯. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *মিতিনমাসি সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; জুন, ২০০৩; কলকাতা; পৃ. ১৭৬।

৪০. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *মিতিনমাসি সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; জুন, ২০০৩; কলকাতা; পৃ. ৬০৬।

৪১. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *মিতিনমাসি সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; জুন, ২০০৩; কলকাতা; পৃ. ১৩।

৪২. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *মিতিনমাসি সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; জুন, ২০০৩; কলকাতা; পৃ. ১৪।

৪৩. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *মিতিনমাসি সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; জুন, ২০০৩; কলকাতা; পৃ. ৪৮৪।

৪৪. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *মিতিনমাসি সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; জুন, ২০০৩; কলকাতা; পৃ. ৪৯।

৪৫. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *মিতিনমাসি সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; জুন, ২০০৩; কলকাতা; পৃ. ৭০৭।

৪৬. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *মিতিনমাসি সমগ্র ১* ; আনন্দ পাবলিশার্স; জুন, ২০০৩; কলকাতা; পৃ. ১০৪।

পঞ্চম অধ্যায়

পুলিশের কলমে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি

(*বাঁকাউল্লার দপ্তর, সেকালের দারোগা কাহিনি, দারোগার দপ্তর*)

গোয়েন্দা কাহিনিকে অনেক বিদগ্ধ মানুষই গুরুত্ব দিতে নারাজ। কারণ, তার অবাস্তবতা। সেখানে যেসব ঘটনা ঘটে তা অতিরঞ্জিত বলে অনেকে মনে করেন। সাহিত্যের গোয়েন্দাদের একটি 'লার্জার দ্যান লাইফ' ইমেজ আছে, যা গল্পগুলিকে স্বাভাবিকতা থেকে অনেক দূরে ঠেলে দেয়। বাস্তবে আদৌ এই ধরণের সাজানো অপরাধ ঘটে কী না, আর ঘটলেও তার তদন্ত বা অনুসন্ধানের পথ, সাহিত্যের পাতায় যেমন লেখা হয়, ততটা মসৃণ, একেবারে ধাপে ধাপে সব মিলে গিয়ে 'পোয়েটিক জাস্টিস' হয়ে যায় কী না, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। এই প্রসঙ্গে হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর *গোয়েন্দা গল্পের অল্পবিস্তর* প্রবন্ধে তিনি লিখছেন –

"গোয়েন্দা কাহিনি মানে অপরাধ জগতের কাহিনি। অপরাধের প্রবণতা বাসা বাঁধে মানুষের মনে কখন ? কিছু অপ্রাপ্তি, অন্যায় প্রত্যাশা, হিংসা, বঞ্চনা, প্রতিশোধস্পৃহা – এইসব প্রবণতা থেকেই তো। মানুষের মনের এই নিগূঢ় মনস্তত্ত্ব থেকে যেসব গল্পের জন্ম তাদের আমরা অসাহিত্যিক বলব কেন, অনৈতিক বলে ? নীতি অনুসারে জগৎটা চললে বড়োই ভালো হত, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, জীবনটা নৈতিক অনুশাসনের দৃষ্টান্ত হলে পৃথিবীর নব্বই ভাগ গল্প-উপন্যাস লেখাই হত না। কাজেই মনে একটা অপরাধ চিন্তার জন্ম হচ্ছে, তা পরিপক্ক হচ্ছে, নিজেকে পরিতৃপ্ত করার জন্য বিচিত্র পরিকল্পনার উদ্ভাবন ঘটাচ্ছে, আর তার ফেলে যাওয়া সূত্র থেকে একজন বুদ্ধিমান মানুষ ধীরে ধীরে তার পরিকল্পনাটা বুঝে ফেলে তার কুকীর্তিকে ধরে ফেলতে পারছেন – এই গোটা প্রক্রিয়াটার মধ্যে বুদ্ধির একটা খেলা নিশ্চই আছে, কিন্তু মানবমনের অন্ধকার দিকটাও তো আছে, তার অনেক পাওয়া-না-পাওয়ার দ্বন্দ্বও তো আছে। মানুষের গহন মনের ওইসব বৃত্তিগুলি নিয়ে রচিত গল্পগুলির কোনো সাহিত্যিক মূল্য নেই বলে যদি আমরা নাক সিঁটকোই তাহলে আধুনিক সাহিত্যের মনস্তত্ত্বনির্ভর মানসিকতাকেই তো অস্বীকার করা হবে। আমরা এ ব্যাপারেও আমাদের উন্নাসিকতার – যাঁর তা আছে অবশ্য, একটা সমঝোতা করব কিনা, ভেবেই দেখতে পারি।"[১]

সাহিত্য সমাজের দর্পণ, এ কথা আমরা সবাই জানি। শিল্প, সাহিত্যে যা প্রতিফলিত হয়, তা আমাদের এই সমাজ থেকেই উঠে আসে। গোয়েন্দা গল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। ডিটেকটিভ কাহিনির উৎস সন্ধানে উজান-পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় সমস্ত গবেষকই পৌঁছে যান *আরব্য রজনী* - তে বর্ণিত বাগদাদের খলিফা হারুন-অল-রশিদ এবং তাঁর উজির জাফর ইবন ইয়াহিয়ার তিনটি আপেলের গল্প কিংবা *বাইবেলের* কাহিনি *সুসানা অ্যান্ড দ্য এলডার্স* – এ দানিয়েলের ঘটনা থেকে। আর গবেষক যদি এ দেশীয় হন, তাহলে তাঁর পক্ষে *ঐতরেয় ব্রাহ্মণের* ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র, নারদ, বরুণ প্রভৃতি চরিত্র সম্বলিত রোহিত ও শুনঃশেপের কাহিনি কিংবা *তৈত্তিরীয় আরণ্যকের* অগ্নি এবং তার তিন ভাইয়ের গল্প বা কালিদাস, রাজা ভোজ এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের বিভিন্ন কাহিনি, যেমন বিদ্যাপতি রচিত *পুরুষ পরীক্ষা* বা অন্যান্য রচনার নাম উল্লেখ করা খুবই স্বাভাবিক। এছাড়াও, প্রাচীন গোয়েন্দা গল্পের উদাহরণ হিসেবে বুদ্ধদেবের পূর্বজন্ম বিষয়ক *জাতকের* কিছু কিছু কাহিনির উল্লেখ করে থাকেন। অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর বিখ্যাত গবেষণামূলক গ্রন্থ *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* – তে চমৎকারভাবে তুলে এনেছেন সেইসব প্রসঙ্গ।

সংস্কৃত নাটক *অভিজ্ঞান শকুন্তলমে* দরিদ্র জেলেকে সোনার আংটি বিক্রি করতে দেখে দুই প্রহরীর তাকে গ্রেপ্তার করা এবং এক রাজপুরুষের সেই আংটি শুঁকে মেছো গন্ধ পাওয়ার অনুষঙ্গকেও তিনি গোয়েন্দাগিরির সাথে তুলনা করেছেন। একই ধরণের বুদ্ধিদীপ্ত অনুসন্ধানের ঘটনার প্রসঙ্গ বাণভট্টের *হর্ষচরিত* – এও পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য *হিতোপদেশ* এবং *পঞ্চতন্ত্রের* ধর্মবুদ্ধি এবং পাপবুদ্ধির গল্পটিকেও একইভাবে তুলনা করা যায় রহস্যভেদের কাহিনির সঙ্গে।

অধ্যাপক সেনের গবেষণা থেকে আরও জানা যায়, পালি ভাষায় লিখিত লৌকিক কাহিনি সংগ্রহ *বৃহৎ কথামঞ্জরী* এবং পরবর্তী যুগে তার পরিবর্ধিত সংস্করণ *কথাসরিৎসাগর* – এ কয়েকটি অপরাধসংক্রান্ত গল্পও সংকলিত হয়েছিল। আবার উইলিয়াম কেরি সাহেব ১৮১২ - তে শ্রীরামপুর মিশন থেকে *ইতিহাসমালা* নামে যে বাংলা লোক-কাহিনির সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, সেখানেও কয়েকটি গোয়েন্দা কাহিনির মতো ছোট ছোট গল্পের উপস্থিতি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

❖

জানা যায়, ফ্রান্সে নেপোলিয়নের রাজত্বকালে প্রথম পুলিশি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছিল। সেই সময় প্রথম জীবনে সৈনিক ও পরে ছোটখাটো অপরাধে জেল খাটা আসামি ইউজিন ফ্রাঁসোয়া ভিদক (১৭৭৫-১৮৫৭) পরবর্তীকালে পুলিশের আধিকারিক হিসেবে তার কর্মজীবন শেষ করেন। এই কাজে তার অভিজ্ঞতার বিবরণ ১৮২৮ থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল একাধিক খন্ডে। অনুমান করা হয়, ভিদকের অভিজ্ঞতার কাহিনিগুলো তাঁর নিজের লেখা নয়। তাঁর মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে শুনে সেগুলি অনুলিখন করেছিলেন একাধিক লেখক। তাঁদের মধ্যে আলেকজান্ডার ডুমা, ভিক্টর হুগো, অনরে দ্য বালজাক, ইউজিন স্যু প্রমুখের মতো লেখকরাও থাকতে পারেন বলে অনেকে মনে করেন। কারণ, সেই সময় এই সাহিত্যিকরা ধীরে ধীরে পাদপ্রদীপের আলোয় আসছিলেন এবং তাঁরা সবাই ছিলেন ভিদকের কাহিনির বিশেষ অনুরাগী।

ভিদকের কাহিনিকে যদি ইওরোপের প্রাচীনতম ক্রাইম কাহিনি বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে বাংলার প্রাচীনতম ক্রাইমকাহিনি বলা যেতে পারে ঠগী দমনকারী পুলিশ কমিশনার কর্নেল শ্লীম্যান নিযুক্ত বাঙালি যুবক বাঁকাউল্লা বা বরকতউল্লার অভিজ্ঞতার সংকলনকে, যা *বাঁকাউল্লার দপ্তর* নামে পাঠকসমাজে পরিচিত।

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বাংলায় আধুনিক অর্থে গোয়েন্দা কাহিনি বা গোয়েন্দা গল্প লেখার সূত্রপাত। সাহিত্যের এই ধারা পাঠকমহলে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়, কাজেই তার জোগানেরও ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যেতে থাকে। বাংলা গোয়েন্দা গল্পের একেবারে গোড়ার দিকের কাহিনি সরকারি পুলিশের বা ফাঁড়ি দারোগার। কাজেই, সেখানে কল্পনার অবকাশ কম। পুলিশ কর্মচারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এইসব কাহিনিগুলি লিখেছিলেন। এইধরনের লেখাগুলির মধ্যে পড়বে *বাঁকাউল্লার দপ্তর, সেকালের দারোগার কাহিনি, দারোগার দপ্তর* ইত্যাদি। তৎকালীন সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে অপরাধের সাত-সতেরো চিত্র স্পষ্টভাবে ধরা আছে এইসব রচনায়। আছে সেইসব অপরাধের তত্ত্ব – তালাশ। কিছু দৃষ্টান্তমূলক উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক।

❖

বাঁকাউল্লার দপ্তর - এর *হাতকাটা হরিশ* গল্পে হরিশ ওরফে ভানু নামের একটি শিক্ষিত দরিদ্র যুবক প্রেমজ বিবাহে অসফল ও অপমানিত হয়ে কীভাবে শেষ পর্যন্ত চার-চারটি খুন করে, আজকের ভাষায় সিরিয়াল কিলার-এ পরিণত হয়, সেই কাহিনি ধরা আছে। দারোগা সাহেবের বিচক্ষণতা এবং তৎপরতায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর সেই যুবক তার দোষ স্বীকার করে নেয় -

"আমি (হরিশ) সেই সময় রামতারকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম, - রামতারক খোরাক পোষাক দিতেন – তাঁহার কয়েক কার্যই আমি করিতাম, যত্ন পাইতাম। রামতারক হাতে-কলমে তেমন পোক্ত ছিলেন না, সেই জন্যেই আমার আদর ছিল। মা-ঠাকুরানিও যত্নশ্রদ্ধা করিতেন। তখন বাড়ির ছেলের মতই ছিলাম। শশী তখন তের বছরের। বরের অনুসন্ধান হইতেছে, মনের মত তেমন বর মিলিতেছে না; - বিবাহে বিলম্ব হইতেছে। শশী আমাকে বড় ভালবাসিত, আমিও তদধিক বাসিতাম। দুজনে বিরলে বসিয়া অনেক কথাই কহিতাম; দুইজনেরই অভিপ্রায়, আমাদের দুজনে বিবাহ হইলে বড় সুখের হয়। মনের বিবাহ হইয়াছিল, কেবল মন্ত্রবিবাহ মাত্র বাকী। রাম সরকার, রামতারক বাবুর পেয়ারের খানসামা ছিল, তাহাকে দিয়া আমার ইচ্ছা বাবুকে জানাইয়াছিলাম, শশীও ভাবে ভঙ্গিতে মাতাঠাকুরানিকে জানাইয়াছিল; কর্তা গৃহিনীতে কথোপকথনও হইয়াছিল, ফল হয় নাই। আমি নির্ধন, আমি স্বজনসহায়হীন, আমি ছোট বামন, - তাঁহার আশ্রিত প্রতিপালিত, আমার মুখে এত বড় কথা ? কর্তা ক্রুদ্ধ হইলেন; বাসা হইতে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। প্রাণে বড় ব্যথা বাজিল; কষ্ট হইল।

...যে আমার সাধে বাদ সাধিয়াছে; যাহার কঠিন পদাঘাতে আমার গঠিত-অট্টালিকা ভাঙিয়া গিয়াছে, যাহার অনুমতিতে আমাদের সুখের জীবন দুর্বিসহ হইয়াছে; তাহাকে কন্যা সুখে সুখী হইতে দিব না ? আমি যেমন ভাল বাসিয়া হতাশ হইয়াছি, সে ভালবাসা আর কাহাকেও বাসিতে দিব না; তেমন ভালবাসাও কাহাকেও দিব না। রামতারকের বংশে ত কিছুতেই নহে। ইহাই জীবনের ব্রত হইল।

...ফল কথা, রামরূপ, বিধুমুখী, সুধামুখী ও শশিমুখী, এই চারি খুনের আমিই আসামি। আমিই ভানু। বাল্যকালে ওই নামই আমার ছিল। শশী কেবল সে নাম জানিত; সেই নামেই আমি পত্র লিখিয়াছিলাম। শশী, বাল্যপ্রেম কখনও ভুলে নাই; সে দেখা দিতে আসিয়াছিল, দেখা হইয়াছিল। কিন্তু আমার সহিত যাইতে গররাজি হয় – সহসা ক্রোধ হইল, তাহাকে আর ফিরিতে দিই নাই – ধর্মরাজ ভবনে পাঠাইয়া দিয়া তাহার ধর্মরক্ষা করিয়াছি।"[২]

কতদূর কষ্ট স্বীকার করে, অনাহারে কয়েক ঘন্টা কাটিয়েও কতটা বিচক্ষণতার সঙ্গে বাঁকাউল্লা সাহেব একবার এক নথিপত্র-দলিল জালিয়াতকে ধরেছিলেন, সে কাহিনির বর্ণনা আছে *নবীন নবেসেন্ধা* নামক কাহিনিতে –

"নিয়মিত সময়ে, - সে সময় রাত্রি দেড় প্রহরের পর, - সেই দেড় প্রহর রাত্রির পরে নবেসেন্ধা ধীরে ধীরে সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইল, সঙ্গের তিন চারিটি লোক আজও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল। আমিও নিঃশব্দে সেই ছিটেবেড়া ফাঁক করিয়া বাহির হইলাম। প্রাচীর টপ্‌কাইয়া সদর রাস্তায় পড়িলাম। খুব দূরে থাকিয়া নবেসেন্ধার পাছু লইলাম।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে নবেসেন্ধার বাগানবাড়ি। প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, বাগানের মধ্যে একখানি আটচালা ঘর। দরজায় একটি লোক – সে প্রহরী। বাগানের চারিধারে ঘন কাঁটার বেড়া। মানুষ কি কথা, মাছিটিও অক্ষত দেহে প্রবেশ করিতে পারে না ! তবে এখন করি কি ? থানায় এখন খবর দেওয়া চলে না। নবেসেন্ধা এই বাগানে প্রবেশ করিয়াছে, নিত্য নিত্যই প্রবেশ করে; কিন্তু কি জন্য ? বাগানে আসিয়া জালজুয়াচুরিও করিতে পারে, সাধনভজনও ত করিতে পারে ? চাক্ষুষ না দেখিয়া কি প্রকারে সংবাদ দিব ? উদ্যান প্রবেশের পথানুসন্ধান করিতে লাগিলাম। বাগানটা একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম, চারিদিকেই বেড়া। উত্তরদিকের একটি নারিকেল গাছের মাথা, বেড়ার উপরে আসিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, গাছটি ঝড়ে পড়া। একটা ছোট ঝোপের উপর খুব সাবধানে উঠিয়া, সেই নারিকেলের একটা লম্বিত বাল্‌দেয় ভর করিয়া ঝুলিয়া ঝুলিয়া অতি কষ্টে বাগানে প্রবেশ করিলাম। পা টিপিয়া টিপিয়া আটচালার নিকট আসিলাম। দরজা জানালা ভিতর হইতে বন্ধ, তবে ফাঁক দিয়া আলো আসিতেছে; ধীরে ধীরে একটা জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম ! ভিতরের লোক যে চেতন – কোনও কার্য করিতেছে, তাহা বেশ বুঝিতেছি, তবে কার্যকারীরা নীরব। অনেকক্ষণ পরে নবেসেন্ধার আওয়াজ পাইলাম। একটু কড়াসুরে বলিল, 'ছাই হইয়াছে – তোমার মাথা হইয়াছে; প, ব, ন,জ এ সকল কিছুই হয় নাই – আসলের সঙ্গে আদৌ মিলে নাই। সব বাতিল।' হাঁ, ভিতরে জাল চলিতেছে।"[৩]

সেবারের চেষ্টায় নবেসেন্ধা ফাঁক গলে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার আরও আঁটঘাট বেঁধে একটি যন্ত্রপাতির বাক্সসহ নবীন নবেসেন্ধাকে আটক করেন বাঁকাউল্লা দারোগা। সেই বাক্সের মধ্যে ছিল – একতাড়া কলম, তিন-চারটি ছোটবড় ছুরি, দুইখানা কাঁচি, সাত-আট রকমের কালির দোয়াত, একটা শিশিতে জাফরান গোলা, খানিকটা গন্ধক, বালির পুঁটুলি, চা-খড়ি, দাগকাটা রুল, নানান রকম রসিদ, পাট্টা, কাগজ, দাখিলা, হুকুমনামা ইত্যাদি – এই সব জালিয়াতির উপকরণ !!

সেকালের দারোগার কাহিনী পড়লে জানা যায় দারোগা গিরিশচন্দ্র বসু ১৮৫৩ থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ নবদ্বীপ-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর অঞ্চলে পুলিশের দারোগা ছিলেন। শৈশবে তিনি তাঁর মাতুলের আশ্রিত ছিলেন। তাঁর মাতুল সেই সময় কৃষ্ণনগর জেলায় একজন উচ্চ শ্রেণির সরকারি চাকুরে হিসেবে কর্মরত। তিনি প্রতি বছর পুজোর সময় দেশে যেতেন, লেখকও মাতুলের সাথে বাড়ি ফিরতেন। দস্যুর ভয়ে লেখকের মাতুল সেই অঞ্চলের কয়েকজন সুশিক্ষিত লাঠিয়ালকে সঙ্গে রাখতেন। লেখক তখন বালক, এই যাত্রাপথে সেই বালকের সাথে লেঠেল সর্দারদের গল্প হত। এবং তারা সেই বালককে অল্প বয়সী দেখে নিঃসঙ্কোচে কে কি ভাবে ডাকাতি ও লাঠিয়ালি করেছে, সেই সব বর্ণনা করত। প্রায় চার-পাঁচ বছর ক্রমান্বয়ে যাতায়াতের পথে এই কাহিনি-বর্ণনা লেখক শুনেছিলেন। গিরিশচন্দ্র বসু লিখছেন –

"তখন কে জানিত, যে অল্প কালের মধ্যে আমি নবদ্বীপের দারোগা হইয়া তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে বসিব। তাহারাই যে গ্রাম্য চৌকীদার ছিল, তাহাও সে সময়ে আমি জানিতাম না, পরে শুনিলাম, যে অধিক বেতনের লোভে তাহারা থানা হইতে বিদায় লইয়া আমাদের সঙ্গে যাইত।"[৪]

সেকালের ডাকাতি যে কত ভয়ঙ্কর ছিল, সে বর্ণনাও পাওয়া যায় গিরিশচন্দ্র বসুর লেখা ভূমিকায়। আবার গিরিশচন্দ্র বসুর ঐ ভূমিকা পড়েই জানতে পারি, এর বিপরীত চিত্রও ছিল, যেখানে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে দলবদ্ধভাবে ডাকাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, এবং তাদের প্রতিহত করেছে।

❖

গিরিশচন্দ্র বসুর লেখা থেকে আরও জানা যায়, সেই সময় কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ এইসব জায়গায় শুধু স্থলপথেই নয়, নদীপথেও ডাকাতির চল ছিল। রেলের রাস্তা এবং কলের জাহাজ না থাকাতে, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সমস্ত পন্যদ্রব্য নৌকায় কলকাতায় আসত। ভাগীরথী, জলঙ্গী ও মাথাভাঙা – এই তিন নদীর পারে পারে বহু

হাট-বাজার ও গঞ্জ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইসব স্থানে যাত্রী ও নাবিকদের কাছ থেকে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র ও খাদ্যসামগ্রী খুব সহজেই লুঠ করা চলত। তবে, এই জলপন্থী দস্যু বা ঠগীর অদ্ভুত কৌশলের কথা এবং ততোধিক চতুরতার সাথে সেই ঠগীকে হাতে নাতে ধরার কাহিনি শুনিয়েছেন দারোগা বাঁকাউল্লা, তাঁর *গহনাভোজী কুমীর* নামক দপ্তরে। দারোগা সাহেবের প্রাঞ্জল বর্ণনায় সেই কাহিনি আরও চমৎকার হয়ে উঠেছে।

একবার এক গ্রামে রটে গেল, সেখানকার নদীতে নাকি এক গহনাভোজী কুমির এসেছে। গহনাভোজী, কারণ সে শুধু গহনাই খায়। গ্রামের যেসব অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে-বৌরা নদীতে স্নান করতে যায়, তাদের কে যেন জলের ভেতর টেনে নিয়ে যায়। পরে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার হয় অনেক দূরে। সেই মৃতদেহে কোন আঘাতের চিহ্ন থাকে না, শুধু তার গহনাগুলি লোপাট হয়ে যায়। সেই থেকে গ্রামের মানুষের ধারণা – এ কুমির গহনাভোজী। বাঁকাউল্লা সাহেব এরকম একটি মৃতদেহ দেখে বুঝলেন, এ কোন জীবের কান্ড নয়, মানুষের কুকীর্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই কাহিনিতে সেই সময়ে যে পুলিশ বিভাগে মেয়েরাও নিযুক্ত ছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায়। জল ডাকাতের ডাকাতির পদ্ধতিটি এমন চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক, যে উদ্ধৃত না করে পারছি না -

"শেষে স্থির করিলাম, কুমীরটাকে ধরিতে হইবে। কুমীর ধরিবার চার চাই। কুমীরটা বড় গহনা ভালবাসে; সুতরাং সেই রকম চার চাই। সেই ব্যবস্থাই করিলাম।

...কিছু কম একমাস পরে, তিনটি গহনা পরা মেয়ে গোয়েন্দা লইয়া বজরা করিয়া জলঙ্গী বহিয়া চলিলাম।

...বিবিজান বড় বুদ্ধিমতী। সুন্দরীও বটে। যেবার রাঢ়ে আকাল হয়, সেই মন্বন্তরের সময় পোপ সাহেব, বিবিজানকে পথে কুড়াইয়া পান। সে তখন সাত আট বছরের। মেয়েটিকে দেখিয়া সাহেবের দয়া হয়, রক্ষণভার লন। সে এখন উনিশ কুড়ি বছরের হইয়াছে। পোপ সাহেব আমাদের এই গোয়েন্দা পুলিশেরই একজন আধারের সহিত বিবিজানের বিবাহ দিয়াছেন। স্ত্রীপুরুষেই তাহারা গোয়েন্দা – কার্যে নিযুক্ত আছে।

...সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই। সূর্য্যদেব পাটে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, সকলেই গহনাভোজী কুমীরের গতাগতি লক্ষ করিয়া বসিয়া আছি। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন পুড়িয়া পুড়িয়া লাল হইয়া উঠিয়াছেন, তাই জলঙ্গীর জলে ডুবিয়া শীতল হইতেছেন। জলঙ্গীর জল লালে লাল হইয়া উঠিয়াছে। সেই লাল জলে – খুব দূরে কালো কি একটা বস্তু যেন ভাসিয়া আসিতেছে। লক্ষ করিলাম। বস্তু ক্রমেই নিকটবর্তী হইতে লাগিল। তোবা – এ যে একটা কেলে হাঁড়ি।

...হাঁড়িটা কিন্তু উপুড় হইয়া ভাসিতেছে। কুমীর যখন মুখ ভাসান দেয়, তখন একখানা কালো ঘুঁটের মত দেখায়। এটা তাহা হইতে একটু ডাগর। গহনাভোজী কুমীরের মাথা ত নয় ! আবার লক্ষ করিয়া থাকিলাম।

...নদী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বহিয়া চলিয়াছে। স্রোতও সুতরাং উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে। কালো পদার্থটা কিন্তু উজান আসিতেছে। তবে নিশ্চয়ই এ গহনাভোজী কুমীরের মাথা ! জালুকদিগকে ইঙ্গিত করিলাম।

...গহনাভোজী কুমীর গেরেপ্তার হইল। নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য দুইটি ছিদ্রবিশিষ্ট একটি কেলে হাঁড়ি মাথায় – একটা কালো মুস্কো জওয়ান। জওয়ানটার কোমরে শিকল বাঁধা। বুঝলাম, এইরূপ হাঁড়ি মাথায় দিয়া ইহারা নৌকায় আড়ে আড়ে আসিয়া, গহনাপরা মেয়েমানুষের পায়ে এই শিকল বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যায় এবং গহনাগুলি খুলিয়া লইয়া লাশ ফেলিয়া দেয়।”[৫]

❖

সেকালের দারোগা কাহিনী – তে গিরিশচন্দ্র বসু লিখছেন আরেক জল ডাকাত মনোহরের কাহিনি লিখেছেন। এই মনোহর ও তার শাকরেদ গোপাল পোদ্দারের বাড়ি থেকে চোরাই বস্তু উদ্ধার করার ঘটনাটিও কম রোমহর্ষক নয়। কয়েক পৃষ্ঠা পরেই সেই বর্ণনা দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র বসু। সত্যি ভাবা যায় না, পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে ফিক্‌শনাল বা লেখকের কল্পনাপ্রসূত গোয়েন্দা কাহিনিগুলিতে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা ইত্যাদি ব্যাপারে যে ধরনের কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখা গেছে, আজ থেকে প্রায় একশো তিরিশ বছর আগে বাংলার ডাকাতেরা সেসব কৌশল কার্যকরী করে ফেলেছে। এবং অবশ্যই, বাংলার দারোগারা সেগুলির রহস্যভেদ করে চোরাই দ্রব্য উদ্ধারও করেছে !

“সেই ঘরে ঐ এক দ্বার ভিন্ন অন্য দ্বার কিম্বা বাতায়ন ছিল না ঘরটি সম্পূর্ণ অন্ধকার। আমাদের হস্তে প্রদীপ না থাকিলে বোধ করি তাহার মধ্যস্থিত দ্রব্যাদি ভালরূপে দেখিতে পাইতাম না। প্রদীপের আলোতে দেখিলাম যে এক প্রাচীরের গায়ে কয়েকখানা তক্তা হেলাইয়া রাখা হইয়াছে। আমরা দুইজনে সেই তক্তার নিকট দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলাম। ছিরু অন্যমনস্কে তাহার হস্তের শড়কির মাথা একস্থানে দুই

তক্তার মধ্যস্থিত ছিদ্রের ভিতর চালাইয়া দেওয়াতে তাহা কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া একটা দ্রব্যে ঠেকিয়া ঝন্ করিয়া উঠিল। ছিরু অমনি আমার হস্তে প্রদীপ দিয়া, একখানা তক্তা টানিয়া অপসারিত করিল এবং তাহার মধ্যে তক্তার দ্বারা আচ্ছাদিত কয়েকটা বস্তা উপুর্যপরি সাজান রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। আমরা তৎক্ষণাৎ উভয়ে আহ্লাদভরে "পেয়েছি, পেয়েছি" বলিয়ে চীৎকার করিতে লাগিলাম।"[৬]

❖

সেকালের নীলকুঠি সম্বন্ধেও আমাদের জানিয়েছেন গিরিশচন্দ্র বসু। সমাজ-ইতিহাসের এও এক জীবন্ত দলিল।

"সেকালে যেমন আদালতে ফৌজদারির এবং গবর্ণমেন্টের অন্যান্য কাছারীর কর্ত্তা সাহেবদিগের এক একজন দেওয়ান ছিলেন, নীলকর সাহেবদিগের প্রত্যেক কুঠীতে এবং কনসারণে সেইরূপ দেওয়ান ছিল। ইহারাই সাহেবদিগের দক্ষিণ হস্ত ছিল। সাহেবরা নিজে কেবল নীল প্রস্তুতের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, দেওয়ানজির হস্তে জমিদারী শাসনের সম্পূর্ণ ভার অর্পিত থাকিত। তদ্ভিন্ন কুঠীর সমুদয় খরচপত্র দেওয়ানের হস্ত দিয়া হইত এবং জমিদারী এবং তালুক সমস্তের আদায় তহশীলও ইহারা করিত। ফলিতার্থে নীলকুঠীর দেওয়ানের হস্তে অনেক ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। কুঠীর যাবতীয় মামলা মোকদ্দমা ইহাদিগের উপস্থিত করিতে এবং চালাইতে হইত। যখন কাহারও সহিত কোন বিবাদ কিম্বা দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতে আবশ্যক হইত, তাহার সমস্ত আয়োজনের ভার দেওয়ানের উপরে পড়িত এবং কুঠীর অপরাধে ইহাদেরই জেলখানায় যাইতে হইত। ইহাদের প্রকৃত খ্যাতি গোমস্তা ছিল, কিন্তু লোকে সম্মান করিয়া দেওয়ানজি বলিয়া ডাকিত। দৌরাত্ম, অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরাচরণের নিমিত্ত নীলকর সাহেবদিগের যে দুর্নাম আছে তাহার অধিকাংশের জন্য তাঁহাদের দেশীয় কর্ম্মচারীরা দায়ী। ...কারণ কুঠীর দ্বারা এমন অনেক দুষ্কার্য্য হইত, যাহা সাহেবরা কখনও জানিতে কিম্বা শুনিতে পাইতেন না। সকল সাহেবে এদেশের সকল অবস্থা জানিতেন না, তাঁহাদের দেশীয় কর্ম্মচারীরা ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইয়া বিভীষণের ন্যায় ভিতরের কথা জ্ঞাত করাইয়া যেরূপে কার্য্য করিলে সাহেবের উপকার হইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিত। ইহার কারণ যদি শুদ্ধ নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তি হইত, তাহা হইলে তাহাদের নিন্দার কথা না হইয়া বরং প্রশংসার বিষয় হইত। কিন্তু তাহা নহে, কারণ ইহাতে তাহাদের বিলক্ষণ লাভের অঙ্ক ছিল। কুঠীর অধিকারের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে আমলাদিগের বেতন এবং উপরি রোজগার বাড়িয়া যাইত এবং সাহেবের প্রভুত্ব যতই বদ্ধমূল হইত, ততই তাহাদের ক্ষমতাবৃদ্ধি হইত। নীলকর সাহেবকে তাহার

গোমস্তা এক বিষয়ে দুই পয়সার লাভ দেখাইয়া দিতে পারিলে, সে অনায়াসে অন্যদিকে নিজে চারি পয়সা রোজগার করিতে পারিত। আমলার দৌরাত্ম্যের বিষয় সাহেবের নিকট প্রতিবাদ উপস্থিত হইলে, আমলা সাহেবকে এক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিরস্ত করিত, যে, - প্রজা কিম্বা বাহিরের লোকের সঙ্গে এইরূপে ব্যবহার না করিলে কুঠীর প্রভুত্ব থাকে না এবং সাহেবকে কেহ ভয় করিবে না।"[৭]

এ তো গেল দেওয়ানের প্রসঙ্গ। কিন্তু নীলকর সাহেবের ব্যাপারে গিরিশচন্দ্র বসুর যে অভিজ্ঞতা, সর্বত্রই চিত্রটা কী সেরকমই ছিল ? ছিল না যে, তার দৃষ্টান্ত রইল নিচে। নীলকর সাহেবের এই অত্যাচারের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের কলমে, *দারোগার দপ্তর* – এর কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩০৭ সালে প্রকাশিত, *কুঠিয়াল সাহেব ! (অর্থাৎ সেকেলে নীলকর সাহেবের ভীষণ-অত্যাচার কাহিনী !)* নামক কাহিনিতে।

যে সকল প্রজা জরীপ জবান বন্দীতে নীলকর সাহেবের বশ্যতাস্বীকার করত না, তাহাদিগের ভদ্রাসন বাড়ীর চতুর্দ্দিকে যে সকল জমি ছিল, তাহা "লোকসান" জমি অর্থাৎ জমীদারের নিজের জমির মধ্যে পরিগণিত করে, তাহাতে নীলকরগণ নীলের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হতো। ঐ সকল জমিতে নীল উৎপন্ন করা উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য যাদের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঐ সকল নীল রোপিত হইয়াছে, তাদেরকে বিশেষ রূপে কষ্ট দেওয়া। পল্লী গ্রামের প্রজামাত্রই দুই চারিটি গরু বাছুর নিয়ে বাস করে। তাদেরকে সদাসর্ব্বদা আবদ্ধ করে রাখা একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং, ঐ সকল গরু বাছুরের মধ্যে কোন ভাবে যদি একটি আসিয়া ঐ নীলের জমিতে উপস্থিত হত, তখন সেটাকে ধরে পাউণ্ডে প্রেরণ করা হত; এছাড়াও, যার গরু তার নামে নীলের ক্ষতি করার অপরাধে আদালতে নালিস রুজু করা হত। ধনবান সাহেব ফরিয়াদী, এদেশীয় গরীব প্রজা আসামী; সুতরাং, মোকদ্দমার প্রায়ই প্রজাগণকে পরাজিত হতে হত, ও ক্রমে অনেক টাকার দায়ভার তাদের ওপরে এসে পড়ত। তখন অনন্যোপায় হইয়া তাদেরকে নীলকর সাহেবদের শরণাগত হতেই হতো।

যে সব প্রজা নীলকরগণের বশ্যতাস্বীকার করিতে কিছুতেই সম্মত হত না, তাদেরকে বশীভূত করবার জন্য নীলকররা আরও এক ভয়ানক উপায় বাহির করতেন। তারা যেমন দেখতেন যে, প্রজাগণ তাদের নিজের জমিতে ভালভাবে চাষ করে ধানের বীজ ব্যপন করেছে, তার পর দিনই নীলকর কর্ম্মচারীগণ অনেক লাঙল গরু, লোকজন ও লাঠিয়াল

প্রভৃতি সংগ্রহ করে, সেইখানে উপস্থিত হত ও সেই সকল ধান বোনা জমির উপর পুনরায় একখানি চাষ দিয়ে নীলের বীজ ব্যপন করে সেই স্থান থেকে প্রস্থান করত। ওদিকে আগেই বিচারালয়ে উপস্থিত হয়ে যারা আগেই ধান ব্যপন করেছিল, তাদের নামে মিথ্যা এক নালিস এই মর্ম্মে উপস্থিত করতেন, যে, তাদের নীল বোনা জমি ভেঙে প্রজাগণ তাতে ধান ব্যপন করেছে। বিচারের সময় ঐ জমিতে নীল ও ধান্য উভয় প্রকার শস্যের চারা বের হয়ে পড়িত। বিচারেও বিনা জোগাড়ে ও বিনা অর্থব্যয়ে প্রজাগণ হেরে গিয়ে নীলকরদের কাছে খেসারত প্রভৃতিতে অনেক টাকার দায়ী হইয়া পড়ত। এছাড়াও অন্যায় করার অপরাধে বিনা দোষে অনেককে জেলে পর্য্যন্ত যেতে হতো। এইসব কারণে অনন্যোপায় হয়ে, পরিশেষে সেই সমস্ত প্রজাদেরকেও নীলকরদের বশ্যতা স্বীকার করে নীলের সাটা গ্রহণ ও তাদের ইচ্ছামত নীল বুনানি করতে হত।

এই সব উপায়েও যারা বশ্যতাস্বীকার করত না, তাদের উপর আরও অতিশয় ভয়ানক ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হত। প্রগাঢ় অন্ধকার রাত্রির মধ্যে কারও ঘরে ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলে উঠত। দেখতে দেখতে তার যথাসর্ব্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে যেত। কারও ঘর থেকে সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যেত, কিন্তু কোথায় যে তারা যেত, তা কেউই বলতে পারত না। কিন্তু নীলের সাটা গ্রহণ করবার পরই কোথা থেকে তারা আবার ফিরে আসত। যার যতগুলি গরু আছে, তার প্রত্যেকগুলি প্রায় প্রত্যেকদিন পাউণ্ডে যেত। পাউণ্ডের জরিমানা দিতে অনেক প্রজাকে অনেক গরু বিক্রি করে দিতে হতো। তার উপর পাউণ্ডে দেওয়ার সময় সেই সকল গরু ছিনিয়ে নিয়েছে, প্রজাদের উপর এইরকম নালিস প্রায়ই ফৌজদারীতে উপস্থিত হত; প্রমাণও হয়ে যেত। প্রজারা জরিমানা দিয়ে ও জেল খেটে পরিশেষে নীলকরদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হতো।

❖

সেকালের গোয়েন্দা গল্প বইটির ভূমিকায় সম্পাদক অরিন্দম দাশগুপ্ত লিখছেন –

"বাংলায় অপরাধ সাহিত্য সৃষ্টির আগে অপরাধ সংক্রান্ত লেখাপত্র মানেই ছিল কেচ্ছা-কাহিনি। সেইসব অপরাধ আর তার সঙ্গে পুলিশের চাকরি জীবনের নানা অভিজ্ঞতার একটা সুসংহত এবং মার্জিত রূপ প্রকাশ পেল প্রিয়নাথ দারোগার মতো লেখকের রচনায়। শুধু সমাজের কেচ্ছা বা খেউড় নয়, দারোগার বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ হল অপরাধ, অপরাধী, অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাদের চিহ্নিত করা আর সর্বোপরি ঔপনিবেশিক আইন মোতাবেক তাদের শাস্তি বিধান। পুলিশের এই নতুন চেহারা বাঙালি পাঠক সাদরে গ্রহণ করল। আসলে সেই সময়ের বাস্তব পরিস্থিতির প্রিতিফলন বা আধুনিক সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে বলা হয় অন্তর্তদন্ত, তারই প্রতিফলন ঘটেছিল এই কাহিনিগুলিতে। কেমন ছিল বিশ শতকের গোড়ায় নগর কলকাতার হাল ! একের পর এক আদমশুমারি সেই তথ্যই সামনে হাজির করত। আর সংবাদ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তার বিচার বিশ্লেষণ নিয়ে পড়ে যেত হইচই।"[৮]

প্রেম, প্রণয় ইত্যাদি কোমলাঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতীত শুধুমাত্র রহস্যগল্প যে ধারাবাহিকভাবে বেরোতে পারে এ ভাবনা সম্ভবত লেখক, কার্য্যাধ্যক্ষ কারোরই ছিল না। বাংলা সাহিত্যের পাঠক যে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে গোয়েন্দা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনও জানা গেছে, কেউ কেউ বলেছেন, *দারোগার দপ্তর* পাঠ করে পুলিশ কর্মচারী, চুরি, জুয়াচুরি ধরার কৌশল শিখে থাকেন। চোর, জুয়াচোররা তাদের উদ্ভাবিত উপায় কৌশল যাতে ধরা না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক হয়। এও শোনা গেছে, অনেক পল্লীগ্রামের পাঠক *দারোগার দপ্তরে* প্রকাশিত চুরি, জুয়াচুরির কৌশল সম্বন্ধে জেনে সতর্ক ও সাবধান হয়ে অনেক সময় জুয়াচোরের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন।

'অনুসন্ধান সমিতি'-র পাক্ষিক মুখপত্র হিসাবে ১২৯৪ বঙ্গসনে কলকাতা থেকে *অনুসন্ধান* পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। পত্রিকা প্রকাশের কারণ সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লেখেন

"এই জুয়াচুরী প্লাবিত দেশে নানারকম জুয়াচুরী হইতে দেশের লোককে সতর্ক করাই এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য।"[৯]

কিন্তু পাঁচ বছর এই মর্মে চলার পর পত্রিকাটি তার ঘোষিত লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি বিষয়ক পত্রিকায় পরিণত হয়। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা থেকে

প্রিয়নাথ ছিলেন লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসতে চলেছে বুঝতে পেরেই সম্ভবত তিনি চালু করেন স্বতন্ত্র মাসিক প্রকাশনা *দারোগার দপ্তর*।

প্রিয়নাথের লেখা সেদিনের পাঠক সমাজ কীভাবে গ্রহণ করেছিল, তারই দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যাক –

অনুসন্ধান, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৪

ডিটেক্‌টিভ পুলিশ। - বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রিয়নাথ বাবু ডিটেক্‌টিভ পুলিশের সব ইন্‌স্পেক্টর; তিনি আপন কার্য্যকালে এক হতভাগ্য 'ডাক্তার বাবুর' পাপ-জীবনের যে সকল ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর চিত্র দেখিয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে লিখিত আছে। 'ডাক্তার বাবুর' জীবন বড়ই বিভীষিকাময়; 'ডাক্তার বাবুর' পাশ করা হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সকল ভাগই জাল-জুয়াচুরীতে পূর্ণ, - ইহার মধ্যে তিনি আবার চার-চারিটী নরহত্যাও করিয়াছেন। অধিক কি, ডাক্তার বাবু পরিতাপ-কালে নিজেই বলিয়াছেন, - "যে যে মহাপাপের সংঘটন করিয়াছি, তাহা অন্যের করা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও কেহ ভাবিতে পারে না।" ইউরোপ প্রভৃতি সভ্য দেশে গোয়েন্দা পুলিশের সন্ধানাদি সর্ব্বদাই প্রকাশ হয়; এই জন্যই সকলে সে সকল বিষয় জানিতে পারে। এ দেশে গবর্ণমেন্ট হইতে সে প্রথা না থাকিলেও, তাহা প্রকাশে প্রিয়নাথ বাবু অবশ্যই সাধারণের ধন্যবাদ পাইবেন।[১০]

এর ঠিক একবছর পরে, ৩১শে চৈত্র ১২৯৫ সালে *অনুসন্ধান* তার পাঠকের দরবারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে আরও একটি সংবাদ পেশ করল –

সংবাদ।

ডিটেকটিভ পুলিশের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম 'অনুসন্ধানের' পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও অজানিত নাই। 'অনুসন্ধানের' প্রতি সংখ্যাতেই প্রায় পাঠকগণ তাঁহার রচিত সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু তাঁহার প্রণীত "পাহাড়ে মেয়ে বা পাপীর আত্মকথা", "ডিটেকটিভ পুলিস ১ম ও ২য় কান্ড" প্রভৃতি পুস্তকও আজকাল 'অনুসন্ধানের' অধিকাংশ পাঠককেই পরিতৃপ্ত করিতেছে। এতদ্ভিন্ন, ঈশ্বর কৃপায় এবার আবার তাঁহার নাম সর্ব্বত্রে প্রচারিত হইতে চলিল। হিলি ও ওয়ার্ণার নামক দুইজন ইংরাজ ডাকাইত জেল হইতে পলায়ন করে; সম্প্রতি প্রিয়নাথ বাবু বহু অনুসন্ধানে, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছেন। তজ্জন্য গভর্ণমেন্টে তাঁহার বড়োই

খোসনাম হইয়াছে; তিনি পারিতোষিক পাইয়াছেন। এবং দেশের লোকেও জানিয়া বিস্মিত হইয়াছেন যে, এমন বাঙ্গালী এখন পর্য্যন্তও এ-দেশে আছেন, যিনি দুই-দুইজন ইংরাজ ডাকাইতকে বিনা অস্ত্রে-সস্ত্রে ধরিয়া আনিতে পারেন। যাইহোক, প্রিয়নাথ বাবুর দিন দিন পদোন্নতি হউক, ঈশ্বর-সমীপে আমাদের এই প্রার্থনা।[১১]

১৩১০ বঙ্গাব্দের *প্রবাসী* পত্রিকায় ১৯০১ সালের সেনসাসের প্রতিক্রয়া হিসাবে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, সেই 'কলকাতা লোকসংখ্যা' থেকে নির্বাচিত একটা অংশ নিচে দেওয়া হল –

"কলিকাতায় পুরুষের সংখ্যার তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এখানে ৬২৪৮৫৫ জন পুরুষ ও ৩২৪২৮৯ জন স্ত্রীলোকের বাস। পুরুষের সংখ্যার তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া চলিতেছে। বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ৩৫৮৩৩৬; কিন্তু বিবাহিত নারীর সংখ্যা ১৩১৮১৬। মোটের উপর এইরূপ ধরা যাইতে পারে যে, কলিকাতাবাসিনী বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা তাহাদের পতিগৃহে পতির সহিত বাস করিতেছেন। তাহা হইলে ২২৬৫২০ জন কলিকাতাবাসী স্বামী সস্ত্রীক বাস করিতেছেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে কলিকাতার বাসাখরচ বিশেষতঃ বাড়ীভাড়া, মফঃস্বল অপেক্ষা অনেক বেশী। এইজন্য বেশী রোজগারের আশায় যে সকল গরীব লোক কলিকাতা যায়, তাহারা স্ত্রীদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিতে বাধ্য হয়। স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার পার্থক্যের আর একটা কারণ এই যে কলিকাতায় অনেক বালক ও যুবক পড়িতে আসে, কিন্তু সে পরিমাণে ছাত্রীর আমদানি হয় না। মানুষ পরিবারী হইয়া বাস না করিলে অনেক সময়ই দুর্নীতিপরায়ণ হয়। ইংরেজ শাসনের প্রথমাবস্থায় ইংলণ্ড হইতে যাতায়াতের অসুবিধাবশতঃ এদেশে বেশী ইংরাজ স্ত্রীলোক না থাকায় ইংরাজ পুরুষদের চরিত্র অনেকস্থলে বড় জঘন্য ছিল। রেলওয়ের পূর্ব্বেকার সময়ের প্রবাসী বাঙ্গালীদেরও এই কারণে দুর্নাম আছে। কলিকাতায় স্ত্রীপুরুষের সংখ্যায় এত পার্থক্য বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা না কমিলে কলিকাতায় দুর্নীতির স্রোত বাড়িয়া চলিবে।"[১২]

প্রবাসী – র ঐ লেখা থেকে জানা যায় যে, সেই সময় কলকাতায় হিন্দু বারবণিতার সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হয়ে গিয়েছিল। তাদের এই সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটেছিল *প্রবাসী* - র পাতায়। তৎকালীন এই সমাজবাস্তবতার ঢেউ এসে লেগেছিল প্রিয়নাথ দারোদার দপ্তরগুলিতেও। তাঁর কাহিনিতে কেন রূপোপজীবিনী বা গৃহ-পরিচারিকাদের এত বেশি উল্লেখ, নিষিদ্ধপল্লি আর সংলগ্ন মহল্লাগুলিতে কেন এত অপরাধের ছড়াছড়ি, তার সূত্র পাওয়া যায় এখান থেকেই। দারোগার দপ্তরে প্রকাশিত *বামুন ঠাকুর, প্রমদা, সহুরে মেয়ে* - র মতো দপ্তরগুলিতে তাই কেচ্ছার সমস্ত উপকরণ

থাকলেও প্রিয়নাথের কলমের মুনশিয়ানায় সেগুলি হয়ে ওঠে সেই সময়ের অপরাধ বৃত্তান্তের একেকটি দলিল। এইসব কাহিনিগুলিতে বারবণিতারা হয় সরাসরি অপরাধের সাথে যুক্ত, নাহলে মূল অপরাধীর সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। *সহুরে মেয়ে* নামক দপ্তরেই যেমন, ষড়যন্ত্রকারী হারাধনের প্ররোচনায় রাসবিহারীর কাছে মিথ্যা বলেছিল হারাধনেরই আশ্রিত একজন বারবণিতা, যার ফলশ্রুতিতে, সন্দেহের বশে নিজের স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করে রাসবিহারী। কিন্তু, পরে পুলিশের জেরার মুখে সেই বারবণিতা সব স্বীকার করে নেয় এবং হারাধনের জারিজুরি ফাঁস হয়ে যায়।

তবে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিল বোধহয় ত্রৈলোক্যতারিণী। আশ্বিন, ১৩০৫ – এ দারোগার দপ্তরে প্রকাশিত হয় *শেষ লীলা (অর্থাৎ ত্রৈলোক্যতারিণীর জীবনের শেষ অভিনয়!)* । তার কয়েক বছর আগেই, ৩রা এপ্রিল, ১৮৮৮ থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ এই কালপর্বে লন্ডনে ঘটে গেছে সেই শতাব্দীর নৃশংস ধারাবাহিক হত্যালীলা, যা অপরাধের ইতিহাসে জ্যাক দ্য রিপারের সিরিয়াল কিলিং - এর ঘটনা হিসেবে কুখ্যাত হয়ে আছে। এই অমীমাংসীত নারকীয় ঘটনাতে কোন এক অজানা আততায়ীর হাতে রাতের অন্ধকারে একের পর এক নৃশংশভাবে খুন হয়ে যেত শহরের বারবনিতারা। আর, *দারোগার দপ্তরে* ত্রৈলোক্যতারিণী নামের দেহপসারিণী নিজেই তার জীবনের গল্পে হয়ে উঠেছে একজন সিরিয়াল কিলার, যে নিজের লোভ চরিতার্থ করতে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় একের পর এক খুন করে গিয়েছে।

কলকাতার পাঁচুধোপানির গলিতে রাজকুমারী নামের এক স্ত্রীলোকের হত্যারহস্যের তদন্ত করতে গিয়ে যখন প্রিয়নাথ জানতে পারেন যে, ঐ বাড়িতে ত্রৈলোক্য বসবাস করে, প্রিয়নাথের মনে আর কোনও সন্দেহই থাকল না, যে এই হত্যাকান্ডের মূল চক্রী সেই-ই। কারণ, বেশ কয়েক বছর আগে সে অন্য একটি খুনের দায়ে প্রিয়নাথ দারোগার হাতেই ধরা পড়েছিল, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে সে আইনের নাগালের বাইরে চলে যায়।

গল্প এগোনোর সাথে সাথে পাঠক জানতে পারেন, দারোগা প্রিয়নাথ সুকৌশলে এবং খুবই চাতুর্যের সঙ্গে এমন পরিকল্পনা করেছেন, এবং তা বাস্তবায়িত করেছেন, যে ত্রৈলোক্য বাধ্য হয়ে নিজের মুখে নিজের অপরাধ মেনে নিয়েছে, সকলের সামনে স্বীকারোক্তি করেছে। ত্রৈলোক্যর স্বীকারোক্তি শুনে পাঠকের হাড় হিম হয়ে যাবে, যে কতটা ঠাণ্ডা

মাথায়, কতটা নিখুঁত পরিকল্পনা করে, প্রিয় নামের অন্য এক স্ত্রীলোকের সহায়তায়, সে রাজকুমারীকে হত্যা করেছে।

“এই বাড়ীতে যতগুলি স্ত্রীলোক বাস করিত; সকলের অপেক্ষা রাজকুমারীই কিছু দরিদ্রভাবে থাকিত; কিন্তু সকলের যাহা নাই, রাজকুমারীর তাহা ছিল। তাহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সোণার অলঙ্কার ছিল; কিন্তু তাহার অধিকাংশই সে ব্যবহার করিত না, উহা তাহার বাক্সের মধ্যে প্রায়ই আবদ্ধ থাকিত।

সেই সকল অলঙ্কার দেখিয়া উহার উপর আমার অতিশয় লোভ হইল। কিরূপে সেই অলঙ্কারগুলি আমার হস্তগত হইতে পারে, সর্ব্বদা কেবল তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলাম; কিন্তু মনের চিন্তা অধিক দিবস গোপনে রাখিতে পারিলাম না। কথায় কথায় একদিবস আমার মনের ভাব প্রিয়র নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, প্রিয়ও আমার ইচ্ছার অনুগামিনী হইল। তখন কিরূপ উপায়ে রাজকুমারীর অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিতে সমর্থ হই, উভয়ে মিলিয়া তাহার পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলাম। পরিশেষে ইহাও সাব্যস্ত হইল যে, উহাকে কোনরূপে অজ্ঞান করিয়া তাহার গহনাগুলি অপহরণ করিব। যেরূপ পরামর্শ হইল, কার্য্যেও তাহার সেইরূপ সংগ্রহ করিলাম, কিয়দ্দিন পরে ধূতুরার বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া রাখিলাম।

...আমার পূর্ব্ব বাসস্থান ছিল পাড়া গাঁয়ে; সুতরাং ধূতুরা যে কি জিনিষ, তাহা আমি বেশ জানি। উহার গুণ আমি অবগত আছি, এবং কোথায় যে উহা পাওয়া যায়, তাহাও আমার জানিতে বাকী নাই। একদিবস সহরের বাহিরে একখানি বাগানে কতকগুলি ধূতুরার গাছ দেখিতে পাই। উহা হইতে কয়েকটি ফল আনিয়া, তাহা চূর্ণ করিয়া আপন গৃহে রাখিয়া দি।

...ধূতুরার গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম সত্য; কিন্তু রাজকুমারীকে উহা প্রয়োগ করিবার সুযোগ কয়েকদিবসের মধ্যে করিয়া উঠিয়া পারিলাম না। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, যেরূপ করিয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে হয়, সেইরূপ করিয়া সিদ্ধি সাজিয়া খাইলে অতিশয় নেসা হয়; সুতরাং কিছু সিদ্ধিও আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম।

...একদিবস রাজকুমারী তাহার একটি পরিচিতা স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিল। আমিও তাহার সহিত গিয়াছিলাম। যখন আমরা উভয়ে সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করি, সেই সময় কিছু সন্দেশ আমি খরিদ করিয়া আনিয়াছিলাম। সেই সন্দেশ যে আমি নিজে ভোজন করিব বলিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা নহে, উহার দ্বারাই আমি রাজকুমারীর সর্ব্বনাশ সাধন করিব, এই অভিপ্রায়েই আমি উহা আনিয়াছিলাম।

...এখন আমি এবং প্রিয় উভয়ে মিলিয়া সেই সন্দেশের কতকগুলিতে সেই গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দিলাম, কতকগুলি সন্দেশ ভাল রহিল।

...যে দিবস প্রাতঃকালে রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায় তাহার পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার সময় রাজকুমারী আমার কাছে উপবেশন করে, এবং সন্ধ্যার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত আমার গৃহে বসিয়া নানারূপ গল্প-গুজবে নিযুক্ত হয়। প্রিয়ও সেই সময় আমার গৃহে ছিল। সেই সময়ে মনে করিয়াছিলাম, বিষমিশ্রিত সন্দেশ কোনরূপে সেইস্থানে রাজকুমারীকে খাওয়াইয়া দি; কিন্তু কার্য্যে তাহা করিয়া উঠিতে পারি নাই। কারণ, আমার মনে হয়, যদি রাজকুমারী অজ্ঞান হইয়া আমারই গৃহে পতিত হয়, তাহা হইলে গোলযোগ হইয়া পড়িবে; সুতরাং আমার মনোবাঞ্ছা কোনরূপেই পূর্ণ করিতে সমর্থ হইব না। এই ভাবিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে আমার গৃহে ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে সেই সন্দেশ খাওয়াইবার নিমিত্ত কোনরূপ উদ্‌যোগ করিলাম না। পরিশেষে সে যখন উঠিয়া আমার গৃহ হইতে তাহার নিজের গৃহে গমন করিল, তখন উভয়েই তাহার সহিত গমন করিয়া তাহার গৃহে গিয়া উপবেশন করিলাম। যে একখানি মাজুরের উপর রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, আমাদিগের বসিবার নিমিত্ত রাজকুমারী সেই মাজুর বিছাইয়া দেয়। আমরা তাহার উপর উপবেশন করিলে, সেও আমাদিগের সন্নিকটে উপবেশন করে। সেই গৃহে বসিয়া বসিয়া ক্রমে রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল।

রাত্রি আন্দাজ সাড়ে এগারটার সময় আমি প্রিয়কে কহিলাম, 'ভাই ! বড় ক্ষুধা লাগিয়াছে, কিছু খাইতে ইচ্ছা করিতেছে।'

...কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকুমারী কিছু চিড়া, দই ও মিষ্টান্নের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমরা সেই সকল দ্রব্য দুইখানি পাত্রে রাখিয়া তাহাতেই আহারের বন্দোবস্ত করিলাম। একখানি পাত্রে রাজকুমারীকে দিলাম; সে সেই পাত্রে আহার করিতে লাগিল; আর একখানি পাত্রে আমি ও প্রিয় উভয়ে আহার করিতে বসিলাম। সেই সময় প্রিয় কহিল, 'ফলারে মিষ্টতা কিছু কম হইয়াছে।'

প্রিয়র কথার উত্তরে আমি প্রিয়কে কহিলাম, 'আমার এই চাবি লইয়া যাও, আলমারির ভিতর সন্দেশ ছিল, যদি থাকে, তাহা হইলে উহা আন।'

প্রিয় আমার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আমার আলমারি হইতে বিষমিশ্রিত এবং বিষ-অমিশ্রিত সমুদায় সন্দেশ আনিয়া আমার নিকট রাখিয়া দিল। যে সন্দেশ বিষমিশ্রিত ছিল না, তাহার কিয়দংশ আমি গ্রহণ করিলাম, অবশিষ্ট প্রিয়কে দিলাম। যাহাতে বিষমিশ্রিত ছিল, তাহা রাজকুমারীকে প্রদান করিলাম। রাজকুমারী তাহার কিয়ৎ পরিমাণে ভোজন করিল; খাইতে ভাল লাগিতেছে না বলিয়া সমস্ত খাইয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু সে যাহা আহার করিল, তাহাতেই তাহার নেসা হইল; তবে এববারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িল না।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমি প্রিয়কে এক ছিলুম তামাকু সাজিতে কহিলাম। প্রিয় আমার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তামাকুর পরিবর্ত্তে সিদ্ধি সাজিয়া আনিল। তামাকু বলিয়া রাজকুমারীকে সেই সিদ্ধির ধূমও পান করাইলাম; কিন্তু তাহাতেও রাজকুমারী একবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল না। আমার ইচ্ছা ছিল যে, রাজকুমারী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে পর, উহার সমস্ত অলঙ্কারাদি লুঠ করিয়া লইব। কিন্তু সেও অজ্ঞান হইল না, আমিও তাহার অলঙ্কারগুলি হস্তগত করিতে সমর্থ হইলাম না। তখন আমি অনন্যোপায় হইয়া উহার বুকের উপর বসিয়া জোর করিয়া উহার গলা টিপিয়া ধরিলাম; প্রিয়কে কহিলাম, উহার পা দুইখানি

চাপিয়া ধর। প্রিয় তাহাই করিল, জোর করিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরাতে রাজকুমারী আর জোর করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। তখন আমরা উহার সমস্ত অলঙ্কার বাহির করিয়া লইয়া উহার গৃহের দরজা ভেজাইয়া রাখিয়া উহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল উহাকে হত্যা করিয়া উহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইব; কিন্তু কার্য্যের গতিতে এবং লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, পরিশেষে আমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলাম।”[১৩]

এই ত্রৈলোক্যতারিণীর গহনা লুকিয়ে রাখার কৌশল যেমন অভিনব, তেমনই চমৎকার। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজে বের করে দিয়েছে, পুলিশ কর্মচারীরাও তার নাগাল পায়নি।

“ত্রৈলোক্য আমাদিগের সকলের সমভিব্যাহারে তাহার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, এবং আমাদিগকে কহিল, “যে স্থানে আলমারিটি স্থাপিত আছে, সেই স্থান হইতে উহা একটু সম্মুখের দিকে সরাইয়া দিন।” এই কথা বলিবামাত্র, সেই আলমারি আমার প্রায় এক হস্ত সম্মুখ ভাগে সরাইয়া দিলাম। ত্রৈলোক্য সেই আলমারির পশ্চাৎ ভাগে গমন করিয়া, উহার পশ্চাদ্‌ভাগে যে একটি দেরাজের মত অংশ ছিল, তাহা খুলিয়া, তাহার মধ্য হইতে রাজকুমারীর সমস্ত অলঙ্কারগুলি বাহির করিল, এবং আমাদিগের হস্তে প্রদান করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া কর্ম্মচারী মাত্রেই, একবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন; কারণ তাঁহারা প্রত্যেকেই সেই আলমারি এক একবার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

সেই আলমারির ভিতর হইতে কর্ম্মচারীগণ যে সেই সকল অলঙ্কার পূর্ব্বে বাহির করিতে পারেন নাই, তাহাতে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র দোষ ছিল না। কারণ সেই আলমারির নির্ম্মাণ স্বতন্ত্ররূপ ছিল। আলমারির সর্ব্ব-উপরিস্থিত তক্তার ছয় ইঞ্চি নিম্নে অথচ কার্ণিসের ভিতরে আর একখানি তক্তা এরূপ ভাবে বসান ছিল যে, ভিতর হইতে দেখিলে বোধ হইত, সেই তক্তা খানিই আলমারির সর্ব্ব উপরের তক্তা। উপরের তক্তা খানি যেরূপ ভাবে কার্ণিসের সহিত আবদ্ধ থাকে, উহাও ঠিক সেইরূপ ভাবে সম্মুখ হইতে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু আলমারির কার্ণিসের মধ্যে উপুর্য্যপরি দুই খানি তক্তার ভিতর দুই ইঞ্চি পরিমিত ব্যবধান ছিল। তাহার ভিতর দ্রব্যাদি রাখিবার বা উহা হইতে দ্রব্যাদি বাহির করিয়া লইবার নিমিত্ত আলমারির পশ্চাৎ ভাগে একটি দরজা ছিল। একখানি কাষ্ঠে উহা এরূপ আড়ভাবে বসান ছিল যে, পশ্চাৎ হইতে দেখিলেও কেহ সহজে বুঝিতে পারিতেন না যে, উহার মধ্যে একটি দেরাজের মত স্থান আছে। সেই এড়ো কাষ্ঠ খানি আলমারির যে পার্শ্বে শেষ হইয়াছে, সেই পার্শ্বে সেই কাষ্ঠের গায়ে একটু সামান্য ফাটা দাগ ছিল মাত্র। সেই দাগের ভিতর নখ বসাইয়া এক পার্শ্বে সরাইয়া দিলে সেই এড়ো কাষ্ঠ খানি সরিয়া যাইত; সুতরাং সেই দেরাজের মুখ ফাঁক হইয়া পড়িত। তখন তাহার মধ্যে ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্য রাখিয়া দিয়া বা তাহা হইতে কোন দ্রব্য বাহির করিয়া লইয়া, সেই এড়ো কাষ্ঠ সরাইয়া দিলে ঠিক আপন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত। তখন উহার মধ্যে দ্রব্যাদি রাখিবার যে একটি স্থান আছে, তাহা আর কাহারও অনুমান করিবার সাধ্য থাকিত না।”[১৪]

আদালতের বিচারে ত্রৈলোক্যর মৃত্যুদণ্ড হয়। ফাঁসির আগে দারোগা প্রিয়নাথ একবার তার সাথে শেষবারের মতো দেখা করতে গিয়েছিলেন, ত্রৈলোক্য দেখা করেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও যে সে তার কৃতকর্মের জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা বা আত্মগ্লানিতে ভোগেনি, তার প্রমাণ ত্রৈলোক্যর বয়ানে, প্রিয়নাথের কলমে ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনিগুলির নামকরণ থেকেই তার মধ্যে বর্ণিত অপরাধের হদিশ পাওয়া যায় অনেকসময়েই। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে –

কৃত্রিম মুদ্রা, প্রমদা (কূলবধূ ব্যভিচারে ঘটায় প্রমাদ!), বাঃ গ্রন্থকার (অর্থাৎ পুস্তক-প্রণেতার অদ্ভুত জুয়াচুরি রহস্য), অর্থই অনর্থ (অর্থাৎ অর্থলাভে বিশ্বস্ত বন্ধুর সর্ব্বনাশ), ডাক চোর (পোস্ট-আফিসের ডাকপত্র ও মণি-অর্ডারাদি হরণ-রহস্য), কাপ্তেন মতি (অর্থাৎ নোট জালকারীর অদ্ভুত রহস্য), বালক চুরি (বালক চুরির ও ভয়ানক হত্যাকান্ডের অত্যদ্ভুত রহস্য), বেকুব বৈজ্ঞানিক (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকের চক্ষুতে অজ্ঞলোকের ধূলিনিক্ষেপের অদ্ভুত রহস্য), রেলে যম (অর্থাৎ রেলওয়ে যাত্রীর মহাদুর্ঘটনার একটি লোমহর্ষণকর দৃষ্টান্ত), ডাকাত সর্দ্দার (অর্থাৎ প্রসিদ্ধ দস্যু দলপতি কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর বীভৎস কাহিনী), বিশ্বাস কারে করি ? (অর্থাৎ আত্মীয় কর্ত্তৃক একটি বালিকার হত্যারহস্য ও পুলিশের জুলুম), মা, না রাক্ষসী ? (অর্থাৎ সতী, অসতী হইলে তাহার ভয়ানক ফল!), ঘুসখোরি বুদ্ধি (অর্থাৎ জনৈক সেকেলে পুলিশ-কর্ম্মচারীর ঘুষ লইবার অদ্ভুত উপায়!) ইত্যাদি ইত্যাদি।

❖

তবে পুলিশের এহেন প্রতিপত্তি পরবর্তীকালের গোয়েন্দা গল্পে, যেখানে কোন না কোন পেশাদার বা শখের গোয়েন্দা বিদ্যমান, সেখানে বেশ কমে এসেছে। বরং বলা ভাল, সরকারী পুলিশকে সেই কাহিনিগুলিতে বেশ ছোট করে, বেশ বোকা গোছের করেই দেখানো হয়েছে। একটা প্রশ্ন তো থেকেই যায়, বানিয়ে লেখা গোয়েন্দা গল্পের সাথে বাস্তব

ঘটনাবলীর কতটা যোগাযোগ আছে। তার থেকেও বড় কথা, গোয়েন্দা গল্প লেখার মধ্যে একটা ছলনার ব্যাপার আছে। যেমন, ধরা যাক, লেখক বললেন, দুপুরে খেয়ে ওঠার পর অমুক গোয়েন্দা কোথায় যেন বেরলেন, ফিরলেন অনেকক্ষণ পরে, মুখটা গম্ভীর। তিনি যে কোথায় গিয়েছিলেন, সে কথা পাঠক তো দূরের কথা, স্বয়ং গোয়েন্দার সহকারীর পক্ষেও জানা সম্ভব হয় না। গোয়েন্দার তদন্ত এগোতে থাকবে, কিন্তু পাঠককে বঞ্চিত করা হবে তথ্যের অধিকার থেকে। ইচ্ছে করেই সবাইকে খানিকটা পিছিয়ে রাখা হবে, যাতে গোয়েন্দাকে বেশ খানিকটা এগিয়ে রাখা যায়।

এমনিতেই, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বেশিরভাগ গল্পের গোয়েন্দাকেই সর্বসাধারণের থেকে অনেক উচ্চস্তরের প্রাণী হিসেবে দেখানোর একটা চেষ্টা গল্পের মধ্যে থাকে। শুধু অপরাধী নয়, গোয়েন্দার সহকারী এমনকি উপস্থিত পুলিশ অফিসারের থেকেও বুদ্ধিতে, বিচক্ষণতায়, বিশ্লেষণে শত যোজন এগিয়ে থাকেন তিনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সহকারীর চোখে গোয়েন্দার মূর্তি ঠিক স্বাভাবিক মানুষের নয়, অতিমানবের। তারা তো গোয়েন্দার চিন্তা ভাবনার উচ্চতাতে পৌঁছতেই পারে না, গোয়েন্দাপ্রবর কোন সূত্র দিলেও বেশিরভাগ সময় তারা ধরতেও পারে না, অগত্যা সেই গোয়েন্দাপ্রবরের জন্যেই অপেক্ষা।

আর গোয়েন্দার খ্যাতি নিয়ে তো কোন কথাই হবে না। মহানগরীর ব্যস্ত রাজপথ থেকে কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে কারোর বাড়ির বৈঠকখানা পর্যন্ত, গল্পের গোয়েন্দাকে দেখেই সবাই অভিভূত হয়ে পড়েন, চমকিত হয়ে বলে ওঠেন, ‘আচ্ছা আপনিই সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা অমুকচন্দ্র তমুক না ?’ বাস্তব পরিস্থিতি আসলে তো সেরকম নয়, আমাদের শহরের ক’জন গোয়েন্দাকে আমরা বাস্তবে সত্যি সত্যিই চিনি ? বা তাঁদের নাম জানি ?

গোয়েন্দাকে অতিমানবিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের খানিকটা জড়বুদ্ধি বলে প্রতিপন্ন করতে হয়। ফেলুদা কাহিনিগুলিতে যেমন লালমোহনবাবু বেশ হাসিখুশি ভালমানুষ, কিন্তু তাঁর জ্ঞান বা বুদ্ধি কোনটারই প্রশংসা করা যায় না। আবার সিধুজ্যাঠা বুদ্ধিমান এবং পন্ডিত হলেও উদ্যমহীন। তোপসের মধ্যে যদিও হাস্যকর রকমের বোকামি কিছু নেই, কিন্তু স্মৃতিশক্তি ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কোন গুণের কথাও তার জানা যায়

না। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, গোয়েন্দা যিনি হবেন তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অসীম সাহসের অধিকারী হবেন, কিন্তু বাকি যে মানুষগুলো কয়েকদিনের জন্য সেই সংশ্লিষ্ট 'কেসের' সঙ্গে যুক্ত থাকেন, সেই ব্যাপারে সারাক্ষণ চিন্তা করেন, তাদের মাথায় কখনওই কোন ক্লু আসবে না, তা-ও কি সম্ভব ? মনে হয়, খানিকটা সেই কারণেই, গোয়েন্দার সহকারীদের এমনভাবে দেখানো হয়।

তবে সবচেয়ে নির্মম ব্যবহার করা হয় পুলিশের সঙ্গে। গোয়েন্দার ক্ষমতার ঔজ্জ্বল্যকে বাড়িয়ে তোলার জন্য তাদেরকে একেবার বুদ্ধিহীন করে গড়ে তোলা হয়। কিন্তু বাস্তবে তো অপরাধের কিনারা করে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্তারাই। যদি সেখানে কোন বেসরকারি গোয়েন্দা থেকেও থাকে, পুলিশের সাহায্য ছাড়া তাদের পক্ষে তদন্তের কাজ এগোনো অসম্ভব। পুলিশের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোন বেসরকারি গোয়েন্দার পক্ষে সম্ভবই নয়, কারণ সরকারি পুলিশের হাতে অনেক ক্ষমতা থাকে, যা কোন বাইরের কারোর পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কাজেই, পুলিশ কর্মচারীরাই নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে বাস্তব সমস্যার সমাধান করেন। কিন্তু, বেশিরভাগ গোয়েন্দা গল্পেই, আমরা দেখি, হয় ঠিক তার উল্টো !!

বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গে তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল সেই সব 'সত্যি' গোয়েন্দাদের কথা, যারা সাহিত্যের গোয়েন্দার মতো অতিমানবিক নয়, রক্তমাংসের মানুষ। কারণ, এই অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, তাঁরা হয়তো কোন গুরুতর পরিস্থিতিতে ভয় পেয়েছেন, আতঙ্কিত হয়েছেন আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো। কিন্তু, দমে যাননি। ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, আবার নতুন করে সাহস সঞ্চয় করে, বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তার সাথে সঙ্গ দিয়েছে তাঁদের উপস্থিত বুদ্ধি আর অপরাধীকে শাস্তির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার অদম্য ইচ্ছা। রহস্যভেদের পেশা তাঁদের ক্রমশ নেশায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই, এই অধ্যায়ে ধরা থাকল সেই সব সেকেলে গোয়েন্দাদের কর্মকাণ্ড, সেই সাথে সেকালের সামাজিক পরিস্থিতি, অপরাধ ও অপরাধীর ধরণধারণ।

তথ্যসূত্র

১. চট্টোপাধ্যায় হীরেন; *গোয়েন্দা গল্পের অল্পবিস্তর* ; *কোরক সাহিত্য পত্রিকা (বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা)* ; সম্পা. তাপস ভৌমিক; প্রাক্ শারদ, ১৪২০; কলকাতা; পৃষ্ঠা ২৯।

২. *বাঁকাউল্লার দপ্তর* ; সম্পা. সৌম্যেন পাল ও প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত; চর্চাপদ; প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১৩; কলকাতা; পৃষ্ঠা ৩৮-৪০।

৩. *বাঁকাউল্লার দপ্তর* ; সম্পা. সৌম্যেন পাল ও প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত; চর্চাপদ; প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১৩; কলকাতা; পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫।

৪. বসু গিরিশচন্দ্র; *সেকালের দারোগার কাহিনী* ; সম্পা. অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায়; পুস্তক বিপণি; দ্বিতীয় সংস্করণ; জানুয়ারি, ১৯৫৮; পৃষ্ঠা ১৮।

৫. *বাঁকাউল্লার দপ্তর* ; সম্পা. সৌম্যেন পাল ও প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত; চর্চাপদ; প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১৩; কলকাতা; পৃষ্ঠা ১৪০-১৪৩)

৬. বসু গিরিশচন্দ্র; *সেকালের দারোগার কাহিনী* ; সম্পা. অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায়; পুস্তক বিপণি; দ্বিতীয় সংস্করণ; জানুয়ারি, ১৯৫৮; পৃষ্ঠা ৫০।

৭. বসু গিরিশচন্দ্র; *সেকালের দারোগার কাহিনী* ; সম্পা. অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায়; পুস্তক বিপণি; দ্বিতীয় সংস্করণ; জানুয়ারি, ১৯৫৮; পৃষ্ঠা ৬৯-৭০।

৮. *সেকালের গোয়েন্দা গল্প* ; সম্পা. অরিন্দম দাশগুপ্ত; আনন্দ পাবলিশার্স; দ্বিতীয় মুদ্রণ; ডিসেম্বর, ২০২১; কলকাতা; (ভূমিকা)।

৯. *সেকালের গোয়েন্দা গল্প* ; সম্পা. অরিন্দম দাশগুপ্ত; আনন্দ পাবলিশার্স; দ্বিতীয় মুদ্রণ; ডিসেম্বর, ২০২১; কলকাতা; (ভূমিকা)।

১০. *সেকালের গোয়েন্দা গল্প* ; সম্পা. অরিন্দম দাশগুপ্ত; আনন্দ পাবলিশার্স; দ্বিতীয় মুদ্রণ; ডিসেম্বর, ২০২১; কলকাতা; (ভূমিকা)।

১১. *সেকালের গোয়েন্দা গল্প* ; সম্পা. অরিন্দম দাশগুপ্ত; আনন্দ পাবলিশার্স; দ্বিতীয় মুদ্রণ; ডিসেম্বর, ২০২১; কলকাতা; (ভূমিকা)।

১২. *সেকালের গোয়েন্দা গল্প* ; সম্পা. অরিন্দম দাশগুপ্ত; আনন্দ পাবলিশার্স; দ্বিতীয় মুদ্রণ; ডিসেম্বর, ২০২১; কলকাতা; (ভূমিকা)।

১৩. মুখোপাধ্যায় শ্রী প্রিয়নাথ; *দারোগার দপ্তর (২য় খণ্ড)* ; সম্পা. অরুণ মুখোপাধ্যায়; পুনশ্চ; জানুয়ারি, ২০১৯; কলকাতা; পৃষ্ঠা ৩০-৩১।

১৪. মুখোপাধ্যায় শ্রী প্রিয়নাথ; *দারোগার দপ্তর (২য় খণ্ড)* ; সম্পা. অরুণ মুখোপাধ্যায়; পুনশ্চ; জানুয়ারি, ২০১৯; কলকাতা; পৃষ্ঠা ৩২-৩৩।

উপসংহার

ইংরেজিতে একটা কথা প্রচলিত আছে – 'ওয়ান্‌স্ আ কপ, অলওয়েজ আ কপ'। অর্থাৎ, রহস্য বা অপরাধের গন্ধ পেলেই পুলিশ তার তদন্ত শুরু করে দেবে, এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত তার সমাধান হচ্ছে, সেই নাছোড় খোঁজ চলতেই থাকবে। এই কথা, নিঃসন্দেহে গোয়েন্দাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এই গোটা গবেষণাপত্রে আমরা বহুবার তার নিদর্শন পেয়েছি। বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দারা হার মানতে নারাজ, তা সে যত বাধা বিপত্তি হুমকি – ই আসুক না কেন, তদন্তের শেষ না দেখে তারা ছাড়ে না।

গবেষণাপত্রটি লিখতে লিখতে বারবারই একটা প্রশ্ন মাথায় এসেছে, বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দার সংখ্যা তো প্রচুর, কিন্তু বর্তমান সময়ে তাদের মধ্যে গুটিকয় গোয়েন্দাকে ঘিরেই সবসময় আলোচনা বা চর্চা হয় কেন, বাকিরা কেন হারিয়ে গেলেন পাঠকের বিস্মৃতির অতলে ?

এর একটা কারণ সম্ভবত এটা হতে পারে, যে, পরিবর্তমান সময় ও সমাজে আজ সেই সব গোয়েন্দা কাহিনি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে, কারণ সেখানে যে সমস্ত ঘটনাকে অপরাধের আওয়ায় আনা হয়েছে, আজ সেগুলিকে আর অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না। প্রাসঙ্গিক সেই সব গোয়েন্দারাই আছে, যারা ভাবনায় চিন্তায়, আদব কায়দায় ও কাজে অনেক বেশি আধুনিক।

আবার আরেকটা কারণ এটাও হতে পারে, যে, সার্বিকভাবে বইয়ের পাঠকসংখ্যা তো ক্রমশ কমছে, এ কথা অনস্বীকার্য। যে সমস্ত গোয়েন্দারা বইয়ের দুই মলাটের বাইরে বেরিয়ে সিনেমা বা ওয়েব সিরিজ বা অডিওবুক ইত্যাদি অন্য কোনো মাধ্যমে দর্শক, শ্রোতার কাছে পৌঁছতে পেরেছেন, তাঁরাই জনমানসে আছেন। হ্যাঁ, তাঁরা প্রভূত জনপ্রিয় হচ্ছেন, কারণ মানুষ সেইসব রহস্য – রোমাঞ্চ কাহিনি পছন্দ করছে। আবার তাঁরা জনপ্রিয় হচ্ছেন বলেই নির্মাতারা বারবার তাঁদেরই ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনছেন, নতুন কোনো চরিত্র সামনে আসছে না। হয় তারা একেবারেই অনালোচিত থাকছেন, নাহলে শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ হয়ে থাকছেন গবেষক – চিন্তকদের চর্চায়। আমার বারবারই মনে হয়েছে, নতুন নতুন মাধ্যমে এই প্রজন্মের পাঠকের সামনে এই সমস্ত বিস্মৃত চরিত্রগুলিকে আবার ফিরিয়ে আনা দরকার।

এই উপসংহার যখন লেখা হচ্ছে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভয়ঙ্কর হাড়হিম করা এক খবরে চমকে উঠেছিলাম। এক উচ্চশিক্ষিত, নিজের পেশায় প্রতিষ্ঠিত মা নিজের চার বছরের শিশুপুত্রকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে !

কার্যত, বর্তমান গবেষণাপত্র তৈরির এই গোটা কালপর্ব জুড়ে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, হানাহানি, রক্তপাতের মতো মানব ইতিহাসের নানা অপরাধমূলক ঘটনার বীভৎসতা বারবার আমাদের শিহরিত করেছে, ভীত – সন্ত্রস্ত করেছে। অপরাধ কী, কীভাবে একজন অপরাধীর জন্ম হয়, সেসব স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। কিন্তু, আমাদের বর্তমান আলোচনার সঙ্গে 'অপরাধ' খুব ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে। নানান ধরণের অপরাধ, যা সমাজ বাস্তবতা থেকে উঠে আসা, তাকেই শৈল্পিক সুষমায় বুনে দেওয়া হয় ক্রাইম কাহিনিতে, গোয়েন্দা কাহিনিতে। তবে, সব এমন কাহিনিতে যে সবসময় অপরাধ ঘটবেই, তা অবশ্য নয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধ ঘটে থাকে। সুখের বিষয়, এইসব গল্পে এমন কেউ থাকেন, যিনি সেই অপরাধের রহস্যভেদ করে কাহিনিকে একটি সুষ্ঠু সমাপ্তিতে পৌঁছে দেন, পাঠক স্বস্তি পায়।

তবে, এই গবেষণাটি করতে গিয়ে আমি বেশি আগ্রহ বোধ করেছি ব্যোমকেশ – শবর - গার্গীর মতো সেইসব রহস্যসন্ধানীদের প্রতি, যাঁরা একটি সহানুভূতিশীল মন নিয়ে একজন মানুষ কেন 'অপরাধী' হয়ে উঠেছে, তার নেপথ্য কারণটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন, প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, শুধুমাত্র তদন্ত করেই নিজের দায়িত্ব সারেননি। এই প্রসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, গোয়েন্দা বা ক্রাইম সাহিত্য ও মনস্তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞান – এই দু'টি বিষয়কে মিলিয়ে আগামী দিনে আরও আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। মানুষের মন – সেও তো কম রহস্যময় নয় !

আর, শুধু কী যেসব ঘটনা চাক্ষুষ ঘটছে, সেগুলোই ? যেগুলো ঘটে চলেছে নিশ্চুপে, সবার চোখের আড়ালে ? জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ এবং পৃথিবীর জীবজগতের ওপর তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব – এই বিষয় নিয়ে গোটা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা আজ গভীরভাবে চিন্তিত। নির্বিচারে বন্যপ্রাণ ধ্বংস করা, জঙ্গলের গাছ – পালা কেটে পরিষ্কার করে ফেলা,

এই যে জনবিস্ফোরণ, তাদের বিলাসিতার জীবনযাপন, তার ফলে পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু – পরিবর্তন ! কত নদী পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে, জীব জগতের কত প্রাণী – কে তার হিসেব রাখে !! হিসেব রেখেছেন ঋজুদা – কাকাবাবু – কর্নেল বা মিতিনের মতো কেউ কেউ, আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে তাদের কথাও। প্রকৃতি সংরক্ষণ নিয়ে যে আরও বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন, সে দুরদর্শিতা আমাদের বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের স্রষ্টারা বহুদিন আগেই দেখিয়ে গিয়েছেন তাঁদের লেখায়। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য পাঠের সাথে পরিবেশবিদ্যার এই সংযুক্তি আগামীতে আরও বেশি করে গবেষণার নানান নতুন দিক উন্মোচিত করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

মেয়েদের গোয়েন্দাগিরি নিয়ে একটি আলাদা অধ্যায় আমি রেখছি আমার এই গবেষণা সন্দর্ভে। বাংলা সাহিত্যের তো বটেই, বিশ্বসাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দা এবং তাদের স্রষ্টাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সেই অধ্যায়ে। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, বাংলার পুরুষ গোয়েন্দাদের নিয়ে যতটা আলোচনা করা হয়, মেয়েদের নিয়ে তার ছিঁটেফোটাও করা হয় না। এতটা অবহেলা কী মেয়ে গোয়েন্দাদের সত্যি প্রাপ্য ? আশাপূর্ণার এই আক্ষেপ যথার্থ, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। মেয়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে কিছু কিছু গবেষণামূলক কাজ হয়েছে, তবে তা যথেষ্ট নয়। আমার এই গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিসরে মেয়েদের নিয়ে আরও বেশি কথা বলার সাধ থাকলেও, সুযোগ ছিল না। প্রত্যাশা করি, ভবিষ্যতে সে সুযোগ পাব। মানবীবিদ্যাচর্চা আজ সারা পৃথিবীর চিন্তা - বিশ্বে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। চমৎকার সমস্ত গবেষণা হচ্ছে সেই বিষয়ে। বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে এবং তাদের নারী স্রষ্টাদের নিয়ে এই মানবীবিদ্যাচর্চার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে গবেষণা করার উপযুক্ত পরিসর রয়েছে। আগামী দিনে এরকম গবেষণার সাথে আমরা নিশ্চিত আরও বেশি করে পরিচিত হতে পারব।

এই গবেষণার জন্য পড়াশুনো করতে গিয়ে আমি খেয়াল করেছি, হেমেন্দ্রকুমার রায় বা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো স্বনামধন্য লেখকেরা তাঁদের গোয়েন্দা কাহিনির মধ্যে অনেকক্ষেত্রে ভৌতিক ঘটনা, অশরীরী আত্মা বা অবাস্তবতার অবতারণা করেছেন। বর্তমান গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে আমি এই নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রধানত কিশোর –

কিশোরীরাই যে - সব কাহিনির পাঠক, সেখানে এইধরনের বিষয়ের অবতারণা করা কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। দু'একটি ছোটোখাটো প্রবন্ধ এ বিষয়ে লেখা হলেও বিস্তারিত কোনো গবেষণা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যদিও তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই আমার মনে হয়।

বাঁকাউল্লার দপ্তর, সেকালের দারোগা কাহিনী বা দারোগার দপ্তর - এর মতো বইগুলিতে সেকালের 'সত্যি' গোয়েন্দাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে পড়ে আমি চমৎকৃত হয়েছি বারবার। নানান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, যৎসামান্য আয়োজন – উপকরণকে সম্বল করে তাঁরা যে দক্ষতায় অপরাধীদের শায়েস্তা করেছেন, তা জানলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। একালেও অর্থাৎ একুশ শতকের সরকারি গোয়েন্দা পুলিশদের মধ্যে সুপ্রতিম সরকারের মতো কেউ কেউ নিজেদের সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ তদন্তকাহিনি গ্রন্থিত করেছেন দুই মলাটে। বর্তমান গবেষণার কালপর্বের সীমাবদ্ধতার জন্য তাঁদের লেখালেখি নিয়ে এই অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা গেল না। ভবিষ্যতে এই দুই সময়কে মিলিয়ে আবার কাজ করার সুযোগ পাব, এই অপেক্ষায় রইলাম।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন; *গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ১;* দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০১৮; কলকাতা।

২. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন; *গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ২;* দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০১৮; কলকাতা।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন; *গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৩;* দে'জ পাবলিশিং; ফেব্রুয়ারি, ২০২০; কলকাতা।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন; *গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৪;* দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০১৪; কলকাতা।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন; *গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৫;* দে'জ পাবলিশিং; অক্টোবর, ২০১৮; কলকাতা।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন; *গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৬;* দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০২০; কলকাতা।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন; *গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৭;* দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০১৯; কলকাতা।

৮. মুখোপাধ্যায় শ্রীপ্রিয়নাথ; *দারোগার দপ্তর(প্রথম খণ্ড);* সম্পা. অরুণ মুখোপাধ্যায়; পুনশ্চ; জানুয়ারি, ২০১৪; কলকাতা।

৯. মুখোপাধ্যায় শ্রীপ্রিয়নাথ; *দারোগার দপ্তর(দ্বিতীয় খণ্ড);* সম্পা. অরুণ মুখোপাধ্যায়; পুনশ্চ; জানুয়ারি, ২০১৯; কলকাতা।

১০. *সেকালের গোয়েন্দা গল্প;* সম্পা. অরিন্দম দাশগুপ্ত; আনন্দ পাবলিশার্স; ডিসেম্বর, ২০২১; কলকাতা।

১১. *সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি;* সম্পা. অরিন্দম দাশগুপ্ত; আনন্দ পাবলিশার্স; নভেম্বর, ২০১৭; কলকাতা।

১২. *সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি ২;* সম্পা. অরিন্দম দাশগুপ্ত; আনন্দ পাবলিশার্স; জুলাই, ২০১৯; কলকাতা।

১৩. *সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি ৩;* সম্পা. অরিন্দম দাশগুপ্ত; আনন্দ পাবলিশার্স; নভেম্বর, ২০২১; কলকাতা।

১৪. *পাঁচকড়ি দে রচনাবলী (প্রথম খণ্ড);* সম্পা. বারিদবরণ ঘোষ; করুণা প্রকাশনী; মার্চ, ২০১৫; কলকাতা।

১৫. *পাঁচকড়ি দে রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড);* সম্পা. বারিদবরণ ঘোষ; করুণা প্রকাশনী; বইমেলা, ২০১১; কলকাতা।

১৬. *পাঁচকড়ি দে রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড);* সম্পা. বারিদবরণ ঘোষ; করুণা প্রকাশনী; জুন, ২০১৬; কলকাতা।

১৭. *পাঁচকড়ি দে রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড);* সম্পা. বারিদবরণ ঘোষ; করুণা প্রকাশনী; জুন, ২০১৩; কলকাতা।

১৮. *পাঁচকড়ি দে রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড);* সম্পা. বারিদবরণ ঘোষ; করুণা প্রকাশনী; বৈশাখ, ১৪২২; কলকাতা।

১৯. *স্বপনকুমার সমগ্র (প্রথম খণ্ড);* গ্রন্থনা নিমাই গরাই; লালমাটি প্রকাশন; ডিসেম্বর, ২০১৪; কলকাতা।

২০. স্বপনকুমার সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); গ্রন্থনা নিমাই গরাই; লালমাটি প্রকাশন; এপ্রিল, ২০১৫; কলকাতা।

২১. *স্বপনকুমার সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড);* গ্রন্থনা নিমাই গরাই; লালমাটি প্রকাশন; বইমেলা, ২০১৬; কলকাতা।

২২. *স্বপনকুমার সমগ্র (চতুর্থ খণ্ড);* গ্রন্থনা নিমাই গরাই; লালমাটি প্রকাশন; বইমেলা, ২০১৭; কলকাতা।

২৩. *স্বপনকুমার সমগ্র (পঞ্চম খণ্ড);* গ্রন্থনা নিমাই গরাই; লালমাটি প্রকাশন; বইমেলা, ২০১৭; কলকাতা।

২৪. রায় সত্যজিৎ; *ফেলুদার পান্‌চ;* আনন্দ পাবলিশার্স; আগষ্ট, ২০০০; কলকাতা।

২৫. রায় সত্যজিৎ; *ফেলুদা একাদশ;* আনন্দ পাবলিশার্স; ডিসেম্বর, ২০০১; কলকাতা।

২৬. রায় সত্যজিৎ; *কলকাতায় ফেলুদা;* আনন্দ পাবলিশার্স; মে, ২০০৪; কলকাতা।

২৭. বসু সমরেশ; *গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর সমগ্র ১;* সম্পা. ঝুমা রায়চৌধুরী; অঞ্জলি প্রকাশনী; আগষ্ট, ২০১৯; কলকাতা।

২৮. বসু সমরেশ; *গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর সমগ্র ২;* সম্পা. ঝুমা রায়চৌধুরী; অঞ্জলি প্রকাশনী; আগষ্ট, ২০১৮; কলকাতা।

২৯. বসু সমরেশ; *গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর সমগ্র ৩;* সম্পা. ঝুমা রায়চৌধুরী; অঞ্জলি প্রকাশনী; জানুয়ারি, ২০১৮; কলকাতা।

৩০. *মেয়েরা যখন গোয়েন্দা;* সম্পা. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; নিউ স্ক্রিপ্ট; মার্চ, ২০২৯; কলকাতা।

৩১. সেন মনোজ; *রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র ১;* বুক ফার্ম; নভেম্বর, ২০১৯; কলকাতা।

৩২. রায় হেমেন্দ্রকুমার; *কলকাতার রাত্রি রহস্য;* সম্পা. কৌশিক মজুমদার; বুক ফার্ম; জানুয়ারি, ২০২০; কলকাতা।

৩৩. সেন সুভদ্র কুমার; *রহস্য রচনা সমগ্র;* কিশলয় প্রকাশন; সেপ্টেম্বর, ২০১১; কলকাতা।

৩৪. আহমেদ হুমায়ূন; *মিসির আলি সমগ্র;* অনন্যা; ফেব্রুয়ারি, ২০১৬; ঢাকা।

৩৫. আহমেদ হুমায়ূন; *মিসির আলি সমগ্র ২;* অনন্যা; মার্চ, ২০১৫; ঢাকা।

৩৬. *গোয়েন্দা আর গোয়েন্দা;* সম্পা. রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় এবং সিদ্ধার্থ ঘোষ; আনন্দ পাবলিশার্স; চৈত্র, ১৪২০; কলকাতা।

৩৭. দাশগুপ্ত প্রসেনজিৎ; *সাহিত্যের গোয়েন্দা;* পরশপাথর প্রকাশন; পৌষ, ১৪১৯; কলকাতা।

৩৮. সরকার দেবাশীষ; *ফেলুদা etc.;* পরম্পরা প্রকাশন; নভেম্বর, ২০২১; কলকাতা।

৩৯. বিশ্বাস সুখেন; *সত্যজিতের কলমে ফেলুদা অ্যান্ড কোং;* প্রতিভাস; মে, ২০১২, কলকাতা।

৪০. মজুমদার সমরেশ; *অর্জুন হতভম্ব;* পত্র ভারতী, ডিসেম্বর, ২০০৪; কলকাতা।

৪১. বন্দ্যোপাধ্যায় দিলীপকুমার; *সৃজন গোয়েন্দার ছয় রহস্য;* একুশ শতক; অক্টোবর, ২০১২; কলকাতা।

৪২. *বটতলার বই ১;* সম্পা. অদ্রীশ বিশ্বাস; গাঙচিল; জানুয়ারি, ২০১১; কলকাতা।

৪৩. *বটতলার বই ২;* সম্পা. অদ্রীশ বিশ্বাস; গাঙচিল; জানুয়ারি, ২০১১; কলকাতা।

৪৪. গঙ্গোপাধ্যায় পার্থজিৎ; *গোয়েন্দা সাহিত্য, ব্যোমকেশ বক্সী ও অন্যান্য;* একুশ শতক; মার্চ, ২০১৮, কলকাতা।

৪৫. দাশ নলিনী; *গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র (প্রথম খণ্ড);* নিউ স্ক্রিপ্ট; মার্চ, ২০১৯; কলকাতা।

৪৬. দাশ নলিনী; *গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড);* নিউ স্ক্রিপ্ট; নভেম্বর, ২০১৮; কলকাতা।

৪৭. *বাঁকাউল্লার দপ্তর;* সম্পা. সৌম্যেন পাল এবং প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত; চর্চাপদ; জানুয়ারি, ২০১৩; কলকাতা।

৪৮. *বিশ্বসেরা গোয়েন্দা গল্প;* সম্পা. অদ্রীশ বর্ধন; সূর্য পাবলিশার্স; বইমেলা, ২০১৭; কলকাতা।

৪৯. সরকার সুপ্রতিম; *আবার গোয়েন্দাপীঠ;* আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ২০২২; কলকাতা।

৫০. চৌধুরী ঘনশ্যাম; *গোয়েন্দা কেদার-বদ্রী রহস্য সমগ্র ১;* দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০১৮; কলকাতা।

৫১. চৌধুরী ঘনশ্যাম; *গোয়েন্দা কেদার-বদ্রী রহস্য সমগ্র ২;* দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০১৮; কলকাতা।

৫২. চৌধুরী ঘনশ্যাম; *গোয়েন্দা কেদার-বদ্রী রহস্য সমগ্র ৩;* দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০১৫; কলকাতা।

৫৩. চৌধুরী ঘনশ্যাম; *গোয়েন্দা কেদার-বদ্রী রহস্য সমগ্র ৪;* দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০১৭; কলকাতা।

৫৪. ডয়্যাল আর্থার কন্যান; *শার্লক হোমস সমগ্র (প্রথম খণ্ড, সটীক সংস্করণ);* অনুবাদক অদ্রীশ বর্ধন; লালমাটি প্রকাশন; মার্চ, ২০১১; কলকাতা।

৫৫. ডয়্যাল আর্থার কন্যান; *শার্লক হোমস সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড, সটীক সংস্করণ);* অনুবাদক অদ্রীশ বর্ধন; লালমাটি প্রকাশন; মার্চ, ২০১৫; কলকাতা।

৫৬. মজুমদার কৌশিক; *তোপসের নোটবুক;* বুক ফার্ম; সেপ্টেম্বর, ২০১৯; কলকাতা।

৫৭. দাশগুপ্ত প্রসেনজিৎ; *ফেলুদা আর সত্যজিৎ;* পত্রলেখা; সেপ্টেম্বর, ২০১৯; কলকাতা।

৫৮. দাশগুপ্ত প্রসেনজিৎ; *রহস্যগল্পের নায়কেরা;* আত্মজা পাবলিশার্স; ২০১৯; কলকাতা।

৫৯. চক্রবর্তী শিবরাম; *কঙ্কেকাশির গোয়েন্দাগিরি;* সম্পা. প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত এবং সৌম্যান পাল; সপ্তর্ষি প্রকাশন; এপ্রিল, ২০১৯; কলকাতা।

৬০. ভট্টাচার্য মনোরঞ্জন; *হুকা-কাশি সমগ্র;* ভাষা ভেঞ্চার প্রা.লি.; জানুয়ারি, ২০২৩; কলকাতা।

৬১. সেন সুকুমার; *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি;* অনন্দ পাবলিশার্স; জুলাই, ২০১২; কলকাতা।

৬২. *বাঙালির বটতলা (প্রথম খণ্ড);* সম্পা. অদ্রীশ বিশ্বাস এবং অনিল আচার্য; অনুষ্টুপ; জানুয়ারি, ২০১৩; কলকাতা।

৬৩. *বাঙালির বটতলা (দ্বিতীয় খণ্ড);* সম্পা. অদ্রীশ বিশ্বাস এবং অনিল আচার্য; অনুষ্টুপ; ডিসেম্বর, ২০২১; কলকাতা।

৬৪. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন; *গোয়েন্দা গার্গী;* পত্র ভারতী; ডিসেম্বর, ২০০৭; কলকাতা।

৬৫. দাশগুপ্ত সুজন; *ধাঁধাপুরীর গোলকধাঁধা;* আনন্দ পাবলিশার্স; আগষ্ট, ১৯৮৬, কলকাতা।

৬৬. দাশগুপ্ত সুজন; *এই বইয়ের নাম অন্য মলাটে;* আনন্দ পাবলিশার্স; অক্টোবর, ১৯৯৩; কলকাতা।

৬৭. বর্ধন অদ্রীশ; *ইন্দ্রনাথ রুদ্র সমগ্র;* নাথ পাবলিশিং; নভেম্বর, ১৯৬৫; কলকাতা।

৬৮. মিত্র প্রেমেন্দ্র; *আবার ঘনাদা;* ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা.লি.; ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩; কলকাতা।

৬৯. মিত্র প্রেমেন্দ্র; *অদ্বিতীয় ঘনাদা;* ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা.লি.; আশ্বিন, ১৮৮২ শকাব্দ; কলকাতা।

৭০. মিত্র প্রেমেন্দ্র; *অফুরন্ত ঘনাদা;* সমকাল প্রকাশনী; ডিসেম্বর, ১৯৬১; কলকাতা।

৭১. মিত্র প্রেমেন্দ্র; *দুনিয়ার ঘনাদা;* দে'জ পাবলিশিং; বৈশাখ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ; কলকাতা।

৭২. মিত্র প্রেমেন্দ্র; *ঘনাদা সমগ্র ২;* সম্পা. সুরজিৎ দাশগুপ্ত; আনন্দ পাবলিশার্স; মে, ২০১১; কলকাতা।

৭৩. মিত্র প্রেমেন্দ্র; *তেল দেবেন ঘনাদা;* রেসন্‌স; বৈশাখ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ; কলকাতা।

৭৪. মিত্র প্রেমেন্দ্র; *ঘনাদা তস্য তস্য অম্‌নিবাস;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারী, ১৯৬৩; কলকাতা।

৭৫. ভদ্র গৌতম; *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার?;* ছাতিম বুক্‌স্; জুন, ২০১১; কলকাতা।

৭৬. চক্রবর্তী নীরেন্দ্রনাথ; জোড়া ভাদুড়ি; করুণা প্রকাশনী; ডিসেম্বর, ১৯৬৪; কলকাতা।

৭৭. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *সারান্ডায় শয়তান;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০০৩; কলকাতা।

৭৮. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *জোনাথনের বাড়ির ভূত;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০০৪; কলকাতা।

৭৯. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *কেরালায় কিস্তিমাত;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০০৫; কলকাতা।

৮০. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *সর্প-রহস্য সুন্দরবনে;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০০৬; কলকাতা।

৮১. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০০৭; কলকাতা।

৮২. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *ছকটা সুডোকুর;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০০৮; কলকাতা।

৮৩. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *আরাকিয়েলের হিরে;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০০৯; কলকাতা।

৮৪. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *গুপ্তধনের গুজব;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০১০; কলকাতা।

৮৫. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *হাতে মাত্র তিনটে দিন;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০১১; কলকাতা।

৮৬. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভ;* পত্রভারতী; জানুয়ারি, ২০১২; কলকাতা।

৮৭. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যুফাঁদ;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০১৩; কলকাতা।

৮৮. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *টিকরপাড়ায় ঘড়িয়াল;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০১৪; কলকাতা।

৮৯. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *দুঃস্বপ্ন বারবার;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০১৫; কলকাতা।

৯০. ভট্টাচার্য সুচিত্রা; *স্যান্ডরসাহেবের পুঁথি;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০১৬; কলকাতা।

৯১. সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা; *একডজন কর্নেল;* সুপ্রকাশনী; ১৯৬১; কলকাতা।

৯২. সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা; *ঘটনা যখন রহস্যজনক;* নবপত্র প্রকাশন; জানুয়ারি, ১৯৫৫; কলকাতা।

৯৩. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ; *টেনিদা সমগ্র;* সম্পা. প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়; আনন্দ পাবলিশার্স; সেপ্টেম্বর, ২০০৬; কলকাতা।

৯৪. বসু গিরিশচন্দ্র; *সেকালের দারোগার কাহিনী;* সম্পা. অলোক রায় এবং অশোক উপাধ্যায়; পুস্তক বিপণি; জানুয়ারি, ১৯৫৮; কলকাতা।

৯৫. মুখোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু; *গোয়েন্দা বরদাচরণ সমগ্র ও অন্যান্য;* নাথ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০০৭; কলকাতা।

৯৬. মুখোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু; *মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি;* আনন্দ পাবলিশার্স; ফেব্রুয়ারি, ২০০৪; কলকাতা।

৯৭. গুহ বুদ্ধদেব; *ঋজুদা সমগ্র ১;* আনন্দ পাবলিশার্স; জুলাই, ২০০৩; কলকাতা।

৯৮. গুহ বুদ্ধদেব; *ঋজুদা সমগ্র ৩;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০০৫; কলকাতা।

৯৯. গুহ বুদ্ধদেব; *ঋজুদা সমগ্র ৫;* আনন্দ পাবলিশার্স; ফেব্রুয়ারি, ২০০৫; কলকাতা।

১০০. চট্টোপাধ্যায় ষষ্ঠীপদ; *পাণ্ডব গোয়েন্দা (দশম খণ্ড);* আনন্দ পাবলিশার্স; মার্চ, ২০০৭; কলকাতা।

১০১. সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা; *কিশোর কর্নেল সমগ্র ৪;* দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০১০; কলকাতা।

১০২. সান্যাল নারায়ণ; *শার্লক হেবো;* উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির; ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২; কলকাতা।

১০৩. ঘোষ সুদক্ষিণা; *মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা;* দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারি, ২০০৮; কলকাতা।

১০৪. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল; *কাকাবাবু সমগ্র ১;* আনন্দ পাবলিশার্স; ডিসেম্বর, ২০১১; কলকাতা।

১০৫. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল; *কাকাবাবু সমগ্র ২;* আনন্দ পাবলিশার্স; ডিসেম্বর, ২০১২; কলকাতা।

১০৬. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল; *কাকাবাবু সমগ্র ৩;* আনন্দ পাবলিশার্স; ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫; কলকাতা।

১০৭. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল; *কাকাবাবু সমগ্র ৪;* আনন্দ পাবলিশার্স; ডিসেম্বর, ১৯৯৮; কলকাতা।

১০৮. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল; *কাকাবাবু সমগ্র ৫;* আনন্দ পাবলিশার্স; ফেব্রুয়ারি, ২০১২; কলকাতা।

১০৯. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল; *কাকাবাবু সমগ্র ৬;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০১২; কলকাতা।

১১০. কর বিমল; *কিকিরা সমগ্র ৩;* আনন্দ পাবলিশার্স; জানুয়ারি, ২০০২; কলকাতা।

১১১. গুপ্ত নীহাররঞ্জন; *কিরীটী অম্নিবাস (তৃতীয় খণ্ড);* অমর সাহিত্য প্রকাশন; মে, ১৯৮৫; কলকাতা।

১১২. বসু রাজশেখর; *পরশুরাম গল্পসমগ্র;* সম্পা. দীপংকর বসু; এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স; নভেম্বর, ১৯৯২; কলকাতা।

সহায়ক পত্রপত্রিকাপঞ্জি

১. *সন্দেশ ;* সম্পা. লীলা মজুমদার এবং সত্যজিৎ রায়; ৩য় বর্ষ ১ম খণ্ড; মে, ১৯৬৩; কলকাতা।

২. *আনন্দবাজার পত্রিকা* ; সম্পা. অভীক সরকার; ৯৯ বর্ষ ৩০১ সংখ্যা; ১০ই জানুয়ারি, ২০২১।

৩. *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* ; বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা; সম্পা. তাপস ভৌমিক; প্রাক্ শারদ ১৪২০ বঙ্গাব্দ; কলকাতা

৪. *আনন্দবাজার পত্রিকা* ; সম্পা. অভীক সরকার; ৯৭ বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ১৫ই মার্চ, ২০১৪।

৫. *আনন্দবাজার পত্রিকা* ; সম্পা. অভীক সরকার; ৯৯ বর্ষ ৬১ সংখ্যা ১০ই মে, ২০২০।

৬. *আনন্দবাজার পত্রিকা* ; সম্পা. অভীক সরকার; ১০১ বর্ষ ২০০ সংখ্যা; ১০ই অক্টোবর, ২০২২।

৭. *আনন্দবাজার পত্রিকা* ; সম্পা. অভীক সরকার; ১০২ বর্ষ ১৯৯ সংখ্যা; ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

সহায়ক ইংরাজি বই ও পত্রিকা

1. Doyle, Arthur Conan. *The Complete Illustrated Sherlock Holms.* Rupa and Company, 1989. Rpt. 2001. New Delhi.

2. *Picture Imperfect and Other Byomkesh Bakshi Mysteries.* Trans. Sreejata Guha. Penguin Book India, 1999. New Delhi.

3. Ashton, Ralph A. *The secret Weapons of 221B, Baker Street. The Baker Street Journal – New Series.* Vol. IX, No. 2 April 1959: 99 – 102.

4. Baring – Gould, Willium S. *The Annotated Sherlock Holms*, Vol. I. 2nd ed. New York: Clarkson N. Potter, Inc., 1967.

5. Baring – Gould, Willium S. *The Annotated Sherlock Holms*, Vol. II. 2nd ed. New York: Clarkson N. Potter, Inc., 1967.

6. Blakeney, T.S. *Thoughts on The Sign of Four.* The Sherlock Holmes Journal. Vol III, No. 4. Summer 1958: 6-8.

7. Christie, Agatha. *Poirot Omnibus.* Trans. Souren Dutta. A. P. Publishers, 1994. Kolkata.

8. Morley, Christopher. *Sherlock Holmes and Doctor Watson: a Textbook of Friendship.* Harcourt, Brace and Company, 1944. New York.

9. Knight, Stephen. *The Golden Age.* The Cambridge Companion to Crime Fiction. Ed. Martin Priestman. Cambridge University Press, 2003. 77-94. Cambridge.

Rima Das
18.01.2024